শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পাণ্ডিচেরী-২
১৯৬৯

ভূমিকা

শ্রীঅরবিন্দ বাংলা লেখা আরম্ভ করেছিলেন বিলেত থেকেই—কতকটা তাঁর পিতৃদেবের নির্দ্দেশ অমান্য করেই; কারণ, প্রথমতঃ গোড়ার দিকে না হ'লেও কলেজ জীবনে বাঙ্গালীদের সঙ্গে যথেষ্ট মিলতে ও মিশতে পেরেছিলেন, তারপর সিভিল সার্ভিসে তিনি বাংলা গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় ভাষা হিসাবে (সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় ভাষা একটি শিখতে হয়)। এ প্রসঙ্গে তবে একটি মজার গল্প তিনি আমাদের বলেছিলেন। তাঁদের বাংলা শিক্ষক ছিল একজন ইংরেজ—পাকা ইংরেজ। মাষ্টার মশাই-এর বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর এক দুষ্ট ছাত্র একটি বাংলা লেখা (বঙ্কিম থেকে নকল করে) তার হাতে দিয়ে বলে, "স্যার, এই বাংলা লেখাটি বড় কঠিন, বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে দেবেন ?" মাষ্টার মশাই লেখাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন, উল্টে-পাল্টে পরখ করলেন, তারপর আই· সি· এস-ই রায় দিলেন, "This is not Bengali."

শ্রীঅরবিন্দ বাংলা রীতিমত শিখতে আরম্ভ করেন বরোদায় এসেই—পড়তে, লিখতে, বলতে। তার প্রথম ফলই হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধাবলী, ক্রমে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি কবিওয়ালাদের অনুবাদ। বসুমতী সংস্করণের সকল গ্রন্থাবলী তাঁর পুস্তকাগারে ছিল, অনেক অনেক মন্তব্য পড়বার সময় তিনি সেই সব পুস্তকে লিখে রেখেছেন, যথা, মধুসূদনের কয়েকটা কবিতার উপর। বাংলা লেখাতেও (কাব্য রচনায়) হাত দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর ভাই (অর্থাৎ দাদা) মনমোহন ঘোষ এক কৌতূহলের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। মনমোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, অরবিন্দ তার কিছু কবিতা (ইংরেজী) রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবেন হয় ত', তবে সে এখন ব্যস্ত বাংলা কবিতা লেখায়; ইংরেজী কবিতায় সে সুন্দর সুদক্ষ, এখন সে বৃথা সময় নষ্ট করছে বাংলা কবিতা লেখার চেষ্টায়—লিখছে উষা-হরণ কাব্য (মধুসূদনই ঢং-এ)। মনমোহন কিন্তু নিজেও ঠিক ঐ বিষয়ে এক কাব্য লিখেছেন।

যা হোক আমাদের এই সংগ্রহের মধ্যে বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখার নিদর্শন হ'ল মৃণালিণীর নিকট পত্রাবলী। আর সর্ব্বশেষ হ'ল পণ্ডিচেরীতে লিখিত পত্রাবলী কয়েকজন সাধিকার কাছে। পণ্ডিচেরীর পূর্ব্বে বেশির ভাগ বাংলা লেখা হয়েছিল ধর্ম্ম পত্রিকার জন্য। ধর্ম্ম পত্রিকার সব লেখাই শ্রীঅরবিন্দের হাত থেকে, শেষের কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া। কারা-কাহিনী এবং

আর এক আধটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল অন্যত্র। পণ্ডিচেরীতে তিনি লিখেছিলেন ঋগ্‌বেদ সম্বন্ধে, কিছু অনুবাদ ও টীকা। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনার রীতি একদিকে যেমন সংস্কৃত ঘেঁষা (যথা, দুর্গাস্তোত্র এবং জগন্নাথের রথ ও আমাদের ধর্ম্ম), অন্যদিকে সহজ সরল কথ্যরীতিও তাঁর সমানে আয়ত্তাধীন ছিল। বিষয় এবং উদ্দেশ্য অনুসারে এই বিভিন্নতা। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখাগুলি সবই প্রবন্ধাকারে, কেবল গীতা এবং কারা-কাহিনী ছাড়া। এ দুটিও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ—পুস্তকাকারে সংগৃহীত হ'লেও। বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীতে তাই পুস্তকগুলি ভেঙ্গে দিয়ে বিষয় অনুসারে বিভিন্ন প্রবন্ধ বিভিন্ন পর্য্যায়ে সাজান হয়েছে।

পণ্ডিচেরী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
সম্পাদক

সূচীপত্র

দুর্গা-স্তোত্র

দুর্গা-স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে ! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি,—শুন, মাতঃ, উঠ বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে ! যুগে যুগে মানবশরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্য করিয়া তোমার আনন্দধামে ফিরিয়া যাই। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্য্যে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উঠ বঙ্গদেশে, সহায় হও ॥

মাতঃ দুর্গে ! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণি, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি ! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন, মাতঃ, উঠ বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে ! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণি ভীমে, সৌম্য-রৌদ্র-রূপিণি ! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শক্তি, অসুরের উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান ॥

মাতঃ দুর্গে ! জগৎশ্রেষ্ঠ ভারতজাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তুমি, মাতঃ, গগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমিরবিনাশী আভায় ঊষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার কর, মাতঃ, তিমির বিনাশ কর ॥

মাতঃ দুর্গে ! শ্যামলা সর্ব্বসৌন্দর্য্য-অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি, এতদিন শক্তিসংহরণে আত্মগোপন করিতেছিল।

আগত যুগ, আগত দিন, ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে, এস, মাতঃ, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্য্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বিনাশ কর স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥

মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণি, নৃমুণ্ডমালিনি দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনি! ক্রূরনিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা মাতঃ, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মাণ ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎপ্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই ॥

মাতঃ দুর্গে! যোগশক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্য্য-সন্তান, লুপ্ত শিক্ষা, চরিত্র, মেধাশক্তি, ভক্তিশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য সত্যজ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গতিনাশিনি জগদম্বে, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! অন্তঃস্থ রিপু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবিঘ্ন নির্ম্মূল কর। বলশালী পরাক্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে, উর্ব্বর ক্ষেত্রে, গগনসহচর পর্ব্বততলে পূতসলিলা নদীতীরে, একতায় প্রেমে, সত্যে শক্তিতে, শিল্পে সাহিত্যে, বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে এই প্রার্থনা, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। যন্ত্র তব, অশুভ-বিনাশী তরবারী তব, অজ্ঞান-বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবক গণের এই বাসনা পূর্ণ কর। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভ-হন্ত্রী হইয়া তরবারী ঘুরাও, জ্ঞানদীপ্তিপ্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥

মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও॥

বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও॥

কাহিনী

স্বপ্ন

একটি দরিদ্র লোক অন্ধকার কুট্‌রীতে বসিয়া নিজ শোচনীয় অবস্থা এবং ভগবানের রাজ্যে অন্যায় ও অবিচারের কথা ভাবিতেছিল। দরিদ্র অভিমানের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিল, "লোকে কর্ম্মের দোহাই দিয়া ভগবানের সুনাম বাঁচাইতে চায়। গত জন্মের পাপে যদি আমার এই দুর্দ্দশা হইত, আমি যদি এতই পাপী হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জন্মে আমার মনে পাপ চিন্তার স্রোত এখনও বহিত, এত ঘোর পাতকীর মন কি একদিনে নির্ম্মল হয়? আর ওই পাড়ার তিনকড়ি শীল, তাঁহার যে ধনদৌলত স্বর্ণ-রৌপ্য দাসদাসী কর্ম্মফল সত্য হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে তিনি জগদ্বিখ্যাত সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার চিহ্নমাত্রও এই জন্মে দেখি না। এমন নিষ্ঠুর পাজী বদ্‌মায়েস জগতে নাই। না, কর্ম্মবাদ ভগবানের ফাঁকি, মনভুলান কথা মাত্র। শ্যামসুন্দর বড় চতুর চূড়ামণি, আমার কাছে ধরা দেন না, তাই রক্ষা—নচেৎ উত্তম শিক্ষা দিয়া সব চালাকী বাহির করিতাম।" এই কথা বলিবা মাত্র দরিদ্র দেখিল হঠাৎ তাহার অন্ধকার ঘর অতিশয় উজ্জ্বল আলোক-তরঙ্গে ভাসিয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে আলোকতরঙ্গ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—মৃদু হাসিতেছে, কিন্তু কোনও কথা কহিতেছে না! ময়ূরপুচ্ছ ও পায়ে নূপুর দেখিয়া দরিদ্র বুঝিল স্বয়ং শ্যামসুন্দর আসিয়া তাহাকে ধরা দিয়াছে। দরিদ্র অপ্রতিভ হইল, একবার ভাবিল প্রণাম করি, কিন্তু বালকের হাসিমুখ দেখিয়া কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হইল না,—শেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া গেল, "ওরে কেষ্টা, তুই এলি কেন?" বালক হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি আমাকে ডাকিলে না? এইমাত্র আমাকে চাবুক মারিবার প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল! তা, ধরা দিলাম, উঠিয়া চাবকাও না।" দরিদ্র আরও অপ্রতিভ হইল, ভগবানকে চাবুক মারিবার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্নেহের পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর বালকের গায়ে হাত লাগানটা ঠিক রুচিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বালক আবার বলিল, "দেখ, হরিমোহন, যাহারা আমাকে ভয় না করিয়া সখার মত দেখে, স্নেহভাবে গাল দেয়, আমার সঙ্গে খেলা করিতে চায়, তাহারা আমার বড় প্রিয়। আমি খেলার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সর্ব্বদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী

খুঁজিতেছি। কিন্তু, ভাই, পাইতেছি না। সকলে আমার উপর ক্রোধ করে, দাবী করে, দান চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভক্তি চায়, কই আমাকে ত কেহ চায় না। যাহা চায়, আমি দিই। কি করিব সন্তুষ্টই করিতে হয়, নহিলে আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। তুমিও দেখিতেছি, কিছু চাও। বিরক্ত হইয়া চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে আসিয়াছি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তবে যদি প্রহারের আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দিব। কেমন রাজী আছ?" হরিমোহন বলিল, "পারিবি ত? দেখিতেছি বড় বকিতে জানিস, কিন্তু তোর মত কাঁচ ছেলে যে আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিব কেন?" বালক আবার হাসিয়া বলিল, "এস, দেখ, পারি কি না।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুতের স্রোত খেলিতে লাগিল, মূলাধারে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি অগ্নিময়ী ভুজঙ্গিনীর আকারে গর্জন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ছুটিয়া আসিল, মস্তিষ্ক প্রাণশক্তি-তরঙ্গে ভরিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরূপময় জগৎ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে লুক্কায়িত হইল। হরিমোহন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। যখন আবার চৈতন্য হইল, সে দেখিল কোন অচেনা বাড়ীতে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঘোর দুশ্চিন্তা বিকৃত হৃদয়বিদারক নিরাশা বিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিমোহন বিশ্বাস করিতে চায় নাই যে, এই বৃদ্ধ গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় ভীত হইয়া বালককে বলিল, "কি করিলি কেষ্টা, চোরের মত ঘোর রাত্রিতে পরের বাড়ীতে ঢুকিলি? পুলিশ আসিয়া ধরিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে! তিনকড়ি শীলের প্রতাপ জানিস না?" বালক হাসিয়া বলিল, "খুব জানি। কিন্তু চুরি আমার পুরাতন ব্যবসা, পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিলাম, বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।" তখন হরিমোহন বৃদ্ধ তিনকড়ির মন দেখিতে পাইল। দেখিল, যেন শত্রু-আক্রমণে বিধ্বস্ত ধনাঢ্য নগরী, সেই তীক্ষ্ণ ওজস্বিনী বুদ্ধিতে কত ভীষণ মূর্ত্তি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি বিনাশ করিতেছে, ধ্যানভঙ্গ করিতেছে, সুখ লুণ্ঠন করিতেছে। বৃদ্ধ প্রিয় কনিষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন; বৃদ্ধকালের স্নেহের পুত্রকে হারাইয়া শোকে ম্রিয়মাণ, অথচ ক্রোধ, গর্ব্ব, হঠকারিতা হৃদয়-দ্বারে অর্গল দিয়া শাল্মী হইয়া বসিয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ করি-

তেছে। কন্যার নামে দুশ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, বৃদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া প্রিয়কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন; বৃদ্ধ জানেন সে নির্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহঙ্কার, স্বার্থ স্নেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহস্র পাপের স্মৃতিতে বৃদ্ধ ভীত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি পাপ প্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দেখিল, মরণ-চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদূত কেবলই উঁকি মারিতেছে ও কপাটে ঠক্ ঠক্ করিতেছে। যতবার এইরূপ শব্দ হয় বৃদ্ধের অন্তরাত্মা ভয়ে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কিরে কেষ্টা, আমি ভাবিতাম বৃদ্ধ পরম সুখী।" বালক বলিল, "ইহাই আমার প্রতাপ। বল দেখি কাহার প্রতাপ বেশী, ও-পাড়ার তিনকড়ি শীলের, না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের? দেখ, হরিমোহন, আমারও পুলিশ আছে, পাহারা আছে, গবর্ণমেন্ট আছে, আইন আছে, বিচার আছে, আমিও রাজা সাজিয়া খেলা করিতে পারি, এই খেলা কি তোমার ভাল লাগে?" হরিমোহন বলিল, "না বাবা। এ ত বড় বদ্ খেলা। তোর বুঝি ভাল লাগে?" বালক হাসিয়া বলিল, "আমার সব খেলা ভাল লাগে। চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও ভালবাসি।" তাহার পর বলিল, "দেখ হরিমোহন, তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেইজন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি সুখী। এই লোকটির কোনই পার্থিব অভাব নাই—অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি কত অধিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কেন, বলিতে পার? মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ-দুঃখ মনের বিকার মাত্র। যাহার কিছু নাই বিপদই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী হইতে পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাইতেছ না, কেবল দুঃখ চিন্তা করিতেছ, ইনিও সেইরূপ নীরস পাপে দিন কাটাইয়া কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই পুণ্যের ক্ষণিক সুখ ও পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষণিক সুখ। এই দ্বন্দ্বে আনন্দ নাই। আনন্দ-আগারের ছবি আমার কাছে; আমার কাছে যে আসে যে আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, আমার উপর জোর করে, অত্যাচার করে—সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে।" হরিমোহন আগ্রহপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে লাগিল। বালক আবার বলিল, "আর দেখ হরিমোহন, শুষ্ক পুণ্য তোমার নিকট নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় করিতে পার না। বৃদ্ধের নিকট পাপ নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও তাহা ছাড়িতে

না পারিয়া—ইহজীবনে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ইহাকে পুণ্যের বন্ধন পাপের বন্ধন বলে। অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বুদ্ধের এই নরকযন্ত্রণা বড় শুভ অবস্থা। তাহাতে তাহার পরিত্রাণ ও মঙ্গল হইবে।"

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন বলিল, "কেষ্টা তোর কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখ দুঃখ মনের বিকার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ। দেখ, ক্ষুধার জ্বালায় মন যখন ছট্‌ফট্‌ করে, কেহ কি পরম সুখী হইতে পারে? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে?" বালক বলিল, "এস, হরিমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব।" এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামাত্র হরিমোহন দেখিল আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জন সুরম্য পর্ব্বতের বায়ুসেবিত শিখরে একজন সন্ন্যাসী আসীন, ধ্যানে মগ্ন, চরণ প্রান্তে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায় শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর হইতে নারাজ হইল, কিন্তু বালক তাহাকে টানিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া গেল। বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বলিল, "দেখ হরিমোহন।" হরিমোহন চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের সামনে খোলা খাতার মত রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহস্রবার লেখা। সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির সিংহদ্বার পার হইয়া সূর্য্যালোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। আবার দেখিল, সন্ন্যাসী অনেকদিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুই দিন শরীর ক্ষুৎপিপাসায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে। হরিমোহন বলিল, "এ কিরে কেষ্টা? বাবাজী তোকে এত ভালবাসেন অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতেছেন। তোর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই! এই নির্জন ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে কে তাঁহাকে আহার দিবে!" বালক বলিল, "আমি দিব, কিন্তু আর এক মজা দেখ।" হরিমোহন দেখিল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক প্রহারে নিকটবর্ত্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্ষুদ্র শতশত পিপীলিকা বাহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্ন্যাসীর কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে একবার ডাকিল, "সখে!" সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। প্রথমে মোহজ্বালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকুহরে সেই বিশ্ববাঞ্ছিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে—যেমন বৃন্দাবনে রাধার কানে বাজিয়াছিল; তাহার পরে শত শত দংশনে বুদ্ধি শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইল। সন্ন্যাসী নাড়িলেন না—সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এ কি? আমার এমন ত কখন হয় নাই। যাক্‌, শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাচয়রূপে আমাকে দংশন করিতেছেন।" হরিমোহন দেখিল, দংশনের

জ্বালা বুদ্ধিতে আর পেঁৗছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূর্ব্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাগুলি মাটিতে পড়িয়া পলাইয়া গেল। হরিমোহন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেষ্টা, এ কি মায়া।" বালক হাততালি দিয়া দুইবার এক পায়ের উপর ঘুরিয়া উচ্চহাস্য করিল। "আমিই জগতের একমাত্র যাদুকর! এ মায়া বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্য। দেখিলে? যন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পারিলেন ত! আবার দেখ।" সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন; শরীর ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিমোহন দেখিল সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে না। এই সময়ে পাহাড় হইতে কে বংশীবিনিন্দিত স্বরে ডাকিল, "সখে!" হরিমোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশীবিনিন্দিত স্বর। তাহার পরে দেখিল, শিলাচয়ের পশ্চাৎ হইতে একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক থালায় উত্তম আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে। হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে আলো দেখাইয়া বলিল, "দেখ্, কি এনেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এলি? এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক্ এলি ত বোস্, আমার সঙ্গে খা।" সন্ন্যাসী ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বসিল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

হরিমোহন কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, সন্ন্যাসীও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পর্ব্বতও নাই। সে একটি ভদ্র পল্লীতে বাস করিতেছে; বিস্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রী-পরিবার আছে, রোজ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছে, ভিক্ষুককে দান করিতেছে, ত্রিসন্ধ্যা করিতেছে, শাস্ত্রোক্ত আচার সযত্নে রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন-প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভীত হইয়া দেখিল যে যাহারা সে ভদ্রপল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে লেশমাত্র সদ্ভাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার রক্ষাকেই পুণ্যবৎ জ্ঞান করিতেছে। প্রথমটা হরিমোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমনি যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না, ধূলি খাইতেছে, কেবলই ধূলি কেবলই ধূলি অনন্ত ধূলি খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সে আর এক পল্লীতে গেল, সেখানে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে অপূর্ব্ব জনতা ও আশীর্ব্বাদের

রোল উঠিতেছিল। হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল, তিনকড়ি শীল দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল। সে ভাবিল, "একি স্বপ্ন! তিনকড়ি শীল আবার দাতা?" তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দেখিল। বুঝিল, সেই মনে লোভ, ঈর্ষা, কাম, স্বার্থ ইত্যাদি সহস্র অতৃপ্ত ও কুপ্রবৃত্তি দোহি দোহি রব করিতেছে। তিনকড়ি পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, গর্ব্বের বশে সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন হিন্দুর নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের নরক, হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, গ্রীকদের স্বর্গ, আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আসিল। তাহার পরে দেখিল, সে নিজ বাড়ীতে পরিচিত ছেঁড়া মাদুরে ময়লা তোশকে ভর দিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে শ্যামসুন্দর। বালক বলিল, "বড় রাত্রি হইয়াছে, বাড়ীতে না ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, মারামারি আরম্ভ করিবে। সংক্ষেপে বলি। যে স্বর্গ নরক দেখিলে, সে স্বপ্নজগতের, কল্পনাসৃষ্ট। মানুষ মরিলে স্বর্গ নরকে যায়, গত জন্মের ভাব অন্যত্র ভোগ করে। তুমি পূর্ব্বজন্মে পুণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, না তুমি ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়াছ, না মানুষকে। প্রাণত্যাগের পরে স্বপ্নজগতে সেই ভদ্রপল্লীতে বাস করিয়া পূর্ব্ব জীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে, ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে গিয়া ধূলিময় নরকে বাস করিলে, শেষ জীবনের পুণ্যফল ভোগ করিয়া আবার তোমার জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন, নীরস বাহ্যিক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কর নাই বলিয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে নীরস পুণ্য করিতেছ, তাহার কারণ এই যে কেবল স্বপ্নজগতের ভোগে পাপ পুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড়ি গত জন্মে দাতাকর্ণ ছিলেন, সহস্র ব্যক্তির আশীর্ব্বাদে এই জন্মে লক্ষপতি ও অভাবশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃপ্ত কুপ্রবৃত্তি এখন পাপ দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবাদ বুঝিলে কি? পুরস্কার বা শাস্তি নহে—কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সৃষ্টি। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ অশুভ, তাহা দ্বারা দুঃখ সৃষ্ট হয়; পুণ্য শুভ, তাহা দ্বারা সুখ সৃষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, অশুভ বিনাশের জন্য। দেখ হরিমোহন, পৃথিবী আমার বৈচিত্র্যময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেখানে কর্ম্ম দ্বারা অশুভ বিনাশ করিবার জন্য

তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেম-রাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ, এক সর্ত্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে পারিবে না। রাজী?" হরিমোহন বলিল, "কেষ্টা, তুই আমাকে গুণ করিলি! তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই।"

বালক হাসিয়া বলিল, "হরিমোহন, কিছু বুঝিলে?" হরিমোহন বলিল, "বুঝিলাম বই কি।" তাহার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "ওরে কেষ্টা, আবার ফাঁকি দিলি। অশুভ সৃজন করিলি কেন, তাহার ত কোন কৈফিয়ৎ দিস্ নি।" এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে শাসাইয়া বলিল, "দূর হ! এক ঘন্টার মধ্যে আমার সব গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইবি?" বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া সরিয়া সহাস্যে বলিল, "কই, হরিমোহন, চাবুক মারিতে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে। সেই ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম না, কখন বাহ্যিক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম শিক্ষা দিবে! তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই।" হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সরিয়া বলিল, "না, সে সুখ তোমার পরজন্মের জন্য রাখিলাম। আসি।" এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিমোহন নূপুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া ভাবিল, "এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! নরক দেখিলাম, স্বর্গ দেখিলাম, তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বলিলাম, ছোট ছেলে বুঝিয়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক, প্রাণে বেশ শান্তি অনুভব করিতেছি।" হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের মোহন মূর্ত্তি ভাবিতে বসিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "কি সুন্দর! কি সুন্দর!"

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটি আশ্রম নন্দন-বনকে ধিক্কার প্রদান করিতেছিল। এক এক খানি ঋষির কুটির তরু, পুষ্প ও বৃক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, "দেবী, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।" এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমার শতপুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সুর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব্ব শান্তির আলয় গভীর হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"আমার শতপুত্র এই জোছনাশোভিত রাত্রে বেদগান করিয়া বেড়াইত, শতপুত্রই আমার বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শতপুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে: তাহার আশ্রম হইতে আমাকে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।" ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই কয়টি বাক্য নিসৃত হইল,—"দেবী, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।" অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, "আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 'ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া সম্বোধন করিলেই তো জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শতপুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।" ঋষির মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল বলিলেন, "তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই, আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।"

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনো-নিবেশ হইতেছে না। তিনি সংকল্প করিয়াছেন আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবেন। সংকল্প কার্য্যে

পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল। ভাবিলেন, "কি করিয়াছি, না জানিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্ব্বিকার চিত্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি।" হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন,—"ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।" গর্ব্বিত হৃদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "উঠ, ব্রহ্মর্ষি উঠ।" দ্বিগুণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, "প্রভু, কেন লজ্জা দেন।" বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি কখনও মিথ্যা বলি না—আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছ।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন।" বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।" অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধরিয়া আছেন বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব বলিলেন, "আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।" তপোবলে গর্ব্বিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।" শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, "আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি পৃথিবী ধৃত হউক—।" তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, "বিশ্বামিত্র এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এক মুহূর্ত্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন।" অনন্তদেব বলিলেন, "মূর্খ বিশ্বামিত্র যাঁর এক মুহূর্ত্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ?" বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল, ভাবিলেন বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন?" বশিষ্ঠদেব অতি ধীর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি যদি তখন তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট

ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন। ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছিল যাহা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন যাঁহাদের প্রভায় পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব্বগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বেদ রহস্য

বেদসংহিতা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস। কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্ব্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম স্রোতও অতি প্রাচীন ঘনকণ্টকময় অরণ্যে পুষ্পিত বৃক্ষলতা ও গুল্মের বিচিত্র (আবরণে) আবৃত। বেদ রহস্যময়। ভাষা, কথার ভঙ্গী, চিন্তার গতি অন্য যুগের সৃষ্টি, অন্য ধরণের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত। এক পক্ষে অতি সরল, যেন নির্ম্মল সবেগ পর্ব্বতনদীর প্রবাহ, অথচ এই চিন্তাপ্রণালী আমাদের এমনই জটিল বোধ হয়, এই ভাষার অর্থ এমনই সন্দিগ্ধ যে মূল চিন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য কথাও লইয়া প্রাচীনকাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। পরম পণ্ডিত সায়নাচার্য্যের টীকা পড়িয়া মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে বেদের কখনই কোনও সংলগ্ন অর্থ ছিল না, নয় যাহা ছিল তাহা বেদের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-রচনার অনেক আগে সর্ব্বগ্রাসী কালের অতল বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল।

সায়ন বেদের অর্থ করিতে গিয়া মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। যেন (কেহ) এই ঘোর অন্ধকারে মিথ্যা আলোকের পিছনে দাঁড়াইয়া বার বার আছাড় খায়, গর্ত্তে পঙ্কে ময়লা জলে পড়ে, হয়রাণ হইয়া যায়, অথচ ছাড়িতেও পারে না। আর্য্যধর্ম্মের আসল পুস্তক, অর্থ করিতেই হয়, কিন্তু এমন হেঁয়ালির কথা, এমন রহস্যময় নানা নিগূঢ় চিন্তার জড়িত সংশ্লেষণ যে সহস্র স্থলে অর্থই করা হয় না, যেখানে কোনও রকমেই অর্থ হয় সেখানেও প্রায়ই সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে। এই সংকটে অনেক বার সায়ন নিরাশ হইয়া ঋষিদের মুখে এমন ব্যাকরণের বিরোধী ভাষা, এমন কুটিল জড়িত ভগ্ন বাক্যরচনা, এমন বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন চিন্তা আরোপ করিয়াছেন যে তাঁহার টীকা পড়িয়া এই ভাষা ও চিন্তাকে আর্য্য না বলিয়া বর্ব্বরের বা উন্মত্তের প্রলাপ বলিতে প্রবৃত্তি হয়। সায়নের দোষ নাই। প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কও তদ্রূপ বিভ্রাট করিয়াছেন আর যাস্কের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণকারও বেদের সরল অর্থ না পাইয়া কল্পনার সাহায্যে mythopoeic faculty-র আশ্রয়ে দুরূহ ঋক্‌গুলির ব্যাখ্যা করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকেরা এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া নানান কল্পিত ইতিহাসের আড়ম্বরে বেদের সুকৃত সরল অর্থ বিকৃত ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। একটি

উদাহরণে এই অর্থ-বিকৃতির ধরণ ও মাত্রা বোঝা যাইবে। পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে অগ্নির নিষ্পেষিত বা ছাপান (গুণ্ঠিত) অবস্থা আর অতি-বিলম্বে তাহার বৃহৎ প্রকাশের কথা আছে। "কুমারং মাতা যুবতিঃ সমুব্ধং গুহা বিভর্ত্তি ন দদাতি পিত্রে।...কমেতং ত্বং যুবতে কুমারং পেষী বিভর্ষি মহিষী জজান। পূর্বীর্হি গর্ভঃ শরদো ববর্ধাপশ্যং জাতং যদসূত মাতা।" ইহার অর্থ, "যুবতী মাতা কুমারকে ছাপান রাখিয়া গুহায় অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে নিজ জঠরে বহন করেন, পিতাকে দিতে চান না। হে যুবতী, এই কুমার কে, যাহাকে তুমি সম্পিষ্ট হইয়া অর্থাৎ তোমার সংকুচিত অবস্থায় নিজের ভিতরে বহন কর? মাতা যখন সংকুচিত অবস্থা ছাড়িয়া মহতী হয়, তখন কুমারকে জন্ম দেন। অনেক বৎসর ধরিয়া গর্ভস্থ শিশু বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন মাতা তাহাকে প্রসব করিলেন, তখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম।" বেদের ভাষা সর্ব্বত্রই একটু ঘন, সংহত, সারবান, অল্প কথায় বিস্তর অর্থ প্রকট করিতে চায়, ইহা সত্ত্বেও অর্থের সরলতা, চিন্তার সামঞ্জস্যের হানি হয় না। ঐতিহাসিকেরা সূক্তের এই সরল অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, যখন মাতা পেষী তখন কুমারং সমুব্ধং, মাতার সম্পিষ্ট অর্থাৎ সংকুচিত অবস্থায় কুমারেরও নিষ্পিষ্ট অর্থাৎ ছাপান অবস্থা হয়, ঋষির ভাষা ও চিন্তার এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য কিম্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা পেষী দেখিয়া পিশাচী বুঝিলেন, ভাবিলেন কোনও পিশাচী অগ্নির তেজ হরণ করিয়াছে, মহিষী দেখিয়া রাজার মহিষী বুঝিলেন, কুমারং সমুব্ধং দেখিয়া কোনও ব্রাহ্মণকুমার রথের চাকায় নিষ্পেষিত হইয়া মরিয়াছে ইহাই বুঝিলেন। এই অর্থে বেশ একটা লম্বা আখ্যায়িকাও সৃষ্টি হইল। ফলে সোজা ঋকের অর্থ দুরূহ হইয়া গেল, কুমার কে, জননী কে, পিশাচী কে, অগ্নির না ব্রাহ্মণকুমারের গল্প হইতেছে, কে কাহাকে কি বিষয়ে কথা বলিতেছে, সব গণ্ডগোল। সর্ব্বত্রই এইরূপ অত্যাচার, অযথা কল্পনার দৌরাত্ম্যে বেদের প্রাঞ্জল অথচ গভীর অর্থ বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, অন্যত্র যেখানে ভাষা ও চিন্তা একটু জটিল, টীকাকারের কৃপায় দুর্ব্বোধ্যতা ভীষণ অস্পৃশ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক্ বা উপমা কেন, বেদের আসল মর্ম্ম লইয়া অতি প্রাচীন কালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রীসদেশীয় য়ুহেমেরের (Euhemeros) মতে গ্রীকজাতির দেবতারা চিরস্মরণীয় বীর ও রাজা ছিল, কালে অন্য প্রকার কুসংস্কারে ও কবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারূঢ় করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতেও য়ুহেমের-পন্থীর অভাব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহারা বলিত আসলে অশ্বিদ্বয় দেবতাও নয়, নক্ষত্রও নয়, বিখ্যাত দুইজন রাজা ছিলেন, আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তবে যদি মৃত্যুর পরে দেব-ভাবাপন্ন হয়। অপরের মতে সবই Solar myth, অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র আকাশ

তারা বৃষ্টি ইত্যাদি বাহ্য প্রকৃতির ক্রীড়াকে কবিকল্পিত নামরূপে সাজাইয়া মনুষ্যাকৃতি দেবতা করা হইয়াছে। বৃত্র মেঘ, বলও মেঘ, আর যত দস্যু দানব দৈত্য আকাশের মেঘ মাত্র, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র এইসকল সূর্য্যকিরণের অবরোধকারী জলবর্ষণে বিমুখ কৃপণ জলধরকে বিদ্ধ করিয়া বৃষ্টিদানে পঞ্চনদের সপ্তনদীর অবাধ স্রোতঃ-সৃজনে ভূমিকে উর্ব্বরা, আর্য্যকে ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তোলেন। অথবা ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা ভগ বরুণ বিষ্ণু সবাই সূর্য্যের নামরূপ মাত্র, মিত্র দিনের দেবতা, বরুণ রাত্রির, ঋভুগণ যাঁহারা মনের বলে ইন্দ্রের অশ্ব, অশ্বিদ্বয়ের রথ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারাও আর কিছুই নন, সূর্য্যের কিরণ। অপর দিকে অসংখ্য গোঁড়া বৈদিকও ছিল, তাহারা কর্ম্মকাণ্ডী ritualist। তাহারা বলে দেবতা মনুষ্যাকৃতি দেবতাই বটে, প্রাকৃতিক শক্তির সর্ব্বব্যাপী শক্তিধরও বটে, অগ্নি একসময়েই বিগ্রহবান দেবতা এবং বেদীর আগুন, পার্থিব অগ্নি, বাড়বানল ও বিদ্যুৎ এই তিন মূর্ত্তিতে প্রকটিত, সরস্বতী নদীও বটে দেবীও বটে, ইত্যাদি। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দেবতারা স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে স্বর্গদান, ইহলোকে বল, পুত্র, গাভী, অশ্ব, অন্ন ও বস্ত্র দান করেন, শত্রুকে সংহার করেন, স্তোতার বেআদবী নিন্দুক সমালোচকের মাথা বজ্রাঘাতে চূর্ণ করেন, ইত্যাদি শুভ মিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হন। প্রাচীন ভারতে এই মতই প্রবল ছিল।

তথাপি এমন চিন্তাশীল লোকের অভাব ছিল না যাঁহারা বেদের বেদত্বে, ঋষির প্রকৃত ঋষিত্বে আস্থাবান ছিলেন, ঋকসংহিতার আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করিতেন, বেদে বেদান্তের মূল তত্ত্ব খুঁজিতেন। তাঁহাদের মতে ঋষিরা দেবতার নিকট যে জ্যোতির্দ্দান প্রার্থনা করিতেন, সে ভৌতিক সূর্য্যের নয়, জ্ঞানসূর্য্যের, গায়ত্রীমন্ত্রোক্ত সূর্য্যের, বিশ্বামিত্র যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই জ্যোতি সেই "তৎসবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ" এই দেবতা ইনি, "যো নো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ," যিনি আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্ত্বের দিকে প্রেরিত করেন। ঋষিরা তমঃ ভয় করিতেন—রাত্রির নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সেই ঘোর তিমির। ইন্দ্র জীবাত্মা বা প্রাণ; বৃত্র মেঘও নয়, কবিকল্পিত অসুরও নয়—যাহা আমাদের পুরুষার্থকে ঘোর অজ্ঞানের অন্ধকারে আবৃত করিয়া রোধ করে, যাহার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নিহিত ও লুপ্ত হইয়া, (পরে) দেববাক্যজনিত উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে নিস্তারিত ও প্রকট হন, তাহাই বৃত্র। সায়নাচার্য্য ইহাদের "আত্মবিদ" নামে অভিহিত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের বেদব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আত্মবিদ্‌কৃত ব্যাখ্যার দৃষ্টান্তস্বরূপ রহূগণ পুত্র গোতম ঋষির মরুৎস্তোত্র (উল্লেখ) করা যায়। সেই সূক্তে গোতম মরুদ্‌গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট "জ্যোতি" ভিক্ষা করিয়াছেন—

যূয়ং তৎ সত্যশবস আবিষ্কর্ত্ত মহিত্বনা
বিধ্যতা বিদ্যুতা রক্ষঃ ॥
গূহতা গুহ্যং তমো বিযাত বিশ্বমত্রিণম্
জ্যোতিষ্কর্ত্তা যদুশ্মসি ॥ ১-৮৬-১০

কর্ম্মকাণ্ডীদের মতে এই ঋক্‌দ্বয়ের ব্যাখ্যায় জ্যোতিকে ভৌতিক সূর্য্যেরই জ্যোতি বুঝিতে হয়। "যে রক্ষঃ সূর্য্যের আলোককে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, মরুদ্‌গণ সে-রক্ষকে বিনাশ করিয়া সূর্য্যের জ্যোতি পুনঃ দৃষ্টি-গোচর করুন।" আত্মবিদের মতে অন্যরূপ অর্থ করা উচিত, যেমন, "তোমরা সত্যের বলে বলী, তোমাদের মহিমায় সেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হোক, তোমাদের বিদ্যুৎসম আলোকে রক্ষকে বিন্ধ কর। হৃদ্‌রূপ গুহায় প্রতিষ্ঠিত অন্ধকার গোপন কর, অর্থাৎ সেই অন্ধকার যেন সত্যের আলোকবন্যায় নিমগ্ন, অদৃশ্য হইয়া যায়। পুরুষার্থের সকল ভক্ষককে অপসারিত করিয়া আমরা যে জ্যোতি চাই, তাহা প্রকটিত কর।" এখানে মরুদ্‌গণ মেঘহন্তা বায়ু নহেন, পঞ্চপ্রাণ। তমঃ হৃদয়গত ভাবরূপ অন্ধকার, পুরুষার্থের ভক্ষক ষড় রিপু, জ্যোতিঃ পরম-তত্ত্বসাক্ষাৎরূপ জ্ঞানের আলোক। এই ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মতত্ত্ব, বেদান্তের মূলকথা, রাজযোগের প্রাণায়াম-প্রণালী একযোগে বেদে পাওয়া গেল।

এই গেল বেদে স্বদেশী বিভ্রাট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোমর বাঁধিয়া আসরে নামায় এই ক্ষেত্রে ঘোরতর বিদেশী বিভ্রাটও ঘটিয়াছে। সেই বন্যার বিপুল তরঙ্গে আমরা আজ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইয়া ভাসিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন নিরুক্তকার ও ঐতিহাসিকদের পুরোন ভিত্তির উপরেই নিজ চকচকে নব কল্পনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাস্কের নিরুক্ত তত মানেন না, বর্লিন ও পেত্রগ্রাদে নবীন মনোনীত নিরুক্ত তৈয়ারি করিয়া তাহারই সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রাচীন ভারতবর্ষীয় টীকাকারদের Solar myth-এর বিচিত্র নবমূর্ত্তি বানাইয়া, প্রাচীন রঙের উপর নূতন রং ফলাইয়া এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া-ছেন। এই য়ুরোপীয় মতেও বেদোক্ত দেবতা বাহ্য প্রকৃতির নানা ক্রীড়ার রূপক মাত্র। আর্য্যেরা সূর্য্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র ঊষা রাত্রি বায়ু ঝটিকা খাল নদী সমুদ্র পর্ব্বত বৃক্ষ ইত্যাদি দৃশ্যবস্তুর পূজা করিতেন। এই সকলকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত বর্ব্বর জাতি এইগুলির বিচিত্র গতিকে কবির রূপকচ্ছলে স্তব করিত। আবার তাহারই মধ্যে নানা দেবতার চৈতন্যময় ক্রিয়া বুঝিয়া সেই শক্তিধরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও তাঁহাদের নিকট যুদ্ধে বিজয়লাভ ধনদৌলত দীর্ঘজীবন আরোগ্য ও সন্ততি কামনা করিতেন, রাত্রির অন্ধকারে বড় ভীত হইয়া যাগ-যজ্ঞে সূর্য্যের পুনরুদ্ধার করিতেন। ভূতেরও আতঙ্ক ছিল, ভূত তাড়াইবার জন্য দেবতার নিকটে কাতরোক্তি করিতেন। যজ্ঞে স্বর্গলাভের আশা

ও প্রবল (ইচ্ছা) ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরের উচিত ধারণা ও কুসংস্কার।

যুদ্ধে বিজয়লাভ, যুদ্ধ কাহার সঙ্গে? ইঁহারা বলেন, পঞ্চনদনিবাসী আর্য্যজাতির সমর আসল ভারতবাসী দ্রাবিড়জাতির সঙ্গে, আর প্রতিবেশীদের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ সতত ঘটিয়া আসে, সেই আর্য্যতে আর্য্যতে ভিতরের কলহ। যেমন প্রাচীন ঐতিহাসিক বেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋক্ বা সূক্তকে আধার করিয়া নানান ইতিহাস গঠন করিতেন, ইঁহাদেরও ঠিক সেই প্রণালী। তবে বিচিত্র অতি-প্রাকৃতঘটনায় ভরা বিচিত্র গল্প না বানাইয়া, জার (জরপুত্র) বৃষ ঋষির সারথ্যে ব্রাহ্মণকুমারের রথচক্রে নিষ্পেষণ, মন্ত্রপ্রয়োগে পুনর্জীবন দান, পিশাচীকৃত অগ্নি-তেজের হরণ ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্ভুত কল্পনা না করিয়া আর্য্য ত্রিৎসুরাজ সুদাসের সঙ্গে মিশ্রজাতীয় দশজন রাজার যুদ্ধ, একদিকে বশিষ্ঠ অপরদিকে বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্য, পর্ব্বতগুহানিবাসী দ্রাবিড় জাতি দ্বারা আর্য্যদের গাভী হরণ ও নদীর স্রোত বন্ধন, দেবশুনি সরমার উপমা-ছলে দ্রাবিড়দের নিকট আর্য্যদৌত্য বা রাজদূতী প্রেরণ, প্রভৃতি সত্য বা মিথ্যা সম্ভব ঘটনা লইয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করেন। এই প্রাকৃতিক ক্রীড়ার পর-স্পর-বিরোধী রূপকের আর তাহার সঙ্গে এই ইতিহাস সম্বন্ধী রূপকের মিল করিতে গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী বেদের যে অপূর্ব্ব গোল করিয়া ফেলি-য়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তবে তাঁহারা বলেন না কি, আমরা কি করিব, প্রাচীন বর্ব্বর কবিদের মন গোলমেলে ছিল, সেই জন্যই এইরূপ গোঁজামিল করিতে হইয়াছে, আমাদের ব্যাখ্যা কিন্তু ঠিক, খাঁটি, নির্ভুল। সে যাহাই হোক, ফলে প্রাচ্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ যেমন অসংলগ্ন গোলমেলে দুরূহ ও জটিল হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের ব্যাখ্যায় সেইরূপই রহিয়াছে। সবই বদলাইয়াছে, অথচ সবই সমান। টেমস, সেন (Seine) ও নেবা (Neva) নদীর শত শত বজ্রধর আমাদের মস্তকের উপর নব পাণ্ডিত্যের স্বর্গীয় সপ্তনদী বর্ষণ করিয়া-ছেন সত্য, তাঁহাদের কেহও বৃত্রকৃত অন্ধকার সরাইতে পারেন নাই। আমরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরে।

তপোদেব অগ্নি

এই যজ্ঞে জীবই যজমান, গৃহস্বামী, জীবের প্রকৃতি গৃহপত্নী, যজমানের সহধর্ম্মিণী, কিন্তু পুরোহিত কে হইবে? জীব যদি স্বয়ং স্বযজ্ঞের পৌরোহিত্য সম্পাদন করিতে যায়, যজ্ঞ সুচারুরূপে পরিচালিত হইবার আশা নাই-ই বলা যায়; কারণ জীব অহঙ্কার দ্বারা চালিত, মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক ত্রিবিধ বন্ধনে জড়িত। এই অবস্থায় স্বপৌরোহিত্য গ্রহণ করায় অহঙ্কারই হোতা ঋত্বিক এমন কি যজ্ঞের দেবতা সাজে, তাহা হইলে অবৈধ যজ্ঞবিধানে মহৎ অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা। প্রথমে নিতান্ত বন্ধ অবস্থা হইতে সে মুক্তি চায়। আর যদি বন্ধনমুক্ত হইতে হয়, স্বশক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় লইতেই হইবে। ত্রিবিধ যুপরজ্জুর শিথিলীকরণের পরেও যজ্ঞ চালাইবার মত নির্দ্দোষ জ্ঞান ও শক্তি হঠাৎ প্রাদুর্ভূত বা সত্বরে সুগঠিত হয় না। দিব্য জ্ঞান ও দিব্য শক্তির প্রয়োজন, তাহার যজ্ঞ দ্বারাই আবির্ভাব ও সংগঠন সম্ভব। আর জীব মুক্ত হইলেও, দিব্যজ্ঞানী ও দিব্যশক্তিমান হইলেও যজ্ঞের ভর্ত্তা অনুমন্তা ঈশ্বরও যজ্ঞফলের ভোক্তা হয়, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা হয় না। দেবতাকেই পুরোহিতরূপে বরণ করিয়া বেদীর উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দেবতা স্বয়ং মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবের পক্ষে দেবত্ব ও অমরত্ব অসাধ্য, সত্য বটে দেবতা জাগ্রত হওয়ার আগে সেই বোধনার্থে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যজমানের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাস ত্রসদস্যু ও ভরতপুত্রের হোতা হন। কিন্তু দেবতাকে আহ্বান করিয়া বেদীর উপরে পুরোহিত ও হোতার স্থান দিবার জন্যই সেই মন্ত্রপ্রয়োগ ও হবিঃপ্রয়োগ। দেবতা অন্তরে জাগ্রত না হইলে কেহ জীবকে তরণ করিতে পারে না। দেবতাই ত্রাণকর্ত্তা। দেবতাই যজ্ঞের একমাত্র সিদ্ধিদাতা পুরোহিত।

দেবতা যখন পুরোহিত হন তখন তাঁহার নাম অগ্নি, তাঁহার রূপও অগ্নি। অগ্নির পৌরোহিত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সফল যজ্ঞের মুখ্য উপায় ও প্রারম্ভ। এইজন্যই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋকে অগ্নির পৌরোহিত্য নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

এই অগ্নি কে? অগ্ ধাতুর অর্থ শক্তি, যিনি শক্তিমান তিনি অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অর্থ আলোক বা জ্বালা, যে-শক্তি জ্বলন্ত জ্ঞানের আলোকে

উদ্ভাসিত, জ্ঞানের কর্ম্মবল স্বরূপ, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নিরূপ। আবার অগ্ ধাতুর অন্য অর্থ পূর্ব্বত্ব ও প্রধানত্ব, যে-জ্ঞানময় শক্তি জগতের আদিতত্ত্ব হইয়া জগতের অভিব্যক্ত সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সেই শক্তির শক্তিধর অগ্নি। আবার অগ্ ধাতুর অর্থ নয়ন (প্রচালন), জগতাদি সনাতন পুরাতন প্রধান শক্তির যে শক্তিধর জগৎকে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যধামের দিকে লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, যে কুমার দেবসেনার সেনানী, যিনি পথে প্রদর্শক, যিনি প্রকৃতির নানা শক্তিকে জ্ঞানে বলে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিয়া সুপথে চালিত করেন, সেই শক্তিধর অগ্নি। বেদের শত শত সূক্তে অগ্নির এই সকল গুণ ব্যক্ত স্তুত হইয়াছে। জগতের আদি, জগতের প্রত্যেক স্ফুরণে নিহিত, সকল শক্তির মূল ও প্রধান, সকল দেবতার আধার, সকল ধর্ম্মের নিয়ামক, জগতের নিগূঢ় উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় সত্যের রক্ষক এই অগ্নি আর কিছুই নন, ভগবানের ওজঃ-তেজঃ-ভ্রাজঃ-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞানমণ্ডিত পরম-জ্ঞানাত্মক তপঃশক্তি।

সচ্চিদানন্দের সৎতত্ত্ব চিন্ময়। এই যে সতের চিৎ, সে-ই আবার সতের শক্তি। চিৎশক্তিই জগতের আধার, চিৎশক্তিই জগতের আদিকারণ ও স্রষ্টা, চিৎশক্তিই জগতের নিয়ামক ও প্রাণস্বরূপ। চিন্ময়ী যখন সৎপুরুষের বক্ষস্থলে মুখ লুকাইয়া স্তিমিতলোচনে কেবল সতের স্বরূপ চিন্তা করেন, তখন অনন্ত চিৎশক্তি নিস্তব্ধ হয়, সেই অবস্থা প্রলয় অবস্থা, নিস্তব্ধ আনন্দসাগরস্বরূপ। আবার যখন চিন্ময়ী মুখ তুলিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া সৎপুরুষের মুখ ও তনু সপ্রেমে দেখেন, সৎপুরুষের অনন্ত নাম ও রূপ ধ্যান করেন, কৃত্রিম বিচ্ছেদ-মিলন জনিত সম্ভোগের লীলা স্মরণ করেন, তখন সেই আনন্দের অজস্র প্রবাহ তাহার উন্মত্ত বিক্ষোভ বিশ্বানন্দের অনন্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে। চিৎশক্তির এই নানা ধ্যান এই একমুখী অথচ বহুমুখী সমাধিই তপঃশক্তির নামে অভিহিত। সৎপুরুষ যখন তাঁহার চিৎশক্তিকে কোনও নামরূপসৃজন, কোনও তত্ত্ববিকাশ, কোনও অবস্থাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংগৃহীত, সঞ্চালিত, স্ববিষয়ের উপর সংস্থাপিত করেন, তখন তপঃশক্তির প্রয়োগ হয়। এই তপঃপ্রয়োগই যোগেশ্বরের যোগ। ইহাকেই ইংরাজীতে Divine Will বা Cosmic Will বলে। এই Divine Will বা তপঃশক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, চালিত, রক্ষিত হয়। অগ্নিই এই তপঃ।

চিৎশক্তির দুই দিক দেখি, চিন্ময় ও তপোময়, সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটিই এক। ভগবানের জ্ঞান সর্ব্বশক্তিময়, তাঁহার শক্তি সর্ব্বজ্ঞানময়। তিনি আলোকজ্ঞান করিলেই আলোকসৃষ্টি অনিবার্য্য, কারণ তাঁহার জ্ঞান তাঁহার শক্তির চিন্ময় স্বরূপ মাত্র। আবার জগতের যে কোন জড়স্পন্দনেও, যেমন অণুর নৃত্যে বা বিদ্যুতের লম্ফনে, জ্ঞান নিহিত,

কারণ তাঁহার শক্তি তাঁহার জ্ঞানের স্ফুরণ মাত্র। কেবল আমাদের মধ্যে অবিদ্যার ভেদবুদ্ধিতে, অপরা প্রকৃতির ভেদগতিতে, জ্ঞান ও শক্তি বিভিন্ন অসম ও পরস্পরে যেন কলহপ্রিয় বা অমিলে ক্লিষ্ট ও খর্ব্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে অথবা ক্রীড়ার্থে সেইরূপ অসমতা ও কোন্দলের ঢং করে। প্রকৃতপক্ষে জগতের ক্ষুদ্রতম কর্ম্ম বা সঞ্চারে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি নিহিত, ইহার ব্যতিরেকে বা ইহার কমেতে সে কর্ম্ম বা সঞ্চার ঘটাইবার কাহারও শক্তি নাই। যেমন ঋষির বেদবাক্যে বা শক্তিধর মহাপুরুষের যুগপ্রবর্ত্তনে, তেমনি মূর্খের নিরর্থক বাচালতায় বা আক্রান্ত ক্ষুদ্র কীটের ছট্‌ফটানিতে এই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তি প্রযুক্ত হয়। তুমি আমি যখন জ্ঞানের অভাবে শক্তির অপচয় করি বা শক্তির অভাবে জ্ঞানের নিষ্ফল প্রয়োগ করি, সর্ব্বজ্ঞানী সর্ব্বশক্তিমান আড়ালে বসিয়া সেই শক্তিপ্রয়োগকে তাঁহার জ্ঞান দ্বারা, সেই জ্ঞানপ্রয়োগকে তাঁহার শক্তিদ্বারা সামলান ও চালান বলিয়া সেই ক্ষুদ্র চেষ্টায় জগতে একটা কিছু হয়। নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইয়া উঠিল, তাহার উচিত কর্ম্মফলও সাধিত হইল। ইহাতে আমার তোমার অজ্ঞ মনোরথ ও প্রত্যাশা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু সেই বৈফল্যেই তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধি সাধিত হয় এবং সেই বৈফল্যেই আমাদের কোনও ছদ্মবেশী কল্যাণ ও জগতের মহান উদ্দেশ্যের এক ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষুদ্র আংশিক অথচ অত্যাবশ্যক উপকার সিদ্ধ হয়। অশুভ, অজ্ঞান ও বৈফল্য ছদ্মবেশ মাত্র। অশুভে শুভ অজ্ঞানে জ্ঞান, বৈফল্যে সিদ্ধি ও শক্তি গুপ্ত হইয়া অপ্রত্যাশিত কর্ম্ম সম্পাদন করে। তপঃ-অগ্নির নিগূঢ় অবস্থিতি ইহার কারণ। এই অনিবার্য্য শুভ, এই অখণ্ডনীয় জ্ঞান, এই অবিতথ শক্তি ভগবানের অগ্নিরূপ। যেমন সৎপুরুষের চিৎ ও তপঃ এক, যেমন দুইটিই আনন্দের স্পন্দন, সেইরূপে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ এই অগ্নিরও জ্ঞান ও শক্তি অবিচ্ছিন্ন এবং দুইটিই শুভ ও কল্যাণকর।

জগতের বাহিরের আকৃতি অন্যরূপ, সেখানে অনৃত, অজ্ঞান, অশুভ, বৈফল্যই প্রধান। অথচ এই ছেলেকে ভয় দেখান মুখোসের ভিতরে মাতৃমুখ লুক্কায়িত। এই অচেতন, এই জড়, এই নিরানন্দ ভেল্কী মাত্র, ভিতরে জগৎপিতা জগন্মাতা জগদাত্মা সচ্চিদানন্দ আসীন। এইজন্য বেদে আমাদের সাধারণ চৈতন্য রাত্রী নামে অভিহিত। আমাদের মনের চরম বিকাশও জ্যোৎস্নাপুলকিত তারানক্ষত্রমণ্ডিত ভগবতী রাত্রীর বিহার মাত্র। কিন্তু এই রাত্রীর কোলে তাঁহার ভগিনী দৈবী উষা অনন্তপ্রসূত ভাবী দিব্যজ্ঞানের আলোক লইয়া লুক্কায়িত। পার্থিবচৈতন্যের এই রাত্রিতেও তপঃ-অগ্নি পুনঃপুনঃ জাজ্বল্যমান হইয়া উষার আভাতে আলোক বিস্তার করেন। তপঃ-অগ্নিই অন্ধ জগতে সত্যচৈতন্যময়ী উষার জন্মমুহূর্ত্ত প্রস্তুত করিতেছেন। পরম দেবতা এই তপঃ-অগ্নিকে জগতে প্রেরণ ও স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যেক

পদার্থ ও জীবজন্তুর অন্তরে নিহিত হইয়া বিশ্বের সমস্ত গতিকে অগ্নিই নিয়মন করিতেছেন। ক্ষণিক অনৃতের মধ্যে সেই অগ্নিই চিরন্তন সত্যের রক্ষক, অচেতনে ও জড়ে অগ্নিই অচেতনের নিগূঢ় চৈতন্য, জড়ের প্রচণ্ড গতি শক্তি। অজ্ঞানের আবরণে অগ্নিই ভগবানের গূঢ় জ্ঞান, পাপের বৈরূপ্যে অগ্নিই তাঁহার সনাতন অকলঙ্ক শুদ্ধতা, দুঃখ-দৈন্যের বিমর্ষ কুয়াশায় অগ্নিই তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বভোগী আনন্দ, দুর্ব্বলতা ও জড়তার মলিন বেশে অগ্নিই তাঁহার সর্ব্ব-বাহক সর্ব্বক্ষম বিশারদ ক্রিয়াশক্তি। একবার এই কৃষ্ণ আবরণ ভেদ করিয়া যদি অগ্নিকে আমাদের অন্তরে প্রজ্বলিত প্রকাশিত উন্মুক্ত ও উর্দ্ধ্বগামী করিতে পারি, তিনিই দৈবী উষাকে মানবচৈতন্যে আনিয়া দেবগণকে ভিতরে জাগাইয়া অনৃত অজ্ঞান নিরানন্দ বৈফল্যের কৃষ্ণ আবরণকে সরাইয়া আমাদিগকে অমর ও দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলিবেন। অগ্নিই অন্তরস্থ দেবতার প্রথম ও প্রধান জাগ্রত রূপ। তাঁহাকে হৃদয়বেদীতে প্রজ্বলিত করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া—তাহার সুবর্ণ প্রকাশক জ্বালা জ্ঞান, তাহার সর্ব্বদাহক ও পাবক জ্বালা শক্তি—সেই জ্ঞানময় শক্তিময় জ্বলন্ত আগুনে আমাদের এই সকল তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, এই সকল ক্ষুদ্র পরিমিত চেষ্টা ও বৈফল্য, এই সমুদয় মিথ্যা ও মৃত্যু সমর্পিত করি। পুরাতন ও অনৃত ভস্মীভূত হৌক, নূতন ও সত্য জাজ্বল্য-মান সাবিত্রীরূপে গগনস্পর্শী তপঃ-অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইবে।

ভুলিও না যে সকলই আমাদের অন্তরে, মানবের ভিতরেই অগ্নি, ভিতরেই বেদী, হবিঃ ও হোতা, ভিতরেই ঋষি, মন্ত্র ও দেবতা, ভিতরেই ব্রহ্মের বেদগান, ভিতরেই ব্রহ্মদ্বেষী রাক্ষস ও দেবদ্বেষী দৈত্য, ভিতরেই বৃত্র ও বৃত্রহন্তা, ভিতরেই দেবদৈত্য যুদ্ধ, ভিতরেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু অথর্ব্বা সুদাস ত্রসদস্যু দাসজাতি ও পঞ্চবিধ ব্রহ্মান্বেষী আর্য্যগণ। মানবের আত্মা ও জগৎ এক। তাহার ভিতরেই দূর ও নিকট, দশ দিক, দুই সমুদ্র, সপ্ত নদী সপ্ত ভুবন। দুই গুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে আমাদের এই পার্থিব জীবন প্রকা-শিত। নিম্নের সমুদ্র সেই গুহ্য অনন্ত চৈতন্য যাহা হইতে এই সমুদয় ভাব ও বৃত্তি, নাম ও রূপ অহরহঃ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাদুর্ভূত, যেমন ভগবতী রাত্রীর কোলে তারানক্ষত্র প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে আধুনিক ভাষায় অচেতন (inconscient) বা অচেতন-চৈতন্য (subconscient) বলে, বেদের অপ্র-কেতং সলিলং, প্রজ্ঞাহীন সমুদ্র। প্রজ্ঞাহীন হইলেও সে অচেতন নয়, তাহার মধ্যে প্রজ্ঞাতীত বিশ্বচৈতন্য সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মে সমর্থ হইয়া যেন অবশ সঞ্চারে জগতের সৃষ্টি ও গতি সম্পাদিত করে। উপরে গুহ্য মুক্ত অনন্ত চৈতন্য যাহাকে অতিচৈতন্য (superconscient) বলে, যাহার ছায়া এই অচেতন-চেতন। সেখানে সচ্চিদানন্দ জগতে পূর্ণপ্রকাশিত,—সত্যলোকে অনন্ত সৎরূপে তপলোকে অনন্ত চিৎ-রূপে, জনলোকে অনন্ত আনন্দরূপে,

মহর্লোকে বিশাল বিশ্ব-আত্মার সত্যরূপে। মধ্যস্থ পার্থিব চৈতন্য বেদোক্ত পৃথিবী। এই পৃথিবী হইতে জীবনের আরোহণীয় পর্ব্বত গগনে উঠে, তাহার প্রত্যেক সানু আরোহণের একটি সোপান, প্রত্যেক সানু সপ্তলোকের একটি লোকের অন্তঃস্থ রাজ্য। দেবতারা আরোহণের সহায়, দৈত্যেরা শত্রু ও পথ-রোধক। এই পর্ব্বতারোহণই বৈদিক সাধকের যজ্ঞগতি, যজ্ঞের সহিত পরম-লোকে পরম আকাশে আলোকসমুদ্রে উঠিতে হইবে। আরোহণের এই অগ্নিই সাধনস্বরূপ, এই পথের নেতা, এই যুদ্ধের যোদ্ধা, এই যজ্ঞের পুরোহিত; বৈদিক কবিগণের অধ্যাত্মজ্ঞান এই মূল উপমার উপর প্রতিষ্ঠিত যেমন বৃন্দা-বনবাসী প্রেমিক গোপ-গোপীর উপর বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানসকল। এই উপমার অর্থ সর্ব্বদা মনে রাখিলে বেদতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া উঠে।

ঋগ্বেদ

ভূমিকা

"আর্য্য" পত্রিকায় "বেদ রহস্যে" বেদ সম্বন্ধে যে নূতন মত প্রকাশিত হইতেছে, এইগুলি সেই মতের অনুযায়ী অনুবাদ। সেই মতে, বেদের প্রকৃত অর্থ আধ্যাত্মিক, কিন্তু গুহ্য ও গোপনীয় বলিয়া অনেক উপমা, সঙ্কেত-শব্দ, বাহ্যিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের যোগ্য বাক্যসকল দ্বারা সেই অর্থ আবৃত। আবরণ সাধারণের পক্ষে অভেদ্য, দীক্ষিত বৈদিকের পক্ষে পাতলা ও সত্যের সর্ব্বাঙ্গ-প্রকাশক বস্তু মাত্র ছিল। উপমা ইত্যাদির পিছনে এই অর্থ খুঁজিতে হইবে। দেবতাদের "গুপ্ত নাম" ও স্ব স্ব ক্রিয়া, "গো" "অশ্ব" "সোমরস" ইত্যাদি সঙ্কেতশব্দের অর্থ, দৈত্যদের কর্ম্ম ও গূঢ় অর্থ, বেদের রূপক, myth ইত্যাদির তাৎপর্য্য জানিতে পারিলে বেদের অর্থ মোটামুটি বোঝা যায়। অবশ্য তাহার গূঢ় অর্থের প্রকৃত ও সূক্ষ্ম উপলব্ধি বিশেষ জ্ঞান ও সাধনার ফল, বিনা সাধনে কেবল বেদাধ্যয়নে হয় না।

এই সকল বেদতত্ত্ব বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মুখ্য কথা সংক্ষেপে বলিব। সেই কথা এই। জগৎ ব্রহ্মময় কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব মনের অজ্ঞেয়। অগস্ত্য ঋষি বলিয়াছেন "তৎ অদ্ভূতং," অর্থাৎ সকলের উপরে ও সকলের অতীত, কালাতীত। আজও নহে, কল্য নহে, কে তাহা জানিতে পারিয়াছে? আর সকলের চৈতন্যে তাহার সঞ্চার, কিন্তু মন যদি নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করে, "তৎ" অদৃশ্য হয়। কেনোপনিষদের রূপকেরও এই অর্থ, ইন্দ্র ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হন, নিকটে এলেই ব্রহ্ম অদৃশ্য। তথাপি তৎ "দেব"-রূপে জ্ঞেয়।

দেবও "অদ্ভুত", কিন্তু ত্রিধাতুতে প্রকাশিত—অর্থাৎ দেব সন্ময়, চিৎশক্তি-ময়, আনন্দময়। আনন্দতত্ত্বে দেবকে লাভ করা যায়। দেব নানারূপে, বিবিধ নামে জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ও ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই নামরূপসকল বেদের দেবতা সকল।

বেদে বলে, প্রকাশ্য জগতের উপরে ও নিম্নে দুই সমুদ্র আছে। নিম্ন অপ্রকেত "হৃদ্য" বা হৃদসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে subconscient বলে—উপরে সৎসমুদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে superconscient বলে। দুটিকে গুহা বা গুহ্যতত্ত্ব বলে। ব্রহ্মণষ্পতি অপ্রকেত হইতে বাক্ দ্বারা ব্যক্তকে প্রকাশ করেন, রুদ্র প্রাণতত্ত্বে প্রবিষ্ট হয়ে রুদ্রশক্তিদ্বারা বিকাশ করেন, উপরের

দিকে জোর করিয়া তোলেন, ভীম তাড়নায় গন্তব্যপথে চালান, বিষ্ণু ব্যাপক শক্তিদ্বারা ধারণ করিয়া এই নিত্যগতির সৎসমুদ্র বা জীবনের সপ্ত নদীর গন্তব্যস্থল অবকাশ দেন। অন্য সকল দেবতা এই গতির কর্ম্মকারক, সহায়, উপায়।

সূর্য্য সত্যজ্যোতির দেবতা, সবিতা অর্থাৎ সৃজন করেন, ব্যক্ত করেন, পূষা অর্থাৎ পোষণ করেন, "সূর্য্য" অর্থাৎ অনৃতের অজ্ঞানের রাত্রি হইতে সত্যের জ্ঞানের আলোক জন্মাইয়া দেন। অগ্নি চিৎশক্তির "তপঃ," জগৎকে নির্ম্মাণ করেন, জগতের সর্ব্ববস্তুর ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি ভূতত্ত্বে অগ্নি, প্রাণতত্ত্বে কামনা ও ভোগপ্রেরণা, যাহা পান তাহা ভক্ষণ করেন, মনস্তত্ত্ব চিন্তাময় প্রেরণা ও ইচ্ছাশক্তি, মনের অতীত তত্ত্বে জ্ঞানময় ক্রিয়াশক্তির অধীশ্বর।

প্রথম মণ্ডল—সূক্ত ১

মূল ও ব্যাখ্যা

অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥

অগ্নিকে ভজনা করি যিনি যজ্ঞের দেব পুরোহিত, ঋত্বিক, হোতা এবং আনন্দ-ঐশ্বর্য্যের বিধানে শ্রেষ্ঠ।

ঈড়ে—ভজামি, প্রার্থয়ে, কাময়ে। ভজনা করি।

পুরোহিতং—যে যজ্ঞে পুরঃ সম্মুখে স্থাপিত; যজমানের প্রতিনিধি ও যজ্ঞের সম্পাদক।

ঋত্বিজম্—যে ঋতু অনুসারে অর্থাৎ কাল দেশ নিমিত্ত অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করে।

হোতারং—যে দেবতাকে আহ্বান করিয়া হোম নিষ্পাদন করে।

রত্নধা—সায়ন রত্নের অর্থ রমণীয় ধন করিয়াছেন। আনন্দময় ঐশ্বর্য্য বলিলে যথার্থ অর্থ হয়।

"ধা"-র অর্থ যে ধারণ করে বা বিধান করে বা যে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে।

অগ্নি পূর্ব্বেভির্ ঋষিভির্ ঈড্যো নূতনৈর্ উত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥২॥

যে অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিগণের ভজনীয় ছিলেন, তিনি নূতন ঋষিদেরও (উত) ভজনীয়। কেননা তিনি দেবগণকে এই স্থানে আনয়ন করেন।

ভজনীয়ত্বের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, 'স' শব্দ সেই আভাস দেয়। এহ বক্ষতি—ইহ আবহতি। অগ্নি স্বরথে দেবতাদিগকে আনয়ন করেন।

অগ্নিনা রয়িম্ অশ্নবৎ পোষম্ এব দিবে দিবে
যশসং বীরবত্তমম্ ॥ ৩ ॥

রয়িং—রত্নর যে অর্থ, রয়িঃ, রাধঃ, রায়ঃ ইত্যাদির সেইই অর্থ। তবে রত্ন শব্দে "আনন্দ" অর্থ অধিক প্রস্ফুট।
অশ্নবৎ—অশ্নুয়াৎ। প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে।
পোষম্ প্রভৃতি রয়ির বিশেষণ। পোষং অর্থাৎ যে পুষ্ট হয়, যে বৃদ্ধি পায়।
যশসং—সায়ন যশ শব্দের অর্থ কখন কীর্ত্তি কখন অন্ন করিয়াছেন। আসল অর্থ বোধহয় যেন সাফল্য, লক্ষ্যস্থান প্রাপ্তি ইত্যাদি। দীপ্তি অর্থও সংগত কিন্তু এখানে তাহা খাটে না।

অগ্নে যম্ যজ্ঞম্ অধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূর্ অসি
স ইদ্ দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

যে অধ্বর যজ্ঞের সর্ব্বদিকে তুমি ঘিরিয়া প্রাদুর্ভূত, সেই যজ্ঞ দেবদের নিকট গমন করে।

অধ্বরং—ধ্বৃ ধাতু হিংসা করা। সায়ন "অহিংসিত যজ্ঞ" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু "অধ্বর" শব্দ স্বয়ং যজ্ঞবাচক হইয়া গিয়াছে, "অহিংসিত" শব্দের সেই-রূপ পরিণাম অসম্ভব। অধ্বন্ অর্থ পথ, অধ্বর পথগামী বা পথস্বরূপই হইবে। যজ্ঞ দেবধাম গমনের পথ ছিল আবার যজ্ঞ দেবধামের পথিক বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত। এই অর্থ সংগত। অধ্বর যে অধ্বনের মত অধ্ ধাতু সম্ভূত, ইহার এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে অধ্বা ও অধ্বর দুইটিই আকাশ অর্থে ব্যবহৃত ছিল।
পরিভূঃ—পরিতো জাতঃ।
দেবেষু—সপ্তমী দ্বারা লক্ষ্যস্থান নির্দ্দিষ্ট।
ইৎ—এব

অনুবাদ

যিনি দেবতা হইয়া আমাদের যজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক ও হোতা সাজেন এবং অশেষ আনন্দ বিধান করেন, সেই তপোদেব অগ্নিকে ভজনা করি। ১

যেমন প্রাচীন ঋষিদের তেমনই আধুনিক সাধকদেরও এই তপোদেবতা ভজনার যোগ্য। তিনিই দেবগণকে এই মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করেন। ২

তপঃ-অগ্নি দ্বারাই মানুষ দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। সেই ঐশ্বর্য্য অগ্নি-বলে দিন দিন বর্দ্ধিত, অগ্নিবলে বিজয়স্থলে অগ্রসর, অগ্নিবলে বহুল বীর-শক্তিসম্পন্ন হয়। ৩

হে তপঃ-অগ্নি, যে দেবপথগামী যজ্ঞের সর্ব্বদিকে তোমার সত্তা অনুভূত, সেই আত্ম-প্রয়াসই দেবতার নিকট পহুঁছিয়া সিদ্ধ হয়। ৪

এই তপঃ-অগ্নি যিনি হোতা, সত্যময়, সত্যদৃষ্টিতে যাঁহার কর্ম্মশক্তি স্থাপিত, নানাবিধ জ্যোতির্ম্ময় শ্রৌতজ্ঞানে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই দেববৃন্দকে লইয়া যজ্ঞে নামিয়া আসুন। ৫*

হে তপঃ-অগ্নি, যে তোমাকে দেয়, তুমি যে তাহার শ্রেয়ঃ সৃষ্টি করিবেই, ইহাই তোমার সত্যসত্তার লক্ষণ। ৬*

অগ্নি, প্রতিদিন দিবারাত্রে আমরা তোমার নিকট বুদ্ধির চিন্তা দ্বারা আত্মসমর্পণকে উপহারস্বরূপে বহন করিয়া আগত হই। ৭*

দেবোন্মুখ সকল প্রয়াসের নিয়ামক, সত্যের দীপ্তিময় রক্ষক, যিনি স্বীয় ধামে সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইতেছেন, তাহারই নিকট আগত হই। ৮*

যেমন পিতার সামীপ্য সন্তানের সুলভ, তুমিও সেইরূপ আমাদের নিকট সুলভ হও। দৃঢ়সঙ্গী হইয়া কল্যাণগতি সাধিত কর। ৯*

---

* অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ ॥ ৫
মদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯

আধ্যাত্মিক অর্থ

বিশ্বযজ্ঞ

বিশ্বজীবন একটি বৃহৎ যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞের দেবতা স্বয়ং ভগবান, প্রকৃতি যজ্ঞদাতা। ভগবান শিব, প্রকৃতি উমা, উমা হৃদয়ের অন্তরে শিবরূপকে ধারণ করিয়াও প্রত্যক্ষ-শিবরূপহারা, প্রত্যক্ষ শিবরূপকে পাইবার জন্য লালায়িত। এই লালসা বিশ্বজীবনের নিগূঢ় অর্থ।

কিন্তু কি উপায়ে সফল মনোরথ হয়? পুরুষোত্তমকে পহুঁছিয়া পাইবার কোন্ পথ প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট? নিজ স্বরূপে পহুঁছিয়া পুরুষোত্তমের স্বরূপকে পাইবার কি উপায়? চক্ষে অজ্ঞানের আবরণ, চরণে স্থূলের সহস্র নিগড়। স্থূল সত্তা অনন্ত সৎকেও যেন সান্তে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, নিজেও যেন বন্দী হইয়া পড়িয়াছে, স্বয়ংগঠিত এই কারাগারের হারান চাবি আর হাতে পায় না। জড়-প্রাণশক্তির অবশ সঞ্চারে অনন্ত উন্মুক্ত চিৎ-শক্তি যেন বিমূঢ়, নিলীন, অভিভূত, অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। অনন্ত আনন্দ যেন তুচ্ছ সুখ-দুঃখের অধীন প্রাকৃত চৈতন্য সাজিয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে বেড়াইতে নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না, খুঁজিতে খুঁজিতে আরও দুঃখের অসীম পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া যায়। সত্য যেন অনৃতের দ্বিধাময় তরঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে। মানসাতীত বিজ্ঞানতত্ত্ব অনন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠাস্থল। বিজ্ঞানতত্ত্বের ক্রিয়া পার্থিবচৈতন্যে হয় নিষিদ্ধ নয় বিরল, যেন আড়াল হইতে ক্ষণিক বিদ্যুতের উন্মেষ মাত্র। সত্যানৃতে দোলায়মান ভীরু খঞ্জ বিমূঢ় মানসতত্ত্ব ঘুরিয়া ফিরিয়া সত্যকে অন্বেষণ করিতেছে, রাক্ষসী প্রয়াসে সত্যের আভাসকে পাইতেও পারে কিন্তু সত্যের পূর্ণ প্রকৃত জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত রূপকে আর পায় না। যেমন জ্ঞানে, তেমনই কর্ম্মেও সেই-ই বিরোধ, সেই-ই অভাব, সেই-ই বৈফল্য। সহজ সত্যকর্ম্মের হাস্যময় দেবনৃত্যের স্থানে প্রাকৃত ইচ্ছাশক্তির নিগড়বদ্ধ চেষ্টা, সত্য-অসত্য পাপ-পুণ্য বিষ-অবিষ কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্মের জটিল পাশে ছটফট করিতেছে। বাসনাহীন বৈফল্যহীন আনন্দময় প্রেমময় ঐক্যরসে মত্ত ভাগবতী ক্রিয়া-শক্তি মুক্ত, অকুণ্ঠিত, অসফলিত। তাহার স্বাভাবিক সহজ বিশ্বময় সঞ্চরণ প্রাকৃত ইচ্ছাশক্তির অসম্ভব। সান্তের অনৃত-ফাঁদে পড়া এই পার্থিব প্রকৃতির সেই অনন্ত সৎ, সেই অনন্ত চিৎশক্তি, সেই অনন্ত আনন্দ-চৈতন্য লাভ করিবার কি বা আশা, কি বা উপায়?

যজ্ঞই উপায়। যজ্ঞের অর্থ আত্মসমর্পণ, আত্মবলিদান। যাহা তুমি আছ, যাহা তোমার আছে, যাহা ভবিষ্যতে স্বচেষ্টায় বা দেবকৃপায় হইতে পার, যাহা কর্ম্মপ্রবাহে অর্জ্জন বা সঞ্চয় করিতে পার, সবই সেই অমৃতময়ের উদ্দেশে

হবিঃরূপে তপঃ অগ্নিতে ঢাল। ক্ষুদ্র সর্ব্বস্ব দানে অনন্ত সর্ব্বস্ব লাভ করিবে। যজ্ঞে যোগ নিহিত। যোগে আনন্ত্য, অমরত্ব ও ভাগবত আনন্দপ্রাপ্তি বিহিত। ইহাই প্রকৃতির উদ্ধারের পথ।

জগতী দেবী সেই রহস্য জানেন। অতএব সেই বিপুল আশায় তিনি অনিদ্রিত অশান্ত, দিনরাত্রি বৎসর পর বৎসর যুগ পরে যুগ তিনি যজ্ঞই করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা সেই বিশ্বযজ্ঞের অঙ্গমাত্র। যাহাই উৎপাদন করিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলি দিতেছেন। তিনি জানেন, সকলের ভিতরে সেই লীলাময় অকুণ্ঠিত মনে রসাস্বাদন করিতেছেন, যজ্ঞ বলিয়া সর্ব্ব চেষ্টা সর্ব্ব তপস্যা গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই বিশ্বযজ্ঞকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকিয়া বাঁকিয়া উত্থানে পতনে জ্ঞানে অজ্ঞানে জীবনে মৃত্যুতে নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যধামের দিকে সর্ব্বদাই অগ্রসর করাইয়া দিতেছেন। তাঁহার ভরসায় প্রকৃতিদেবী নির্ভীক অকুণ্ঠিত বিচারহীন। সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই ভাগবতী প্রেরণা বুঝিয়া সৃজন ও হনন, উৎপাদন ও বিনাশ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, পক্ব অপক্ব, কুৎসিৎ সুন্দর, পবিত্র অপবিত্র, যাহা হাতে পান সবই সেই বৃহৎ চিরন্তন হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন। স্থূল সূক্ষ্ম যজ্ঞের হবিঃ, জীব যজ্ঞের বদ্ধ পশু। যজ্ঞের মন-প্রাণ-দেহরূপ ত্রিবন্ধনযুক্ত যূপকাষ্ঠে জীবকে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রকৃতি তাহাকে অহরহঃ বলি দিতেছেন। মনের বন্ধন অজ্ঞান, প্রাণের বন্ধন দুঃখ, বাসনা ও বিরোধ, দেহের বন্ধন মৃত্যু।

প্রকৃতির উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু এই বদ্ধ জীবের কি উপায় হইবে? উপায় যজ্ঞ, আত্মদান, আত্মবলি। তবে প্রকৃতির অধীন না হইয়া, প্রকৃতির দ্বারা দত্ত না হইয়া স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া যজমান সাজিয়া সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। ইহাই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য যে পুরুষই যেমন যজ্ঞের দেবতা, পুরুষও যজ্ঞের বস্তু। জীবও পুরুষ। পুরুষ নিজ শরীর মন প্রাণ বলিরূপে, যজ্ঞের প্রধান উপায়রূপে, প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মদানে এই গুপ্ত উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে একদিন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিকে নিজ হাতে লইয়া প্রকৃতিকে যজ্ঞের সহধর্ম্মিণী করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। এই গুপ্ত কামনা পূরণার্থে নরের সৃষ্টি। নরমূর্ত্তিতে তিনি সেই লীলা করিতে চান। আত্মস্বরূপ, অমরত্ব, অনন্ত আনন্দের বিচিত্র আস্বাদন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম নরদেহে নরচৈতন্যে ভোগ করিতে হইবে। এই সকল আনন্দ পুরুষের নিজের মধ্যে আছেই, পুরুষ নিজের মধ্যে সনাতনরূপে সনাতন ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মানবকে সৃষ্টি করিয়া বহুতে একত্ব, সান্তে অনন্ত, বাহ্যতে আন্তরিকতা, ইন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয়, পার্থিবে অমরলোকত্ব, এই বিপরীত রস গ্রহণে তিনি তৎপর। আমাদেরই মধ্যে মনের উপরে, বুদ্ধির ওপারে গুপ্ত সত্যময় বিজ্ঞানতত্ত্বে বসিয়া, আবার আমাদেরই মধ্যে হৃদয়ের নীচে

চিত্তের যে গুপ্ত স্তর, যেখানে হৃদয়গুহা, যেখানে নিহিত গুহ্য চৈতন্যের সমুদ্র, হৃদয় মন প্রাণ দেহ বুদ্ধি যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গ মাত্র, সেইখানে বসিয়া এই পুরুষ প্রকৃতির অন্ধ প্রয়াস, অন্ধ অন্বেষণ, দ্বন্দ্ব প্রতিঘাতে ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টার রসাস্বাদন করিতেছেন। উপরে সজ্ঞানে ভোগ, নিম্নে অজ্ঞানে ভোগ, এইরূপ দুইটাই একসঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু চিরদিন এই অবস্থায় মগ্ন হইলে তাঁহার নিগূঢ় প্রত্যাশা, তাঁহার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের জাগরণের দিন বিহিত। অন্তরস্থ দেবতা একদিন অবশ পুণ্যহীন প্রাকৃত আত্মবলি ত্যাগ করিয়া সজ্ঞানে সমন্ত্রে যজ্ঞ সম্পাদন আরম্ভ করিবেন। এই সজ্ঞান সমন্ত্র যজ্ঞ বেদোক্ত "কর্ম্ম"। তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, বিশ্বময় বহুত্বে সম্পূর্ণতা, যা বেদে বিশ্বদেব্য ও বৈশ্বানরত্ব বলে, আর একাত্মক পরমদেবসত্তায় অমরত্বলাভ। এই বেদোক্ত দেবগণ অর্ব্বাচীন সাধারণের হেয় ইন্দ্র অগ্নি বরুণ নামক ক্ষুদ্র দেবতা নন, ইঁহারা ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় শক্তিধর নানা মূর্ত্তি। আর এই অমরত্ব পুরাণোক্ত তুচ্ছ স্বর্গ নয়, বৈদিক ঋষিদের অভিলষিত "স্বর্", অনন্তলোকের প্রতিষ্ঠা, বেদোক্ত অমরত্ব, সচ্চিদানন্দময় অনন্ত সত্তা ও চৈতন্য।

প্রথম মণ্ডল—সূক্ত ১৭

মন্ত্র

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥১॥
গন্তারা হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ। ধর্তারা চর্ষণীনাম্ ॥২॥
অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ। তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥৩॥
যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাম্। ভূয়াম বাজদাব্নাম্ ॥৪॥
ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাম্। ক্রতুর্ভবত্যুক্থ্যঃ ॥৫॥
তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি। স্যাদুত প্ররেচনম্ ॥৬॥
ইন্দ্রাবরুণ বামহং হবে চিত্রায় রাধসে। অস্মান্ৎসু জিগ্যুষস্কৃতম্ ॥ ৭ ॥
ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্ ॥৮॥
প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তুতিম্ ॥৯॥

অনুবাদ

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমরাই সম্রাট, তোমাদিগকেই আমরা রক্ষকরূপে বরণ করি,—সেই যে তোমরা এইরূপ অবস্থায় আমাদের উপর উদয় হও। ১

কারণ, যে জ্ঞানী শক্তি-ধারণ করিতে পারেন, তোমরা তাঁহার যজ্ঞস্থলে রক্ষণার্থে উপস্থিত হও। তোমরাই কার্য্য সকলের ধারণকর্ত্তা। ২

আধারের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে যথা-কামনা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর, হে ইন্দ্র ও বরুণ, আমরা তোমাদের অতিনিকট সহবাস চাই। ৩

যে সকল শক্তি এবং যে সকল সুবুদ্ধি আন্তরিক ঋদ্ধি বর্দ্ধন করে, সেই সকলের প্রবল আধিপত্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকি। ৪

যাহা যাহা শক্তিদায়ক ইন্দ্র তাহার এবং যাহা যাহা প্রশস্ত ও মহৎ বরুণ তাহারই স্পৃহণীয় প্রভু হন। ৫

এই দুই জনের রক্ষণে আমরা স্থির সুখে নিরাপদে থাকি এবং গভীর ধ্যানে সমর্থ হই। আমাদের সম্পূর্ণ শুদ্ধি হৌক। ৬

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমরা তোমাদিগের নিকট চিত্রবিচিত্র আনন্দলাভার্থে যজ্ঞ করি, আমাদিগকে সর্ব্বদা জয়ী কর। ৭

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমাদের বুদ্ধির সকল বৃত্তি যেন বশ্যতা স্বীকার করে, সেই বৃত্তিসকলে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শান্তি দান কর। ৮

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, এই যে সুন্দর স্তব তোমাদিগকে যজ্ঞরূপে অর্পণ করি, সে যেন তোমাদের ভোগ্য হয়, সেই সাধনার্থ স্তববাক্য তোমরাই পুষ্ট ও সিদ্ধিযুক্ত করিতেছ। ৯

ব্যাখ্যা

প্রাচীন ঋষিগণ যখন আধ্যাত্মিক যুদ্ধে আন্তর শত্রুর প্রবল আক্রমণে দেবতাদের সহায়তা লাভ প্রার্থনা করিতেন, সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অসম্পূর্ণতা বোধে পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা মানসে "বাজঃ" বা শক্তির স্থায়ী জমাট অবস্থা কামনা করিতেন অথবা অন্তর-প্রকাশ ও আনন্দের পরিপূর্ণতায় তাহারই প্রতিষ্ঠা করিতে যোগ করিতে বা রক্ষা করিতে দেবতাদের আহ্বান করিতেন, তখন আমরা প্রায়ই তাহাদিগকে যুগ্মরূপে অমরগণকে একবাক্যে একস্তবে ডাকিয়া মনের ভাব জানাইতে দেখি। অশ্বিনদ্বয়, ইন্দ্র ও বায়ু, মিত্র ও বরুণ এইরূপ সংযোগের উদাহরণ। এই স্তবে ইন্দ্র ও বায়ু নহে, মিত্র ও বরুণ নহে, ইন্দ্র

ও বরুণের এইরূপ সংযোগ করিয়া কন্ববংশজ মেধাতিথি আনন্দ, মহত্ত্বসিদ্ধি ও শান্তির প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার এখন উচ্চ বিশাল ও গম্ভীর মনের ভাব। তিনি চান মুক্ত ও মহৎ কর্ম্ম, চান প্রবল তেজস্বী ভাব কিন্তু সেই বল স্থায়ী ও গভীর বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই তেজ শান্তির বিশাল পক্ষদ্বয়ে আরূঢ় হইয়া কর্ম্ম-আকাশে বিচরণ করিবে, তিনি চান আনন্দের অনন্ত সাগরে ভাসমান হইয়াও, আনন্দের চিত্রবিচিত্র তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও সেই স্থৈর্য্য, মহিমা ও চিরপ্রতিষ্ঠার অনুভব। তিনি সেই সাগরে মজিয়া আত্মজ্ঞান হারা হইতে, সেই তরঙ্গে লুলিতদেহ হইয়া হাবুডুবু খাইতে অনিচ্ছুক। এই মহৎ আকাঙ্ক্ষা লাভের উপযুক্ত সহায়তাকারী দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ। রাজা ইন্দ্র, সম্রাট বরুণ। সমস্ত মানসিকবৃত্তি, অস্তিত্ব ও কর্ম্মকারিতার কারণ যে মানসিক তেজ ও তপঃ, ইন্দ্রই তাহার দাতা এবং বৃত্রদের আক্রমণ হইতে তাহার রক্ষা করেন। চিত্ত ও চরিত্রের যত মহৎ ও উদার ভাব, যাহার অভাবে মনের এবং কর্ম্মের ঔদ্ধত্য, সংকীর্ণতা, দুর্ব্বলতা বা শিথিলতা অবশ্যম্ভাবী, বরুণই তাহার স্থাপন করেন ও রক্ষা করেন। অতএব এই সূক্তের প্রারম্ভে ঋষি মেধাতিথি এই দুজনেরই সহায়তা ও সখ্য বরণ করেন। ইন্দ্রাবরুণয়োরহমব আবৃণে। "সম্রাজোঃ"—কেননা তাহারাই সম্রাট। অতএব "ঈদৃশে". এই অবস্থায় বা অবসরে (যে মনের অবস্থার বর্ণনা করিলাম) তিনি নিজের জন্যে ও সকলের জন্যে তাহাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন—তা নো মৃড়াত ঈদৃশে। যে অবস্থায় দেহের, প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানাংশের সকল বৃত্তি ও চেষ্টা স্বস্থানে সমারূঢ় ও সংবৃত, কাহারও জীবের উপর আধিপত্য, বিদ্রোহ বা যথেচ্ছাচার নাই, সকলেই স্ব স্ব দেবতার পরাপ্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম ভগবৎনির্দ্দিষ্ট সময়ে ও পরিমাণে সানন্দে করিতে অভ্যস্ত, যে অবস্থায় গভীর শান্তি অথচ তেজস্বী সীমারহিত প্রচন্ড কর্ম্মশক্তি, যে অবস্থায় জীব স্বরাজ্যের স্বরাট, নিজ আধাররূপ আন্তরিক রাজ্যের প্রকৃত সম্রাট, তাহারই আদেশে বা তাহারই আনন্দার্থে সকলবৃত্তি সুচারুরূপে পরস্পরের সহায়তা পূর্ব্বক কর্ম্ম করে অথবা তাহার ইচ্ছা হইলে গভীর তমোরহিত নিষ্কর্ম্মতায় মগ্ন হইয়া অতল শান্তি অনির্ব্বচনীয় রসাস্বাদন করে, প্রথম যুগের বৈদান্তিকেরা সেই অবস্থাকে স্বারাজ্য বা সাম্রাজ্য বলিতেন। ইন্দ্র ও বরুণ সেই অবস্থার বিশেষ অধিকারী তাহারাই সম্রাট। ইন্দ্র সম্রাট হইয়া আর সকল বৃত্তিকে চালিত করেন, বরুণ সম্রাট হইয়া আর সকল বৃত্তিকে শাসন করেন এবং মহিমান্বিত করেন।

এই মহিমান্বিত অমরদ্বয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভে সকলে অধিকারী নহেন। যিনি জ্ঞানী, যিনি ধৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অধিকারী। বিপ্র হওয়া চাই, মাবান হওয়া চাই। বিপ্র ব্রাহ্মণ নহে, বি ধাতুর অর্থ প্রকাশ, বিপ্ ধাতুর অর্থ প্রকাশের ক্রীড়া, কম্পন বা পূর্ণ উচ্ছ্বাস, যাঁহার মনে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে,

যাঁহার মনের দ্বার জ্ঞানের তেজীয়সী ক্রীড়ার জন্য মুক্ত, তিনিই বিপ্র। মা ধাতুর অর্থ ধারণ। জননী গর্ভে সন্তানের ধারণকর্ত্রী বলিয়া মাতা শব্দে অভিহিত। আকাশ সকল ভূতের সকল জীবের জন্ম, ক্রীড়া ও মৃত্যু স্বকুক্ষিতে ধারণ করিয়া স্থির অবিচলিত হইয়া থাকে বলিয়া সকল কর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবতা মাতরিশ্বা নামে খ্যাত। আকাশের ন্যায় যার ধৈর্য্য ও ধারণশক্তি, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু যখন দিঙ্‌মণ্ডলকে আলোকিত করিয়া প্রচণ্ড হুঙ্কারে বৃক্ষ, জন্তু, গৃহ পর্য্যন্ত টানিয়া রুদ্র ভয়ঙ্কর রাসলীলার নৃত্য অভিনয় করে, আকাশ যেমন সেই ক্রীড়াকে সহ্য করে, নীরবে স্বসুখে মগ্ন হইয়া থাকে, যিনি সেইরূপ প্রচণ্ড বিশাল আনন্দ, প্রচণ্ড রুদ্র কর্ম্মস্রোত এমন কি শরীর বা প্রাণের অসহ্য যন্ত্রণাকেও, স্বীয় আধারে সেই ক্রীড়ার উন্মুক্ত ক্ষেত্র দিয়া অবিচলিত ও আত্মসুখে প্রফুল্ল থাকিয়া সাক্ষীরূপে ধারণ করিতে সমর্থ, তিনিই মাবান। যখন এইরূপ মাবান বিপ্র, এইরূপ ধীর জ্ঞানী স্বীয় আধারকে বেদী করিয়া যজ্ঞার্থে দেবতাদের আহ্বান করে, ইন্দ্র ও বরুণের সেইখানে অকুণ্ঠ গতি, তাঁহারা স্বেচ্ছায়ও উপস্থিত হন, যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাহার সকল অভীপ্সিত কর্ম্মের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা সাজিয়া (ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং) বিপুল আনন্দ, শক্তি ও জ্ঞানপ্রকাশ প্রদান করেন।

প্রথম মণ্ডল—সূক্ত ৭৫

মূল

জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমম্। হব্যা জুহ্বান আসনি ॥ ১ ॥
অথা তে অঙ্গিরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্। বোচেম ব্রহ্ম সানসি ॥ ২ ॥
কস্তে জামির্জনানামগ্নে কো দাশ্বধ্বর। কো হ কস্মিন্নসি শ্রিতঃ ॥ ৩ ॥
ত্বং জামির্জনানমগ্নে মিত্রো অসি প্রিয়ঃ। সখা সখিভ্য ইড্যঃ ॥ ৪ ॥
যজা নো মিত্রাবরুণা যজা দেবাঁ। বৃহৎ ঋতং অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ

যাহা ব্যক্ত করিতেছি তাহা অতিশয় বিস্তৃত ও বৃহৎ এবং দেবতার ভোগের

সামগ্রী, তাহা তুমি সপ্রেমে আত্মসাৎ কর। যতই হব্য প্রদান কর, তোমারই মুখে অর্পণ কর। ১

হে তপঃ-দেব! শক্তিধরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিধাতা, আমি যে হৃদয়ের মন্ত্র ব্যক্ত করিতেছি তাহা তোমার প্রিয় এবং আমার অভিলাষিতের বিজয়ী ভোক্তা হোক। ২

হে তপঃ-দেব অগ্নি! জগতে কে তোমার সঙ্গী ও ভ্রাতা? তোমাকে দেবগামী সখ্য দিতে কে সমর্থ? তুমি বা কে? কার অন্তরে অগ্নি আশ্রিত? ৩

অগ্নি! তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতা, তুমিই জগতের প্রিয় বন্ধু, তুমিই সখা এবং তোমার সখাদের কাম্য। ৪

মিত্র ও বরুণের উদ্দেশ্যে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৃহৎ সত্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর। অগ্নি! সেই সত্য তোমারই নিজের গৃহ, সেই লক্ষ্যস্থলে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত কর। ৫

তৃতীয় মণ্ডল—সূক্ত ৪৬

মূল

যুধ্মস্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থবিরস্য ঘৃষ্বেঃ।
অজূর্যতো বজ্রিণো বীর্যাহণীন্দ্র শ্রুতস্য মহতো মহানি ॥ ১॥
মহাঁ অসি মহিষ বৃষ্ণ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্।
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান্ ॥২॥
প্র মাত্রাভী রিরিচে রোচমানঃ প্র দেবেভির্বিশ্বতো অপ্রতীতঃ।
প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পৃথিব্যাঃ প্রোরোর্মহো অন্তরিক্ষাদৃজীষী ॥৩॥
উরুং গভীরং জনুষাভ্যুহগ্রং বিশ্বব্যচসমবতং মতীনাম্।
ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রদিবি সুতাসঃ সমুদ্রং ন স্রবত আবিশন্তি ॥৪॥
যং সোমমিন্দ্র পৃথিবীদ্যাবা গর্ভং ন মাতা বিভৃতস্ত্বায়া।
তং তে হিন্বন্তি তমু তে মৃজন্ত্যধ্বর্যবো বৃষভ পাতবা উ ॥৫॥

অনুবাদ

যে দেবতা পুরুষ যোদ্ধা ওজস্বী স্বরাট, যে দেবতা নিত্যযুবা স্থিরশক্তি

প্রখরদীপ্তিরূপ ও অক্ষয়, অতি মহৎ সেই শ্রুতিধর বজ্রধর ইন্দ্র, অতিমহৎ তাঁহার বীরকর্ম্ম সকল। ১

হে বিরাট, হে ওজস্বী, মহান তুমি, তোমার বিস্তার-শক্তির কর্ম্ম দ্বারা তুমি আর সকলের উপর জোর করিয়া তাহাদের নিকট আমাদের অভিলষিত ধন বাহির কর। তুমি এক, সমস্ত জগতে যাহা যাহা দৃষ্ট হয় তাহার রাজা, মানুষকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়ো, তাহার জেতব্য স্থিরধামে তাহাকে স্থাপন করো। ২

ইন্দ্র দীপ্তিরূপে প্রকাশ হইয়া জগতের মাত্রা সকল অতিক্রম করিয়া যায়, দেবদেরও সকল দিকে অনন্তভাবে অতিক্রম করিয়া সকলের অগম্য হয়। সঙ্গে ঋজুগামী এই শক্তিধর তাঁহার ওজস্বিতায় মনোজগতে, উরু ভূলোক এবং মহান প্রাণজগৎকে অতিক্রম করিয়া যায়। ৩

এই বিস্তৃত ও গভীর, এই জন্মতঃ উগ্র ও ওজস্বী, এই সর্ব্ববিকাশক ও সর্ব্বচিন্তাধায়ক ইন্দ্ররূপ সমুদ্রে জগতের মদ্যকররসপ্রবাহ সকল মনোলোকের মুখে অভিব্যক্ত হইয়া স্রোতস্বিনী নদনদীর মত প্রবেশ করে। ৪

হে শক্তিধর, এই আনন্দমদিরা মনোলোক ও ভূলোক মাতা যেমন অজাত শিশুকে ধারণ করে সেইরূপে তোমারই কামনায় ধারণ করে। অধ্বরের অধ্বর্য্যু তোমারই জন্যে হে বৃষভ, তোমারই পানার্থে সেই আনন্দপ্রবাহকে ধাবিত করে, তোমারই জন্যে সেই আনন্দকে মার্জ্জিত করে। ৫

নবম মণ্ডল—সূক্ত ১

মূল

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ ॥ ১ ॥

স্বাদুতম মাদকতম ধারায় পূতস্রোতে বহ, সোমদেব, ইন্দ্রপানার্থে তুমি অভিষুত হইয়াছ। ১

উপনিষদ্

উপনিষদ্‌

আমাদের ধর্ম্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা-শোভিত। তাহার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়, তাহার শাখাগুলি কর্ম্মের অতি দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বত্থবৃক্ষ, ঊর্দ্ধ্বমূল ও অধঃশাখঃ, তেমনই এই ধর্ম্ম জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মপ্রেরক। নিবৃত্তি তাহার ভিত্তি, প্রবৃত্তি তাহার গৃহ ছাদ দেওয়াল, মুক্তি তাহার চূড়া। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বিশাল হিন্দু-ধর্ম্ম-বৃক্ষের আশ্রিত।

সকলে বলে বেদ হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু অল্প লোকেই সেই প্রতিষ্ঠার স্বরূপ ও মর্ম্ম অবগত আছে; প্রায়ই শাখাগ্রে বসিয়া আমরা দুই একটি সুস্বাদু নশ্বর ফলের আস্বাদে মজিয়া থাকি, মূলের কোনও সন্ধান রাখি না। আমরা শুনিয়াছি বটে যে বেদের দুই ভাগ আছে, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, কিন্তু আসল কর্ম্মকাণ্ড কি বা জ্ঞানকাণ্ড কি তাহা জানি না। আমরা মোক্ষমুল্লর* কৃত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা পড়িয়া থাকিতে পারি বা রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালা অনুবাদ পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ঋগ্বেদ কি তাহা জানি না। মোক্ষমুল্লর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান পাইয়াছি যে ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বাহ্য পদার্থ বা ভূতসকলকে পূজা করিতেন, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি ইত্যাদির স্তব-স্তোত্রই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সেই অনাদ্যনন্ত অপৌরুষেয় মূল জ্ঞান। আমরা ইহাই বিশ্বাস করিয়া বেদের, ঋষিদের ও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়া মনে করি যে আমরা বড়ই বিদ্বান, বড়ই "আলোকপ্রাপ্ত"। আসল বেদে সত্য সত্য কি আছে, কেনই বা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহাপুরুষগণ এই স্তবস্তোত্রগুলিকে অনাদ্যনন্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান বলিয়া মানিতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান করি না।

উপনিষদই বা কি, তাহাও অত্যল্প লোক জানে। যখন উপনিষদের কথা বলি, আমরা প্রায়ই শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বের দ্বৈতবাদ ইত্যাদি দার্শনিক ব্যাখ্যার কথা ভাবি। আসল উপনিষদে কি লেখা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরবিরোধী ষড়্দর্শন এই এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ষড়দর্শনের অতীত কোন্‌ নিগূঢ় অর্থ সেই

* ম্যাক্সমূলার (Maxmueller)

জ্ঞানভাণ্ডারে লভ্য হয়, এই চিন্তাও করি না। শঙ্কর যে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমরা সহস্র বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, শঙ্করের ব্যাখ্যাই আমাদের বেদ, আমাদের উপনিষদ, কষ্ট করিয়া আসল উপনিষদ কে পড়ে? যদি পড়ি, শঙ্করের ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যা দেখিলে আমরা তখনই তাহা ভুল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি। অথচ উপনিষদের মধ্যে কেবল শঙ্করলব্ধ জ্ঞান নহে, ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে বা হইবে, সেইগুলি আর্য্য ঋষি ও মহাযোগী অতি সংক্ষিপ্তভাবে নিগূঢ় অর্থ-প্রকাশ শ্লোকে নিহিত করিয়া গিয়াছেন।

উপনিষদ কি? যে অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম্ম আরূঢ়মূল, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদ। চতুর্ব্বেদের সূক্তাংশে সেই জ্ঞান পাওয়া যায়, কিন্তু উপমাচ্ছলে স্তোত্রের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা আচ্ছাদিত, যেমন আদর্শে মানবের প্রতিমূর্ত্তি। উপনিষদ অনাচ্ছন্ন পরমজ্ঞান, আসল মনুষ্যের অনাবৃত অবয়ব। ঋগ্বেদের বক্তা ঋষিগণ ঐশ্বরিক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষিগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের স্বরূপ দেখিয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত করিলেন। অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি কেন, তাহার পরে যত দার্শনিক চিন্তা ও বাদ ভারতে, য়ুরোপে, এশিয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, Nominalism, Realism, শূন্যবাদ, ডারউয়িনের ক্রমবিকাশ, কমতের Positivism, হেগেল, কান্ত, স্পিনোজা, শোপনহাওর Utilitarianism, Hedonism, সকলই উপনিষদের ঋষিগণের সাক্ষাদ্দর্শনে দৃষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যত্র যাহা খণ্ডভাবে দৃষ্ট, সত্যের অংশমাত্র হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রচারিত, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া বিকৃতভাবে বর্ণিত, তাহা উপনিষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যায় বা আর-কাহারও ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না হইয়া উপনিষদের আসল গভীর ও অখণ্ড অর্থগ্রহণে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

উপনিষদের অর্থ গূঢ় স্থানে প্রবেশ করা। ঋষিগণ তর্কের বলে, বিদ্যার প্রসারে, প্রেরণার স্রোতে উপনিষদুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, যে গূঢ়স্থানে সম্যক জ্ঞানের চাবি মনের নিভৃত কক্ষে ঝুলান রহিয়াছে, যোগদ্বারা অধিকারী হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই চাবি নামাইয়া তাঁহারা অভ্রান্ত জ্ঞানের বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেই চাবি হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রকৃত অর্থ খুলিয়া যায় না। কেবল তর্কবলে উপনিষদের অর্থ করা ও নিবিড় অরণ্যে উচ্চ উচ্চ বৃক্ষাগ্র মোমবাতির আলোকে নিরীক্ষণ করা একই কথা সাক্ষাদ্দর্শনই সূর্য্যালোক, যাহা দ্বারা সমস্ত অরণ্য আলোকিত হইয়া অন্বেষণ কারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষাদ্দর্শন যোগেই লভ্য।

উপনিষদে পূর্ণযোগ

পূর্ণযোগ, নরদেহে দেবজীবন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ভগবৎশক্তিচালিত পূর্ণ-লীলা, যাহাকে আমরা মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়া প্রচার করি. এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি যেমনই বুদ্ধি-গঠিত নূতন চিন্তা নহে, তেমনই কোনও প্রাচীন পুঁথির হরফ, কোনও লেখা-শাস্ত্রের প্রমাণ বা দার্শনিক সূত্রের দোহাই তাহার নহে। ভিত্তি পূর্ণতর অধ্যাত্মজ্ঞান, ভিত্তি আত্মায় বুদ্ধিতে হৃদয়ে প্রাণে দেহে ভাগবত সত্তার জ্বলন্ত অনুভূতি। এই জ্ঞান কিছু নূতন আবিষ্কার নয়, অতি পুরাতন, নিতান্ত সনাতন। এই অনুভূতি বেদের প্রাচীন ঋষির, উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা চরম জ্ঞানীর,—"সত্যশ্রুত কবয়ঃ" যাঁহারা, তাঁহা-দেরই অনুভূতি। কলির পতিত ভারতের নৈরাশ্যে-ঘেরা, ক্ষুদ্রাশয়তায় ও বিফল প্রযত্ন প্রাণে নূতন শোনায় বটে,—যেখানে অধিকাংশই আধ-মানুষ হইয়া জীবন যাপন করিতে সন্তুষ্ট, পুরা মনুষ্যত্বের সাধনা কজন করে, সেখানে নব-দেবত্বের কা কথা। কিন্তু এই আদর্শ লইয়াই আমাদের শক্তিধর আর্য্য পূর্ব্ব-পুরুষেরা জাতির প্রথম জীবন গঠন করিলেন। এই জ্ঞানসূর্য্যের উল্লাসভরা উষাকালে আত্মস্থ আনন্দবিহঙ্গের সোমরস-প্লাবিতকণ্ঠে বেদগানের আহ্বান ধ্বনি উঠিয়া বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছিল। মনুষ্যের আত্মায়, মনুষ্যের জীবনে সর্ব্ববিধ দেবত্ব গঠন দ্বারা সেই অমর বিশ্ববেদের মহীয়সী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করার উচ্চাশা ছিল ভারত-সভ্যতার বীজমন্ত্র। ক্রমশঃ সেই মন্ত্র ভুলিয়া যাওয়া, হ্রাস করা, বিকৃত করা, এই দেশের ও এই জাতির অবনতি ও দুর্গতির কারণ। আবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ, আবার সেই সিদ্ধির সাধনা, পুনরুত্থান ও উন্নতির একমাত্র শ্রেষ্ঠপথ ও একমাত্র অনিন্দ্য উপায়। কেননা, ইহাই পূর্ণ সত্য,—যেমন ব্যষ্টির তেমনি সমষ্টির সাফল্য এইখানে। মনুষ্যের সাধনা, জাতির গঠন, সভ্যতার সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ, এই সকলের গূঢ় তাৎ-পর্য্য ইহাই। অন্য যে সকল উদ্দেশ্যের পিছনে আমাদের প্রাণ ও বুদ্ধি হয়রান হয়, সে সকল গৌণ উদ্দেশ্য, আংশিক, দেবতাদের সত্য অভিসন্ধির সহায় মাত্র। অন্য যে সকল খণ্ড-সিদ্ধি লইয়া আমরা উল্ল-সিত হই, সেই সকল কেবল পথের আরামগৃহ, মার্গস্থ পর্ব্বতশিখরে জয়পতাকা প্রোথিত করা। আসল উদ্দেশ্য আসল সিদ্ধি মনুষ্যের মধ্যে, কয়েকজন বিরল মহাপুরুষ নয়, সকলের মধ্যে জাতিতে, বিশ্বমানবে ব্রহ্মের

বিকাশ ও স্বয়ং-প্রকাশ, ভগবানের প্রকট শক্তিসঞ্চারণ, জ্ঞানময় আনন্দময় লীলা।

এই জ্ঞান, এই সাধনের প্রথম রূপ ও অবস্থা আমরা দেখিতে পাই ঋগ্বেদে। ভারত-ইতিহাসের মুখেই আর্য্যধর্ম্ম মন্দিরের দ্বারস্থ স্তূপে খোদিত আদি-লিপি। ঋগ্বেদই যে তাহার আদিম বাণী, সেকথা আমরা ঠিক নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না, কারণ ঋগ্বেদের ঋষিগণও স্বীকার করেন যে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী যাঁহারা ছিলেন, আর্য্য জাতির আদি পূর্ব্বপুরুষেরা, "পূর্ব্বে পিতরো মনুষ্যা", এই পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই দেবজীবনলাভের সাধনমার্গ পরবর্ত্তী মানবের সত্যের ও অমৃতত্বের পন্থা। তবে ইহাই বলেন, প্রাচীন ঋষিরা যাহা দেখাইয়াছিলেন নূতন ঋষিরাও তাহাই অনুসরণ করিতেছেন, যে দিব্য বাক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন পিতৃগণের সেই বাণীর প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই ঋগ্বেদের মন্ত্র, অতএব ঋগ্বেদে এই ধর্ম্মের যে স্বরূপ দেখিতে পাই তাহাকেই তাহার আদিরূপ বলা যায়। ইহারই অতি মহৎ অতি উদার রূপান্তর উপনিষদের জ্ঞান, বেদান্তের সাধনা। বেদের বৈশ্বদেব্য জ্ঞান ও দেবজীবন সাধনা, উপনিষদের আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা দুইটি সমন্বয়-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত—বিশ্বপুরুষ ও বিশ্বশক্তির নানা দিক, ব্রহ্মের সকল তত্ত্বকে একত্র করিয়া বৈশ্বদেব্য, সর্ব্বম্ ব্রহ্মের অনুভূতি ও অনুশীলন তাহার মূল কথা। তাহার পরে বিশ্লেষণের যুগ আরম্ভ হয়। সত্যের একটি না একটি খণ্ড দর্শন লইয়া বেদান্তের পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা, সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশেষিক বিভিন্ন সাধনা সৃষ্টি করে; শেষে খণ্ড দর্শনের খণ্ড লইয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণব শৈব পুরাণ তন্ত্র সমন্বয়ের চেষ্টাও কোনও দিন থামে নাই, গীতায়, তন্ত্রে, পুরাণেও সেই চেষ্টা দেখি, প্রত্যেকে কতকটা কৃতার্থও হইয়াছে, অনেক নূতন অধ্যাত্ম অনুভূতিও অর্জ্জন করা হইয়াছে, তবে বেদ উপনিষদের তুল্য ব্যাপকতা আর পাই না। ভারতের আদিম আধ্যাত্ম-বাণী যেন বুদ্ধির অতীত কোনও সর্ব্বব্যাপী উজ্জ্বল জ্ঞানালোক হইতে উদ্ভূত, যাহাকে অতিক্রম করা দূরের কথা, যেখানে পৌঁছানও বুদ্ধিপ্রধান পরবর্ত্তী যুগদের অসাধ্য বা কঠিন হইয়া যায়।

ঈশ উপনিষদ

১

ঈশ উপনিষদের সোজা অর্থ গ্রহণ করার এবং তাহার নিহিত ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত মায়াবাদ আর উপনিষদের উপর শঙ্কর-প্রণীত ভাষ্য। সাধারণ মায়াবাদ নিবৃত্তির একমুখী প্রেরণা ও সন্ন্যাসীর প্রশংসিত কর্ম্মবিমুখতার সহিত ঈশ উপনিষদের সম্পূর্ণ বিরোধ, শ্লোকগুলির অর্থকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া উলটা অর্থ সৃষ্টি না করিলে এই বিরোধের সমাধান করা অসম্ভব। যে উপনিষদে লেখা আছে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ

আর লেখা আছে

ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে

যে উপনিষদ সাহস করিয়া বলিয়াছে

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি য অবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ

আরও বলিয়াছে

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা

আর ইহাও বলিয়াছে

সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে,

সেই উপনিষদের সঙ্গে মায়াবাদ ও নিবৃত্তি-পথের মিল হইবে কি প্রকারে? শঙ্করের পরে যদি দাক্ষিণাত্যে অদ্বৈত মতের প্রধান নিয়ন্তা, সেই বিদ্যারণ্য ইহা বুঝিয়াই এই বারটি প্রধান উপনিষদের তালিকা হইতে নির্ব্বাচন করিয়া তাহারই স্থানে নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদকে বসাইয়া দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য প্রচলিত বিধানকে উলটাইয়া সেইরূপ দুঃসাহস করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, ইহা শ্রুতি, মায়া শ্রুতির প্রতিপাদ্য তত্ত্ব, অতএব এই শ্রুতির অর্থও প্রকৃত মায়াবাদের অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না।

জগতী যদি পৃথিবীই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই সকল যাহা কিছু গমনশীলা পৃথিবীতে গমনশীল হয়, অর্থাৎ যত মনুষ্য, পশু, কীট, পাখী, নদ, নদী ইত্যাদি। এই অর্থ বড় অসম্ভব। উপনিষদের ভাষায় সর্ব্বমিদম্ শব্দে সর্ব্বত্রই জগতের যাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়, পৃথিবীর নয়।

অতএব জগতী শব্দে বুঝিতে হইবে জগৎরূপে প্রকটিত গমনশীলা শক্তি, জগৎ শব্দে যত কিছু প্রকৃতির গতির একটা গতি, হয় প্রাণীরূপে অথবা পদার্থরূপে বিদ্যমান। বিরোধ হয় ঈশ্বর ও জগতের যা-কিছু, এই দুইটির মধ্যে। যেমন ঈশ্বর স্থাণু, প্রকৃতি ও শক্তি গমনশীলা, সর্ব্বদা কর্ম্মে ও জগৎব্যাপী গতিতে ব্যাপৃত, সেইরূপ জগতে যাহা কিছু আছে তাহার গতির ক্ষুদ্র একটি জগৎ, তাহাও সর্ব্বদাই প্রতি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সন্ধি-স্থল, চঞ্চল, নশ্বর, স্থাণুর বিপরীত। একদিকে ঈশ্বর, একদিকে পৃথিবী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু জঙ্গম, ইহাতে সেই নিত্য বিরোধ ফুটে না। এক-দিকে স্থাণু ঈশ্বর, অপর দিকে চঞ্চলা প্রকৃতি ও তাহার সৃষ্ট জগতের মধ্যে প্রকৃতির অধিকৃত যাহা কিছু আছে,—যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু, এই সর্ব্বজন-লক্ষিত নিত্যবিরোধ লইয়া উপনিষদের আরম্ভ।

এই বিরোধ ও তাহার সমাধানের উপর সমস্ত উপনিষদ গঠিত। পরে ঈশ্বর কি আর জগৎ কি তাহার বিচার করিতে গিয়া উপনিষৎকার তিনবার তাহাই অন্যপ্রকারে উত্থাপন করিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মের বেলায় পুরুষ ও প্রকৃতির বিরোধ অনৈজদ্ এবং মনসো জবীয়ঃ...তদ্ এজতি তন্নৈজতি—এই কয়টি শব্দে তিনি বুঝাইয়াছেন যে দুইটি ব্রহ্ম, পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতি আর প্রকৃতিরূপী জগৎও ব্রহ্ম। তাহার পর আত্মার কথায়, ঈশ্বর ও যাহা কিছু জগতের তাহাদের বিরোধ। আত্মাই ঈশ্বর, পুরুষ...

নিংড়াইলে নিশ্চয় প্রকৃত লুক্কায়িত অর্থ অর্থাৎ মায়াবাদ—যন্ত্রণায় বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই উপলব্ধির বশীভূত হইয়া শঙ্করাচার্য্য ঈশ উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

দেখা যাক একদিকে শাঙ্কর ভাষ্য কি বলে আর অপর দিকে সত্য সত্য উপনিষদই কি বলে। উপনিষৎকার ঈশ্বরতত্ত্ব ও জগৎতত্ত্বকে প্রথমেই পর-স্পরের সম্মুখ করিয়া মিলাইয়া এই দুইটির মূল সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ইহার সোজা অর্থ "ঈশ্বরের বাস করিবার অর্থে এই সকল বিদ্যমান, যাহা কিছু জগতীর মধ্যে জগৎ" অর্থাৎ গমনশীলার মধ্যে গমনশীল। ইহা সহজে বোঝা যায় যে বিশ্ববিকাশে দুইটি তত্ত্ব প্রকটিত হয়, স্থাণু ও জগতী, নিশ্চল সর্ব্বব্যাপী নিয়ামক পুরুষ ও গমনশীলা প্রকৃতি। ঈশ্বর ও শক্তি। স্থাণুকে যখন ঈশ্বর নাম দেওয়া হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ এই যে, জগতী ঈশ্বরের অধীন, তাঁহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাঁহার ইচ্ছায় প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করেন। এই পুরুষ শুধু সাক্ষী ও অনুমন্তা নয়, জ্ঞাতা ঈশ্বর, কর্ম্মের নিয়ন্তা, প্রকৃতি কর্ম্মের নিয়ন্ত্রী নহে, নিয়তি মাত্র, কর্ত্রী বটে কিন্তু কর্ত্তার অধীনে, পুরুষের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার কার্য্যকারিণী শক্তি।

তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে, এই জগতী শুধু গমনশীলা শক্তি, শুধু জগৎকরণস্বরূপ তত্ত্ব নয়, সে জগৎরূপেও বর্ত্তমান। জগতী শব্দের সাধারণ অর্থ পৃথিবী, তবে এখানে তাহা খাটে না। "জগত্যাম্ জগৎ" এই দুই শব্দের সংযোগে উপনিষৎকার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে দুইটির ধাতুগত অর্থ উপেক্ষণীয় নহে। তাহার উপর জোর দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য।

ঈশ উপনিষদ

২

ঈশ উপনিষদ পূর্ণযোগ-তত্ত্ব ও পূর্ণ আধ্যাত্মসিদ্ধি-পরিচায়ক, অল্পেতে বহু সমস্যা সমাধানকারী, অতি মহৎ অতল গভীর অর্থে পরিপূর্ণ শ্রুতি। আঠার শ্লোকে সমাপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার মন্ত্রে জগতের ততোধিক মুখ্য সত্য ব্যাখ্যাত। এইরূপ ক্ষুদ্র পরিসরে অনন্ত অমূল্য সম্পত্তি—infinite riches in a little room—শ্রুতিতেই পাওয়া যায়।

সমন্বয়-জ্ঞান সমন্বয়-ধর্ম্ম, বিপরীতের মিলন ও একীকরণ এই উপনিষদের প্রাণ। পাশ্চাত্য দর্শনে একটি নিয়ম আছে যাহাকে Law of contradiction বলে, বিপরীতের পরস্পর বহিষ্করণ বলা যায়। দুইটি বিপরীত সিদ্ধান্ত একসঙ্গে টিকিতে পারে না, মিলিত হইতে পারে না, দুইটি বিপরীত গুণ এক সময়ে এক স্থানে এক আধারে এক বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ সত্য হইতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে বিপরীতের মিলন ও একীকরণ হইতেই পারে না। ভগবান যদি এক হন, তিনি হাজার সর্ব্বশক্তিমান হউন বহু হইতে পারেন না। অনন্ত কখন সান্ত হয় না। অরূপের রূপ হওয়া অসাধ্য, সে সরূপ হইলে তাহার অরূপত্ব বিনষ্ট হয়। ব্রহ্ম যে এক সময়েই নির্গুণ ও সগুণ, উপনিষদ যেমন ভগবানের সম্বন্ধে বলে যে তিনি "নির্গুণো গুণী", এই সিদ্ধান্তকেও এই যুক্তি উড়াইয়া দেয়। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, অরূপত্ব, একত্ব, অনন্তত্ব যদি সত্য হয়, তাহার সগুণত্ব, সরূপত্ব, বহুত্ব, সান্ততা মিথ্যা, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা" মায়াবাদীর এই সর্ব্বধ্বংসী সিদ্ধান্ত এই দার্শনিক নিয়মের চরম পরিণতি। ঈশ উপনিষদের দ্রষ্টা ঋষি প্রতিপদে এই নিয়মকে দলন করিয়া প্রতি শ্লোকে তাহার যেন অসারত্ব ঘোষণা করিয়া বৈপরীত্যের মধ্যে বিপরীত তত্ত্বের গুপ্ত হৃদয়ে মিলন ও একীকরণের স্থান বাহির করিয়া চলিতেছেন। গতিশীল জগৎ ও স্থাণু পুরুষের একত্ব, পূর্ণ ত্যাগে পূর্ণ ভোগ, পূর্ণ কর্ম্মে সনাতন মুক্তি, ব্রহ্মের গতির মধ্যেই চিরস্থাণুত্ব, চিরন্তন স্থাণুত্বে অবাধ অচিন্ত্য গতি, অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর জগতের একত্ব, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ বিশ্বপুরুষের একত্ব, যেমন অবিদ্যায় তেমন বিদ্যায় পরম অমরত্ব লাভের অভাব, যুগপৎ বিদ্যা অবিদ্যা সেবনে অমরত্ব, জন্মচক্রঘূরণেও নয়, জন্মবিনাশেও নয়, যুগপৎ সম্ভূতি ও অসম্ভূতির সিদ্ধিতে পরম মুক্তি ও পরম সিদ্ধি, এইগুলিই উপনিষদের উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত মহাতথ্য।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উপনিষদের অর্থ লইয়া অনর্থক গোল করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের প্রধান প্রায়ই সর্ব্বজনস্বীকৃত টীকাকার, কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয়, শঙ্করের মায়াবাদ অতল জলে ডুবিয়া যায়। মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিকদের মধ্যে অতুল্য অপরিমেয় শক্তিশালী। যমুনানদী স্বপথত্যাগে অনিচ্ছুক হওয়ায় তৃষিত বলরাম যেমন লাঙ্গলাকর্ষণে তাহাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া চরণপ্রান্তে হাজির করিয়া দিলেন, শঙ্করও গন্তব্য-স্থলের পথে এই মায়াবাদনাশী উপনিষদকে পাইয়া তাহার অর্থ টানিয়া হিঁচড়াইয়া স্বমতের সহিত মিলাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে উপনিষদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, দুয়েকটি দৃষ্টান্তে বোঝা যায়। উপনিষদে বলা আছে যাহারা একমাত্র অবিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়, আবার যাহারা একমাত্র বিদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা যেন আরও গাঢ় অন্ধকারে প্রবেশ করে। শঙ্কর বলেন, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই স্থলে সাধারণ অর্থে আমি বুঝিব না, বিদ্যার অর্থ এখানে দেববিদ্যা। উপনিষদে বলা আছে, "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভবেনামৃতমশ্নুতে," অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া সম্ভূতি দ্বারা অমরত্ব ভোগ করিব। শঙ্কর বলেন, পড়িতে হয় "অসম্ভূত্যামৃতং," বিনাশের অর্থ এখানে জন্ম। দ্বৈতবাদী একজন টীকাকার ঠিক এইভাবে "তত্ত্বমসি" কথা পাইয়া বলেন, "অতৎ ত্বমসি" পড়িতে হইবে। শঙ্করের পরবর্ত্তী একজন প্রধান মায়াবাদী আচার্য্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, ঈশ উপনিষদকে মুখ্য প্রমাণস্বরূপ উপনিষদের তালিকা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নৃসিংহোত্তরতাপনীয়কে তাহার স্থলে 'প্রমোট' (promote) করিয়া চরিতার্থ হইলেন। বাস্তবিক এইরূপ গায়ের জোরে স্বমত স্থাপনের প্রয়োজন নাই। উপনিষদ অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত দিক, কোন একমাত্র দার্শনিক মতের পরিপোষক নয় দেখায় বলিয়া সহস্র দার্শনিক মত এই এক বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শন অনন্ত সত্যের এক একটি দিক বুদ্ধির সম্মুখে শৃঙ্খলিতভাবে উপস্থিত করে। অনন্ত ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ, অনন্ত ব্রহ্মে পৌঁছিবার পথও অগণ্য।

পুরাণ

পুরাণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে উপনিষদের কথা লিখিয়াছি এবং উপনিষদের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার প্রণালী দেখাইয়াছি। উপনিষদ যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ, পুরাণও প্রমাণ; শ্রুতি যেমন প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, কিন্তু একদরের নহে। শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে যদি স্মৃতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে স্মৃতির প্রমাণ গ্রহণীয় নহে। যাহা যোগসিদ্ধ দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত ঋষিগণ দর্শন করিয়াছেন, অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়াছেন, তাহাই শ্রুতি। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরম্পরায় রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাই স্মৃতি। শেষোক্ত জ্ঞান অনেকের মুখে অনেকের মনে পরিবর্ত্তিত, বিকৃতও হইয়া আসিতে পারে, অবস্থান্তরে নূতন নূতন মত ও প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ করিয়া আসিতে পারে। অতএব স্মৃতি শ্রুতির ন্যায় অভ্রান্ত বলা যায় না। স্মৃতি অপৌরুষেয় নহে, মনুষ্যের সীমাবদ্ধ পরিবর্ত্তনশীল মত ও বুদ্ধির সৃষ্টি।

পুরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিব্যক্তি, পুরাতন সামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগসাধন, চিন্তা-প্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মের আসল গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। তুমি যে ব্যাখ্যা কর আমি সেই ব্যাখ্যা না-ও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরিবর্ত্তন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহা বেদ ও উপনিষদে মিলে না, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিন্তা গৃহীত হইতে পারে। ব্যাখ্যার মূল্য ব্যাখ্যাকর্ত্তার মেধাশক্তি, জ্ঞান ও বিদ্যার উপরে নির্ভর করে। যেমন, ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যদি বিদ্যমান থাকিত তাহার আদর প্রায় শ্রুতির সমান হইত; তাহার অভাবে ও লোমহর্ষণ রচিত পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সকলের সমান আদর না করিয়া বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের ন্যায় যোগসিদ্ধ ব্যক্তির রচনাকে

অধিক মূল্যবান বলিতে হয়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত পণ্ডিত অধ্যাত্মবিদ্যা-পরায়ণ লেখকের রচনাকে শিব বা অগ্নিপুরাণ অপেক্ষা গভীর জ্ঞানপূর্ণ বলিয়া চিনিতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধুনিক পুরাণগুলির আদিগ্রন্থ, এইগুলির মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট তাহাতেও হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশক অনেক কথা নিশ্চয় রহিয়াছে, এবং যখন নিকৃষ্ট পুরাণও জিজ্ঞাসু বা ভক্ত যোগাভ্যাসরত সাধকের লেখা, তখন রচয়িতার স্বপ্রয়াস-লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাও আদরণীয়।

বেদ ও উপনিষদ হইতে পুরাণকে স্বতন্ত্র করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিয়া ইংরাজীশিক্ষিত লোক যে মিথ্যা ভেদ করিয়াছে, তাহা ভ্রম ও অজ্ঞানসম্ভূত। বেদ ও উপনিষদের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে বুঝায়, ব্যাখ্যা করে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে, জীবনের সামান্য সামান্য কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। যাঁহারা বেদ ও উপনিষদ ভুলিয়া পুরাণকে স্বতন্ত্র ও যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় মূল বাদ দেওয়ার ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরাণের প্রকৃত অর্থও লোপ পায়। বেদের উপর পুরাণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুরাণের উপযোগ করিতে হয়।

গীতা

গীতার ধর্ম্ম

যাঁহারা গীতা মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও যুক্তাবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন; কই সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে তাহার মিল ত হয় না; শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে সন্ন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মের উপাসনায় পরম গতিও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠাংশে ত্যাগের মহত্ত্ব ও বাসুদেবের উপর শ্রদ্ধায় ও আত্মসমর্পণে পরমাবস্থাপ্রাপ্তি বিবিধ উপায়ে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু গীতাকে রাজযোগাখ্যাপকগ্রন্থ বলা যায় না। সমতা, অনাসক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম্ম, গুণাতীত্য ও স্বধর্ম্মসেবাই গীতার মূলতত্ত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জ্ঞান ও গূঢ়তম রহস্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীতাই জগতের ভাবীধর্ম্মের সর্ব্বজনসম্মত শাস্ত্র হইবে। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। বড় বড় পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠ মেধাবী তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখকও ইহার গূঢ়ার্থ গ্রহণে অক্ষম। একদিকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্ত্তা গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াছেন, অপরদিকে ইংরাজ-দর্শনসিন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র গীতায় কেবলমাত্র বীরভাবে কর্তব্যপালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমণ্ডলীর মনে ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাসধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ধর্ম্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ করিতে পারে। সর্ব্বজনসম্মত ধর্ম্মে এমন আদর্শ ও তত্ত্বশিক্ষা থাকা আবশ্যক যে সর্ব্বসাধারণে তাহা স্ব স্ব জীবনে ও কর্ম্মক্ষেত্রে উপলব্ধি করিতে পারে, অথচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় অল্পজনসাধ্য পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। বীরভাবে কর্ত্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বটে, তবে কর্ত্তব্য কি, এই জটিলসমস্যা লইয়া ধর্ম্ম ও নীতির যত বিভ্রাট। ভগবান বলিয়াছেন, গহনা কর্ম্মণো গতিঃ, কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, কি বিকর্ম্ম তাহা নির্ণয় করিতে জ্ঞানীও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি কিন্তু তোমাকে এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্দ্ধারণে বেগ পাইতে হইবে না, কর্ম্মজীবনের লক্ষ্য ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। এই জ্ঞানটা কি, এই লাখ কথার এক কথা কোথায় পাইব?

আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম পরম বক্তব্য অর্জ্জুনের নিকট বলিতে প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই দুর্লভ অমূল্য বস্তু অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। সেই সর্ব্বগুহ্যতম পরম কথা কি ?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এই দুটি শ্লোকের অর্থ এক কথায় ব্যক্ত হয়, আত্মসমর্পণ। যিনি যত পরিমাণে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেবভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্দ্ধে করা হইয়াছে। তন্মনা তদ্ভক্ত তদ্‌যাজী হইতে হয়। তন্মনা অর্থাৎ সর্ব্বভূতে তাঁহাকে দর্শন করা, সর্ব্বকালে তাঁহাকে স্মরণ করা, সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বঘটনায় তাঁহার শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝিয়া পরমানন্দে থাকা। তদ্ভক্ত অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্ত থাকা। তদ্‌যাজী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে যজ্ঞরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তদর্থে কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অল্পমাত্র চেষ্টা করিলে স্বয়ং ভগবান অভয়দানে গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ্ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। তিনি বলিয়াছেন এই ধর্ম্ম আচরণ করা সহজ ও সুখপ্রদ। বাস্তবিকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও শক্তিলাভ। মামেবৈষ্যসি অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাদৃশ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাদৃশ্যপ্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, অথচ তিনি কর্ম্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্ব্বকার্য্যে আনন্দিত হন। সালোক্যও কেবল দেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকগতি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীব যখন তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে পুলকিত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্লুত হয়, বুদ্ধি মুহুর্ম্মুহুঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রেরণা জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সর্ব্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ীভাবে থাকে, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকেই দর্শন করে, শ্রবণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্ব্বদা তাঁহার

মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই পরমগতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কিন্তু এই ধৰ্ম্মের অল্প আচরণেও মহতী শক্তি, বিমল আনন্দ, পূর্ণ সুখ ও শুদ্ধতা লাভ হয়। এই ধৰ্ম্ম বিশিষ্ট-গুণ-সম্পন্ন লোকের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনি-প্রাপ্ত-জীবসকল পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই ধৰ্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঘোর পাপীও তাঁহার শরণ লইয়া অল্পদিনের মধ্যে বিশুদ্ধ হয়। অতএব এই ধৰ্ম্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের মন্দিরে জাতি-বিচার নাই। অথচ ইহার পরমগতি কোনও ধৰ্ম্মনির্দ্দিষ্ট পরমাবস্থার ন্যূন নয়।

সন্ন্যাস ও ত্যাগ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম সকলের আচরণীয়, গীতোক্ত যোগে সকলের অধিকার আছে অথচ সেই ধর্ম্মের পরমাবস্থা কোনও ধর্ম্মোক্ত পরমাবস্থাপেক্ষা ন্যূন নহে। গীতোক্ত ধর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্মীর ধর্ম্ম। আমাদের দেশে আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত একটি সন্ন্যাসমুখী স্রোত দেশময় ব্যাপ্ত হইতেছে। রাজযোগ-প্রয়াসী ব্যক্তির মন সহজে গৃহকর্ম্মে বা গৃহবাসে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না। তাঁহার যোগাভ্যাসে ধ্যান-ধারণার বহুলায়াসপূর্ণ চেষ্টা আবশ্যক। অল্প মনঃক্ষোভে অথবা বাহ্যস্পর্শে ধ্যান-ধারণার স্থিরতা বিচলিত হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গৃহে এইরূপ বাধা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। অতএব যাঁহারা পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। যখন এইরূপ-জন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সুদিগের সংখ্যা অধিক হইয়া দেশময় সেই শক্তি-সংক্রামণে যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসমুখী স্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের কল্যাণ-পথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, সেই কল্যাণ-সংশ্লিষ্ট বিপদের আশঙ্কাও হয়। বলা হইয়াছে, সন্ন্যাসধর্ম্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, কিন্তু সেই ধর্ম্ম গ্রহণে অল্প লোকই অধিকারী। যাঁহারা বিনা অধিকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারা শেষে অল্পদূর অগ্রসর হইয়া অর্দ্ধপথে তামসিক অপ্রবৃত্তিজনক আনন্দের অধীন হইয়া নিবৃত্ত হন। এই অবস্থায় ইহজীবন সুখে কাটে বটে, কিন্তু জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের উর্দ্ধতম সোপানে আরোহণও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবর্জনপূর্ব্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি ও নৈতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন প্রধান কর্ত্তব্য। এই জীর্ণশীর্ণ তমঃ-পীড়িত স্বার্থসীমাবদ্ধ জাতির ঔরসে জ্ঞানী, শক্তিমান ও উদার আর্য্যজাতির পুনঃসৃষ্টি করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই বঙ্গদেশে এত শক্তিবিশিষ্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম হইতেছে। ইঁহারা যদি সন্ন্যাসের মোহিনী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও ঈশ্বরদত্ত কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধর্ম্মনাশে জাতির ধ্বংস হইবে। তরুণ-সম্প্রদায় যেন মনে করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট; এই আশ্রমের পরবর্ত্তী অবস্থা গৃহস্থাশ্রম বিহিত আছে। যখন কুল-

রক্ষা ও ভাবী আর্য্যজাতি গঠন দ্বারা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট ঋণমুক্ত হইতে পারিব, যখন সৎকর্ম্ম ধনসঞ্চয় দ্বারা সমাজের ঋণ এবং জ্ঞান দয়া প্রেম ও শক্তি বিতরণে জগতের ঋণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর হিতার্থ উদার ও মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইবেন, তখন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আচরণ করা দোষাবহ হইবে না। অন্যথা ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বজন্মে ঋণমুক্ত বালসন্ন্যাসীদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু অনধিকারীর সন্ন্যাসগ্রহণ নিন্দনীয়। অযথা বৈরাগ্যবাহুল্যে ও ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মত্যাগপ্রবণতায় মহান্ ও উদার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন করিয়াও অনিষ্ট করিয়াছে এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। নবযুগের নবীন ধর্ম্মের মধ্যে যেন এই দোষ প্রবিষ্ট না হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনকে সন্ন্যাস আচরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন? তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের গুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্য ও কৃপাপরবশ পার্থ বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মপথের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্ম হইতে কামনারহিত যোগযুক্ত বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তুমি কেন গুরুজনহত্যারূপ অতি ভীষণ কর্ম্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ; অনেকে অর্জ্জুনের প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করিয়াছেন, এক-একজন শ্রীকৃষ্ণকে নিকৃষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্ত্তক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্ন্যাস হইতে ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে স্মরণ করিয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্মসেবাই উৎকৃষ্ট। ত্যাগের অর্থ কামনাত্যাগ, স্বার্থত্যাগ, সেই ত্যাগ শিক্ষার জন্য পর্ব্বতে বা নির্জ্জনস্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, কর্ম্মক্ষেত্রেই কর্ম্ম দ্বারা সেই শিক্ষা হয়, কর্ম্মই যোগপথে আরোহণের উপায়। এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের আনন্দ-উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে, এই আনন্দময় ক্রীড়া সাঙ্গ হউক। তিনি জীবকে তাঁহার সখা ও খেলার সাথী করিয়া জগতে আনন্দের স্রোত চালাইতে চান। আমরা যে অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, ক্রীড়ার সুবিধার জন্য তিনি দূরে রহিয়াছেন বলিয়াই সে অন্ধকার ঘিরিয়া থাকে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট এমন অনেক উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা তাঁহার ক্রীড়ায় বিরক্ত বা বিশ্রামপ্রার্থী হন, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহারই জন্য সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান তাঁহাদিগকেই ইহ-লোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা ও ক্রীড়ার সহচর বলিয়া গীতার গূঢ়তম শিক্ষা কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, কর্ম্মসন্ন্যাস জগতের পক্ষে অনিষ্টকর এবং ত্যাগহীন সন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র। সন্ন্যাসে যে

ফললাভ হয়, ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমতা শক্তিলাভ, আনন্দলাভ, শ্রীকৃষ্ণলাভ। সর্ব্বজনপূজিত ব্যক্তি যাহা করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে, অতএব তুমি যদি কর্ম্মসন্ন্যাস কর, সকলে সেই পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর ও অধর্ম্মপ্রাধান্য সৃষ্টি করিবে। তুমি কর্ম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম আচরণ কর, আদর্শস্বরূপ হইয়া সকলকে নিজ নিজ কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দাও, তাহা হইলেই আমার সাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত ও প্রিয়তম সুহৃদ হইবে। তাহার পরে তিনি বুঝাইয়াছেন যে, কর্ম্মদ্বারা শ্রেয়ঃ-পথে আরূঢ় হইয়া সেই পথে শেষ অবস্থায় শম অর্থাৎ সর্ব্ব-আরম্ভ-ত্যাগই বিহিত। ইহাও কর্ম্মসন্ন্যাস নহে, তাহা অহঙ্কার-বর্জন-পূর্ব্বক বহুলায়াসপূর্ণ রাজসিক চেষ্টাত্যাগে ভগবানের সহিত যুক্ত হইয়া, গুণাতীত হইয়া তাঁহার শক্তিচালিত যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করা। সেই অবস্থায় জীবের এই স্থায়ী জ্ঞান হয় যে আমি কর্ত্তা নহি, আমি দ্রষ্টা, আমি ভগবানের অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কর্ম্মময় আধারে ভগবানের শক্তিই লীলার কার্য্য করে। জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, পরমেশ্বর অনুমন্তা। এই জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ শক্তির কোনও কার্য্যারম্ভে কামনারূপ সাহায্য বা বাধা দিতে ইচ্ছুক হন না। শক্তির অধীন হইয়া দেহ-মন-বুদ্ধি ঈশ্বরাদিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডও যদি ভগবানের অনুমত হয় এবং স্বধর্ম্মপথে যদি তাহাই ঘটে, তাহাতেও অলিপ্তবুদ্ধি কামনারহিত জ্ঞান-প্রাপ্ত জীবের পাপস্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা অতি অল্পলোকের লভ্য জ্ঞান ও আদর্শ, ইহা সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। তবে এই পথের সাধারণ পথিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? তাহারও এই জ্ঞান কতক পরিমাণে প্রাপ্য যে, তিনি যন্ত্রী আমি যন্ত্র। সেই জ্ঞানের বলে ভগবানকে স্মরণ করিয়া স্বধর্ম্ম-সেবাই তাহার পক্ষে আদিষ্ট।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

স্বধর্ম্ম স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। কালের গতিতে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম যুগধর্ম্ম। জাতির কর্ম্মগতিতে যে জাতীয় স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম জাতির ধর্ম্ম। ব্যক্তির কর্ম্মগতিতে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম ব্যক্তির ধর্ম্ম। এই নানা সনাতন ধর্ম্মের সাধারণ আদর্শ দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত ও শৃঙ্খলিত হয়। সাধারণ ধার্ম্মিকের পক্ষে এই ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধর্ম্ম সেবার জন্য ও শক্তি সঞ্চিত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে বানপ্রস্থে বা সন্ন্যাসে অধিকার-প্রাপ্তি হয়। ইহাই ধর্ম্মের সনাতন গতি।

বিশ্বরূপ দর্শন

গীতায় বিশ্বরূপ

"বন্দেমাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথা প্রসঙ্গে অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা অদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জুন অন্তর্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, তাহা সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ; সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সেই জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; অতিপ্রাকৃত সত্য নহে,—কেননা বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর্গত, বিশ্বরূপ অতিপ্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য, কারণজগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জুন কারণজগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণত্ব অস্বীকার করেন এবং আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন। সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক এই দুইজনেরই উপর খড়্গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সংকীর্ণ

ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বলি। কেননা যাঁহারা সাকার ও নিরাকার, দ্বিবিধ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে একলে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রহ্মকে সীমার অধীন করিবেন? যদি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্ত্তা, স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; কিন্তু যেমন সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, স্থূলপ্রকৃতির নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবার ভান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডিনান্দ—এ কি হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন,—সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেননা ভগবান দেশকালাতীত অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার সামগ্রী, দেশ ও কাল রূপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শনিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্শ্বে, দূরে, চারিদিকে মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যে বলে আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবদ্-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট, তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে—যেমন সাধনা, যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্ব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক

ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নয়ন ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতি-প্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা নহে; ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ,—যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপ শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নহে—যাহা দেখিলেন, ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতিরঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে—সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবদ্-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—প্রাজ্ঞ-অধিষ্ঠিত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষুপ্তিতে কারণজগৎ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগৎ, জাগ্রতে স্থূলজগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত হয় আমাদের দেশ-কালের অতীত সূক্ষ্মে তাহা প্রতিভাসিত, ও স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতের নিয়ম অনুসারে অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থূলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু

দিব্যচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টির তিন প্রকার আছে—সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূর্ত্তি দেখি, বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্ত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি, দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি,—সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও

দেখিতে পাই। যাহা স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা যদি ইন্দ্রিয়গোচর হয় ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য—কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে।

গীতার ভূমিকা

প্রস্তাবনা

গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহ্যতম, গীতায় যে ধর্ম্মনীতি প্রচারিত, সকল ধর্ম্মনীতি সেই নীতির অন্তর্নিহিত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতায় যে কর্ম্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্ম্মপন্থা উন্নতিমুখী জগতের সনাতন মার্গ।

গীতা অযুতরত্নপ্রসূ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের নিম্নস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুঁজিতে খুঁজিতে সেই অনন্ত রত্নভাণ্ডারের সহস্রাংশ ধনও আহরণ করা দুষ্কর। অথচ দু-একটি রত্ন উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবদ্বিদ্বেষী প্রেমিক, মহাপরাক্রমী শক্তিমান কর্ম্মবীর তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে সজ্জিত ও সন্নদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন।

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সর্ব্বদা নূতন নূতন অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিস্মিত হইবেন।

এইরূপ গভীর ও গুপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গীতাসমুদ্রের অনুচ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলেও, ডুব না দিলেও, কতক শক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয়। গীতারূপ আকরের রত্নোদ্দীপিত অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া চারি-পার্শ্বে বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পতিত উজ্জ্বল মণি পাওয়া যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজিতে পারিব।

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসিবে না যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগৎশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে আর গীতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধি খরচ করিয়া এই জ্ঞানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিব, বহুকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরূঢ় হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে গীতোক্ত কয়েকটি গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার দু-একটি শিক্ষা ইহজীবনে

কার্য্যে পরিণত করিলাম। লেখক যেটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্ম্ম-পথে অভ্যাস করিয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনুযায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের সাহায্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

বক্তা

গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে বক্তা, পাত্র ও তখনকার অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাঁহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপকমাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জুন জীব, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রিপু সকল, পাণ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল বৃত্তি। ইহাতে যেমন মহাভারতকে কাব্যজগতে হীন স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা, কর্ম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা খর্ব্ব ও নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং গীতোক্ত ধর্ম্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কাল্পনিক অর্থ যদি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম্ম বীরের ধর্ম্ম, সংসারে আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারে অনুপযোগী শান্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্ত্রে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভগবান বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বিভূতিবাদ অবলম্বন করিয়া ভগবান সর্ব্বভূতের দেহে প্রচ্ছন্নভাবে অধিষ্ঠিত, বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পরিমাণে ব্যক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-দেহে পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমাত্র, সেই রূপক বর্জন করিয়া গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু সেই শিক্ষার এই অংশ বাদ দিতে পারি না। অবতারবাদ যদি থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচারক।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদনুসারে লীলা করিয়া গিয়াছেন। সেই লীলার প্রকাশ্য ও গূঢ় শিক্ষা যদি আয়ত্ত করিতে পারি, এই জগদ্ব্যাপী লীলার অর্থ উদ্দেশ্য ও প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিব। এই মহতী লীলার প্রধান অঙ্গ পূর্ণ-জ্ঞানপ্রবর্ত্তিত কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নিহিত ছিল, গীতায় তাহা প্রকাশিত হইল।

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মবীর, মহাযোগী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, রাজনীতিবিদ্‌ ও যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়দেহে ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার জীবনে মহাশক্তির অতুলনীয় বিকাশ ও রহস্যময় ক্রীড়া দেখি। সেই রহস্যের ব্যাখ্যা গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ জগৎপ্রভু, বিশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মহিমা প্রচ্ছন্ন করিয়া পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতি, সখা, মিত্র, শত্রু ইত্যাদি সম্বন্ধ মানবদিগের সহিত স্থাপন করিয়া লীলা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর্য্যজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রহস্য এবং ভক্তিমার্গের উত্তম শিক্ষা নিহিত আছে। ইহার তত্ত্বগুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তর্গত।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কল্পে কল্পে সেই সন্ধিস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। কলিযুগ চতুর্যুগের মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগ মানবোন্নতির প্রধান শত্রু পাপপ্রবর্ত্তক কলির রাজ্যকাল; মানবের অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলির রাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শক্তিবৃদ্ধি হয়, পুরাতনের ধ্বংসে নূতনের সৃষ্টি হয়, কলিযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। জগতের ক্রমবিকাশে অশুভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই কলিযুগে অতিবিকাশে নষ্ট হয়, এই দিকে নূতনের বীজ বপিত ও অংকুরিত হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পরিণত হয়। উপরন্তু যেমন জ্যোতিষ বিদ্যায় একটি গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তর্দ্দশা ভোগ হয়, তেমনই কলির দশায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নিজ নিজ অন্তর্দ্দশা বারবার ভোগ করে। এইরূপ চক্রগতিতে কলিযুগে ঘোর অবনতি, আবার উন্নতি, আবার ঘোরতর অবনতি, আবার উন্নতি হইয়া ভগবানের অভিসন্ধি সাধিত হয়। দ্বাপর কলির সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের অতিবিকাশ, অশুভের নাশ, শুভের বীজবপন ও অংকুরপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা করিয়া যান, তাহার পরে কলির আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই গীতার মধ্যে সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ্য জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন। কলির সত্য অন্তর্দ্দশার আগমনকালে গীতাধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেই সময় উপস্থিত বলিয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বসাধারণে এবং ম্লেচ্ছদেশে প্রসারিত হইতেছে।

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারূপ বাক্য স্বতন্ত্র করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

পাত্র

গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অর্জ্জুন। যেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ্দেশ্য ও নিগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সখা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্ম্মক্ষেত্রে অব-

তীর্ণ, তাঁহারা মানবদেহধারী পুরুষোত্তমের সহিত স্ব স্ব অধিকার ও পূর্ব্ব-কর্ম্মভেদানুসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণা-চালিত আত্মীয় ও বন্ধু, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের ন্যায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সমবয়স্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিয়তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম ভগিনী সুভদ্রার স্বামী। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অর্জ্জুনকে গীতার পরম রহস্য শ্রবণের পাত্ররূপে বরণ করিবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥

"এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত সখা বলিয়া তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পরম রহস্য।" অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্বরূপ কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র ব্যক্ত করিবার সময় এই কথার পুনরুক্তি হইয়াছে।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

"আবার আমার পরম ও সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা শ্রবণ কর। তুমি আমার অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেয়ঃ পথের কথা প্রকাশ করিব।" এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য শ্রুতির অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥

"এই পরমাত্মা দার্শনিকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধাশক্তিদ্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহারই লভ্য; তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ করেন।" অতএব যিনি ভগবানের সহিত সখ্য ইত্যাদি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ, তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

ইহার মধ্যে আর এক অতি প্রয়োজনীয় কথা নিহিত। ভগবান অর্জ্জুনকে এক শরীরে ভক্ত ও সখা বলিয়া বরণ করিলেন। ভক্ত নানাবিধ; সাধারণতঃ কাহাকেও ভক্ত বলিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই ভক্তির মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা সম্মান ও অন্ধভক্তি তাহার

বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না; তাঁহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ করেন; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও তাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন, তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করেন। সখা সর্ব্ব-কালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জ্ঞানগরিমা ও অকপট হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইয়া যদিও তাঁহার উপদেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে; তাঁহার সহিত তর্ক করেন, সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের প্রতিবাদও করেন। ভয়বিসর্জন সখ্য সম্বন্ধের প্রথম শিক্ষা; সম্মানের বাহ্য আড়ম্বর বিসর্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা; প্রেম তাহার প্রথম ও শেষ কথা। যিনি এই জগৎসংসারকে মাধুর্য্যময়, রহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ক্রীড়া বুঝিয়া ভগবানকে ক্রীড়ার সহচররূপে বরণ করিয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র। যিনি ভগবানের মহিমা, প্রভুত্ব, জ্ঞানগরিমা, ভীষণত্বও হৃদয়ঙ্গম করেন, অথচ অভিভূত না হইয়া তাঁহার সহিত নির্ভয়ে ও হাসিমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তিনি গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র।

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আর সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সখ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি মধুর হয়, এইরূপ সম্বন্ধই অর্জুন গীতার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্থাপন করিলেন। "তুমি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, তোমা ভিন্ন কাহার শরণাপন্ন হইব? আমি হতবুদ্ধি, কর্ত্তব্যভারে ভীত, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, তীব্রশোকে অভিভূত। তুমি আমাকে রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের সমস্ত ভার তোমার উপর ন্যস্ত করিলাম।" এই ভাবে অর্জুন মানবজাতির সখা ও সহায়ের নিকট জ্ঞানলাভার্থ আসিয়াছিলেন। আবার মাতৃসম্বন্ধ এবং বাৎ-সল্যভাবও সখ্যে সন্নিবিষ্ট হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, কনীয়ান ও অল্প-বিদ্য সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন, রক্ষা করেন, যত্ন করেন, সর্ব্বদা কোলে রাখিয়া বিপদ ও অশুভ হইতে পরিত্রাণ করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট স্বীয় মাতৃরূপও প্রকাশ করেন। সখ্যের মধ্যে যেমন মাতৃপ্রেমের গভীরতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট আনন্দও আসিতে পারে। সখা সখার সান্নিধ্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন, তাঁহার বিরহে কাতর হয়েন; তাঁহার দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করিতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সখ্যের ক্রীড়ার অন্তর্ভুক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বলা হইয়াছে, যিনি যত মধুর সম্বন্ধ পুরুষোত্তমের সহিত স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহার সখ্যভাব তত প্রস্ফুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্রত্ব লাভ হয়।

কৃষ্ণ-সখা অর্জুন মহাভারতের প্রধান কর্ম্মী, গীতায় কর্ম্মযোগশিক্ষা প্রধান শিক্ষা। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এই তিন মার্গ পরস্পর বিরোধী নহে, কর্ম্ম-

মার্গে জ্ঞান-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মে ভক্তিলব্ধ শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কর্ম্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা। যাঁহারা সংসারের দুঃখে ভীত, বৈরাগ্য-পীড়িত, ভগবানের লীলায় জাতবিতৃষ্ণ, লীলা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের মার্গ স্বতন্ত্র। বীরশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর অর্জুনের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ন্যাসী বা দার্শনিক জ্ঞানীর নিকট এই উত্তম রহস্য প্রকাশ করেন নাই, কোন অহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণকে এই শিক্ষার পাত্র বলিয়া বরণ করেন নাই, মহাপরাক্রমী তেজস্বী ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় জ্ঞানলাভের উপযুক্ত আধার বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিলেন। যিনি সংসার-যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে অবিচলিত, তিনিই এই শিক্ষার গূঢ়তম স্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যিনি মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তিনিই ভগবৎ-সান্নিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে নিত্য-মুক্তস্বভাববান বলিয়া উপলব্ধি করিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজ্ঞানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জন করিতে সক্ষম। যিনি তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার বর্জন করিয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কারে বদ্ধ থাকিতে চাহেন না তিনিই গুণাতীত হইতে সক্ষম। অর্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে রাজসিক বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্ত্বিক আদর্শ গ্রহণে রজঃশক্তিকে সত্ত্বমুখী করিয়াছেন। সেইরূপ পাত্র গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার।

অর্জুন সমসাময়িক মহাপুরুষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যুগের সর্ব্ববিধ সাংসারিক জ্ঞানে পিতামহ ভীষ্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষ্ণায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় ও সাত্ত্বিক গুণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রেষ্ঠ, ভক্তিতে উদ্ধব ও অক্রূর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্য্যে ও পরাক্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথী কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অর্জুনকেই জগৎপ্রভু বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়শ্রী এবং গাণ্ডীব প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা ভারতের সহস্র সহস্র জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধাকে নিপাত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন সাম্রাজ্য অর্জুনের পরাক্রমলব্ধ দানরূপে সংস্থাপন করিলেন; উপরন্তু তাঁহাকেই গীতোক্ত পরম জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্ণীত করিলেন। অর্জুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কর্ম্মী, সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকীর্ত্তি ঘোষণা করে। ইহা পুরুষোত্তম বা মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোত্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভরপূর্ব্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, পাপ ও পুণ্যের সমস্ত ভার তাঁহাকে সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া তদাদিষ্ট কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া

তৎপ্রেরিত বৃত্তি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত গুণ সাগ্রহে আলিঙ্গন না করিয়া তদ্দত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্য্যে প্রযুক্ত করেন; সেই শ্রদ্ধাবান অহংকার-রহিত কর্ম্মযোগী পুরুষোত্তমের প্রিয়তম সখা ও শক্তির উত্তম আধার, তাঁহা দ্বারা জগতের বিরাট কার্য্য নির্দ্দোষরূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মুহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অর্জুনও সেইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সেই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। যিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ় চেষ্টা করেন, তিনিই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন।

অবস্থা

মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য ও উক্তির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কার্য্য বা সেই উক্তি কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকালে যখন শস্ত্রপ্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে—প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে—সেই সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বা বুদ্ধির দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ ভাবাপন্ন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন।

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কর্ম্মস্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরন্তু যাঁহারা কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে মহাব্রতে অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক শত্রুবৃদ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা স্বভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন দিব্যশক্তি জন্মিয়াছে, তখন ব্রতের শেষ উদ্‌যাপনার্থে, ভগবানের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। গীতা কর্ম্মযোগকে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্ম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীতোক্ত মার্গের পথিক পথত্যাগ করিয়া দূরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্ব্বতে বা নির্জ্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কর্ম্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, সৈন্যদ্বয়ের মধ্যস্থল, সেখানে শস্ত্রপাত হইতেছে। যাঁহারা এই পথে পথিক, এইরূপ কর্ম্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোৎপাদক সময়ে, যখন কর্ম্মীর কর্ম্মানুসারে অদৃষ্টের গতি এদিক না ওদিক চালিত হইবে, তখনই অকস্মাৎ তাঁহাদের যোগসিদ্ধি ও পরমজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার

জ্ঞান কর্ম্মরোধক নয়, কর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নির্জ্জনে, স্বস্থ আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষিগণ নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। কিন্তু গীতোক্ত যোগের পথিক মন-প্রাণ-দেহরূপ আধার এমন-ভাবে বিভক্ত করিতে পারেন যে, তিনি জনতায় নির্জ্জনতা, কোলাহলে শান্তি, ঘোর কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরম নিবৃত্তি অনুভব করেন। তিনি অন্তরকে বাহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্ব্বক যোগাশ্রমে শরণ লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হন। সংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ যোগী বাহ্যিক শান্তি ও নীরবতা অভিলাষ করেন, শান্তিভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কর্ম্মযোগী অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যিক কোলাহলে সেই অবস্থা আরও গভীর হয়, বাহ্যিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তরিক তপঃ ভগ্ন হয় না, অবিচলিত থাকে। লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয়? উত্তর, যোগপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শান্তি বিরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে কর্ম্মোপযোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত। যাঁহারা গীতোক্ত যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী অথচ কর্ম্মে অনাসক্ত। কর্ম্মের মধ্যেই আত্মার আন্তরিক আহ্বান শ্রবণে তাঁহারা কর্ম্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ন ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কর্ম্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব কর্ম্মফলের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে, কর্ম্মযোগের সুবিধার জন্য, কর্ম্মের উন্নতির জন্য, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্ম্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন যে তপস্যায় কখনও বৃথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না।

পাত্রের ভাব, কর্ম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেক। বিশ্বসমস্যা, সুখদুঃখ সমস্যা, পাপপুণ্য সমস্যায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বলিয়া নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় বুঝাইয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। যীশু, টলষ্টয় ইত্যাদি মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। সন্ন্যাসী বলেন, কর্ম্মই অজ্ঞানসৃষ্ট, অজ্ঞান বর্জ্জন কর, কর্ম্ম বর্জ্জন কর, শান্ত নিষ্ক্রিয় হও। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই সংসার কেন? ভগবান যদি থাকেন, কেন অর্ব্বাচীন বালকের ন্যায় এই বৃথা পন্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস আরম্ভ করিয়াছেন? আত্মাই যদি থাকেন, জগৎ মায়াই হয়, এই আত্মাই বা কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নির্ম্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন? নাস্তিক

বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। তাহাই বা কিরূপ কথা? শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, কেনই বা অন্ধ ও উন্মত্ত? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই, না খৃষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদী, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞানিক; সকলেই এই বিষয়ে নিরুত্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁকি দিতে সচেষ্ট। এক উপনিষদ ও তাহার অনুকূল গীতা এইরূপ ফাঁকি দিতে অনিচ্ছুক। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্ম্ম, গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, আত্মীয়হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত-প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের প্রারম্ভে, অর্জ্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গাণ্ডীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়াছেন কাতরস্বরে বলিতেছেন—

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥

"কেন আমাকে এই ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ?" উত্তরে সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বজ্রগম্ভীর স্বরে ভগবৎ-মুখ-নিঃসৃত মহাগীত উঠিয়াছে—

কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং।

*

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

*

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥

*

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

*

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

*

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

*

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

*

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

*

মস্যা হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা।
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥

*

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

"অতএব তুমি কর্ম্মই করিয়া থাক, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্বে যে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, তোমাকেও সেই কর্ম্ম করিতে হইবে।......যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম কর।...যাঁহার বুদ্ধি যোগস্থ, তিনি পাপ পুণ্য এই কর্ম্মক্ষেত্রেই অতিক্রম করেন, অতএব যোগার্থ সাধনা কর, যোগই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধন।...মানুষ যদি অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করেন তিনি নিশ্চয় পরম ভগবানকে লাভ করিবেন।...জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ে আমার উপর তোমার সকল কর্ম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পরিত্যাগে, অহঙ্কার পরিত্যাগে দুঃখরহিত হইয়া যুদ্ধে লাগ। ...যিনি মুক্ত, আসক্তিরহিত, যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা জ্ঞানে নিবাস করে, যিনি যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করেন, তাঁহার সকল কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া তখনই আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।··সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্নিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া মোহে পতিত হয়।...আমাকে সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সখা ও বন্ধু বলিয়া জানিলে পরম শান্তিলাভ হয়।...আমিই তোমার শত্রুগণকে বধ করিয়াছি, তুমি যন্ত্র হইয়া তাহাদের সংহার কর, দুঃখিত হইও না, যুদ্ধে লাগিয়া যাও, বিপক্ষকে রণে জয় করিবে।...যাঁহার অন্তঃকরণ অহংজ্ঞানশূন্য, যাঁহার বুদ্ধি নির্লিপ্ত, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহার করেন, তথাপি তিনি হত্যা করেন নাই, তাঁহার পাপরূপ কোন বন্ধন হয় না।"

প্রশ্ন এড়াইবার ফাঁকি দিবার কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নটি পরিষ্কারভাবে উত্থাপন করা হইল। ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধর্ম্মপথ কি, গীতায় এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। অথচ সন্ন্যাসশিক্ষা নয়, কর্ম্মশিক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য। ইহাতেই গীতার সার্ব্বজনীন উপযোগিতা।

প্রথম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—

হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

তখন রাজা দুর্য্যোধন রচিতব্যূহ পাণ্ডব-অনীকিনী দেখিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

"দেখুন আচার্য্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা রচিতব্যূহ এই মহতী পাণ্ডবসেনা দেখুন।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অর্জ্জুনের সমান মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষ আছেন, —যুযুধান, বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও মহাপ্রতাপী কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরপুঙ্গব শৈব্য,

বিক্রমশালী যুধামন্যু ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, যাঁহারা আমার সৈন্যের নেতা, তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণার্থ বলিতেছি, লক্ষ্য করুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ ও সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ততনয় ভূরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ,

এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

আমাদের এই সৈন্যবল একে অপরিমিত, তাহাতে ভীষ্ম আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পরিমিত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সৈন্য ভাগে অবস্থান করিয়া সকলে ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।”

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

দুর্য্যোধনের প্রাণে হর্ষোদ্রেক করিয়া কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহ-নাদে রণস্থল ধ্বনিত করিয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খনিনাদ করিলেন।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদ্য অকস্মাৎ বাদিত হইল, রণ-স্থল উচ্চ-শব্দসঙ্কুল হইল।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ এবং নকুল সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ।
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত যোদ্ধা সাত্যকি,

দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারিদিক হইতে স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

সেই মহাশব্দ আকাশ ও পৃথিবী তুমুলরবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

তখন শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইবার পরে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন।

অর্জ্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

"হে নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর, ততক্ষণ যুদ্ধ-

স্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি। জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রণোৎসবে যুদ্ধ করিতে হইবে।

দেখি এই যুদ্ধপ্রার্থীগণ কাহারা, যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য করিবার কামনায় এইখানে সমাগত

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূর্ব্বক

ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমুদয় নৃপতিবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ।"

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরবিরোধী সৈন্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়া কুন্তীপুত্র তীব্র কৃপায় আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

"হে, কৃষ্ণ, এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমার দেহের অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে,

সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গাণ্ডীব অবশ হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে, চর্ম্ম যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

আমি দাঁড়াইবার শক্তিরহিত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না; হে কৃষ্ণ, আমি জয়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, সুখও চাহি না।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ ভোগে? কি প্রয়োজন জীবনে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয়,

তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত,—আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ,

মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক, কুটুম্ব। হে মধুসূদন, ইঁহারা যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ করিতে চাই না।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

ত্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য ত দূরের কথা। ধার্ত্তরাষ্ট্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দ্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে পারে?

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

ইহাঁরা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয়

পাইবে। অতএব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আমরা অধিকারী নহি। হে মাধব, স্বজন বধে আমরা কিরূপে সুখী হইব?

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন॥ ৩৮॥

যদিও ইঁহারা লোভে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের অনিষ্ট-করণে মহাপাপ বুঝেন না,

আমরা, জনার্দ্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে না, এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব না?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্মসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মনাশে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০॥

অধর্ম্মের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হয়। কুলস্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১॥

বর্ণসঙ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক হইতে বঞ্চিত হইয়া পিতৃলোক হইতে পতিত হন।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪২॥

কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোৎপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাতি-ধর্ম্ম সকল ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হয়।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশশ্রুম॥ ৪৩॥

যাঁহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মনুষ্যদের নিবাস নরকে নির্দ্দিষ্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥ ৪৪॥

ওহো! আমরা অতি মহৎ পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, যে, রাজ্য-সুখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম করিতেছিলাম।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

যদি অশস্ত্র ও প্রতিকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রণে সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল।”

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

এই বলিয়া অর্জ্জুন শোকোদ্বেগে কলুষিতচিত্ত হইয়া যুদ্ধকালে আরূঢ়-শর ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক রথে বসিয়া পড়িলেন।

সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তি

গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাজা ধৃতরাষ্ট্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা কি, বৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসুক। সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথা আধুনিক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি বলিতাম অমুক লোক দূরদৃষ্টি (Clairvoyance) ও দূরশ্রবণ (Clair-audience) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ দৃশ্য ও মহারথীগণের সিংহনাদ ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটি তত অবিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারিত। আর ব্যাস-দেব যে এই শক্তি সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আরও আষাঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইতে প্রবৃত্তি হয়। যদি বলিতাম যে একজন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ অমুক লোককে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত (Hypnotised) করিয়া তাঁহার মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা পাশ্চাত্য hypnotism-এর কথা মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেও পারিতেন। অথচ hypnotism যোগশক্তির নিকৃষ্ট ও

বর্জ্জনীয় অংগ মাত্র। মানুষের মধ্যে এমন অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে পূর্ব্বকালের সভ্যজাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত; কিন্তু কলি-সম্ভূত অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা ভাসিয়া গিয়াছে, কেবল আংশিকরূপে অল্প লোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞান বলিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বলিয়া স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, সূক্ষ্ম শব্দ শ্রবণ, সূক্ষ্ম গন্ধ আঘ্রাণ, সূক্ষ্ম পদার্থ স্পর্শ ও সূক্ষ্ম আহার আস্বাদ করিতে পারি। সূক্ষ্মদৃষ্টির চরম পরিণামকে দিব্যচক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে দূরস্থ, গুপ্ত বা অন্যলোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস যে এই দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য hypnotismএর অদ্ভুত শক্তিতে যদিও আমরা অবিশ্বাসী হই না, তবে অতুল্য জ্ঞানী ব্যাসদেবের শক্তিতে অবিশ্বাসী হইব কেন? শক্তিমানের শক্তি পরের শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো প্রভৃতি কর্ম্মবীর উপযুক্ত পাত্রে শক্তিসংক্রামণ দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের সহকারী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কিছু-ক্ষণের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য পরকে স্বীয় সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন—ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসামান্য যোগ-সিদ্ধ পুরুষ। বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত্ব আষাঢ়ে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথা। আমরা জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকা আঘ্রাণ করে না, ত্বক্ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্বাদ করে না; মনই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আঘ্রাণ করে, মনই স্পর্শ উপলব্ধি করে, মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রে ও মনস্তত্ত্ববিদ্যায় এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, hypnotismএ ইহা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণিত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্রিত হইলেও দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থূলেন্দ্রিয় জ্ঞানপ্রাপ্তির কেবল সুবিধাজনক উপায়, স্থূল শরীরের সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দ্বারা সেই জ্ঞান মনে পৌঁছাইতে পারি—যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আকৃতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। কিন্তু অন্ধের দৃষ্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি মনের মধ্যে দেখে। ইহাকেই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি সম্মুখস্থিত পুস্তক দর্শন করি না, সেই

পুস্তকের যে প্রতিমূর্ত্তি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয়, তাহাই দেখিয়া মন বলে, পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্রবণে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক প্রণালীর আবশ্যকতা নাই—সূক্ষ্মদৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে পারি। লণ্ডনে ঘরে বসিয়া সে সময় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখিলাম, এইরূপ দৃষ্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে, সূক্ষ্মদর্শী মনের মধ্যে অদৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করে, দিব্যচক্ষু দ্বারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, শারীরিক চক্ষের সম্মুখে দেখি, চিন্তাস্রোতে সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরিক কর্ণে শুনি। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত Crystalএ বা কালির মধ্যে সমসাময়িক ঘটনা দেখা। কিন্তু দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে এইরূপ উপকরণের কোন আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শক্তিবিকাশে বিনা উপকরণে দেশকালের বন্ধন খুলিয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি. কালবন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ত্রিকালদর্শী হইতে পারে, তাহার এত বহু সংখ্যক ও সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। তবে যদি দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচক্ষু দ্বারা সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পান্ডবগণকে চক্ষে দেখিলেন, দুর্য্যোধনের উক্তি, পিতামহ ভীষ্মের ভীম সিংহনাদ, পাঞ্চজন্যের কুরুধ্বংসঘোষক মহাশব্দ ও গীতার্থদ্যোতক কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ কর্ণে শ্রবণ করিলেন।

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও কবির কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তার্কিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার কোনও কথা যে অসম্ভব বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। এইজন্যই দিব্যচক্ষুপ্রাপ্তির কথার এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

দুর্য্যোধনের বাক্‌কৌশল

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্য্যোধন পান্ডবসৈন্য রচিত ব্যূহ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভীষ্মই সেনাপতি, যুদ্ধের

কথা তাঁহাকেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু কূটবুদ্ধি দুর্য্যোধনের মনে ভীষ্মের উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের অনুরক্ত, হস্তিনাপুরের শান্ত্যনুমোদক দলের (Peace party) নেতা; যদি পাণ্ডবে ধার্ত্তরাষ্ট্রেই যুদ্ধ হইত, ভীষ্ম কখনই অস্ত্রধারণ করিতেন না; কিন্তু কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ সাম্রাজ্যলিপ্সু পাঞ্চালজাতি দ্বারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্—সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে চিররক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন স্বয়ং অসুরপ্রকৃতি, রাগদ্বেষই তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের প্রমাণ ও হেতু, অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করিবার বল এই কঠিন তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। স্বদেশহিতৈষী পরামর্শের সময়ে স্বীয় মত প্রকাশপূর্ব্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও অহিত হইতে নিবৃত্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই অন্যায় ও অহিত একবার লোক দ্বারা স্বীকৃত হইলে স্বীয় মত উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মযুদ্ধেও স্বজাতিরক্ষা ও শত্রুদমন করেন, ভীষ্মও সেই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ভাবও দুর্য্যোধনের বোধাতীত। অতএব ভীষ্মের নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তিগতভাবে পাঞ্চালরাজের ঘোর শত্রু, পাঞ্চাল দেশের রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অর্থাৎ দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা স্মরণ করাইলে আচার্য্য শান্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন। স্পষ্ট সেই কথা বলিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নের নামমাত্র উল্লেখ করিলেন, তাহার পরে ভীষ্মকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে কুরুরাজ্যের রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষের মুখ্য মুখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ করিলেন, পরে স্বসৈন্যের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ ও ভীষ্মের নামই তাঁহার অভিসন্ধিসিদ্ধ্যর্থ যথেষ্ট, তবে সেই অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য আর চারি-পাঁচটি নাম বলিলেন। তাহার পরে বলিলেন, "আমার সৈন্য অতি বৃহৎ, ভীষ্ম আমার সেনাপতি, পাণ্ডবদের সৈন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের আশাস্থল ভীমের বাহুবল, অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন? তবে ভীষ্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত, তিনি থাকিলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।" অনেকে 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের বিপরীত অর্থ করেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে. দুর্য্যোধনের সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ শৌর্য্যে বীর্য্যে কাহারও ন্যূন নহেন, আত্মশ্লাঘী দুর্য্যোধন কেন স্ববলের নিন্দা করিয়া নিরাশা উৎপাদন করিতে যাইবেন? ভীষ্ম দুর্য্যোধনের মনের ভাব ও কথার গূঢ়

উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করিলেন। দুর্য্যোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, দ্রোণ ও ভীষ্ম দ্বিধা দূর করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

পূর্ব্ব সূচনা

যেই ভীষ্মের গগনভেদী শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল, তখনই সেই বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে রথীগণ মাতিতে লাগিল। অপরদিকে পান্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের যুদ্ধাহ্বানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পান্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচন্ডীকে সৈন্যের হৃদয়ে জাগাইলেন। সেই মহান্ শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত করিয়া যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার এই অর্থ নহে যে ভীষ্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীত হইলেন, তাঁহারা বীরপুরুষ, রণচন্ডীর আহ্বানে ভীত হইবেন কেন? এই উক্তিতে কবি প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্রনাদ অনেকবার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া যায় এই-রূপ শ্রোতার বোধ হয়, তেমনই এই রণক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সঞ্চার হইল; আর এই শব্দ যেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা, যেই হৃদয়গুলি পান্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবে, পূর্ব্বেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ সেইগুলি বিদীর্ণ করিয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি আমার রথ দুই সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দেখিতে ইচ্ছা করি, কে কে বিপক্ষ, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়কর্ম্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জুনের ভাব এই যে আমিই পান্ডবদের আশাস্থল, আমা দ্বারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হন্তব্য, অতএব দেখি ইহারা কাহারা। এই পর্যন্ত অর্জুনের সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা কিম্বা দৌর্ব্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বিপক্ষের সৈন্যে উপস্থিত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জুন জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে অস-পত্ন সাম্রাজ্য দিবার জন্য উদ্যোগী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অর্জুনের মনে দৌর্ব্বল্য আছে, এখন চিত্ত পরিষ্কার না করিলে এমন কোনও সময়ে উহা অক-স্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে পারে যে পান্ডবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয় ত সর্ব্বনাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন যে ভীষ্ম দ্রোণ ইত্যাদি অর্জুনের প্রিয়জন তাঁহার সম্মুখে রহিলেন

অথচ আর সকল কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ, সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। স্মরণ করিতে হয় যে অর্জুন স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশের গৌরব, তাঁহার সকল আত্মীয়, প্রিয়জন, বাল্যের সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই তিনটি সামান্য কথার গভীর অর্থ ও ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন অর্জুন দেখিলেন যাঁহাদের সংহার করিয়া যুধিষ্ঠিরের অসপত্ন রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ নন, নিজ প্রিয় আত্মীয়, গুরু, বন্ধু, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখিলেন সমস্ত ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ পরস্পরের সহিত প্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ অথচ পরস্পরকে সংহার করিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্রে আগত।

বিষাদের মূল কারণ

অর্জুনের নির্ব্বেদের মূল কি? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুমার্গপ্রদর্শক ও অধর্ম্মের অনুমোদক বলিয়া নিন্দা করেন। খৃষ্টধর্ম্মের শান্তিভাব, বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাভাব এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমভাবই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দ্বাপর যুগের মহাবীর পাণ্ডবের মনেও উঠে নাই; অহিংসাভাব শ্রেষ্ঠ, বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাপ বলিয়া যুদ্ধে বিরত হওয়া উচিত, এই চিন্তার কোনও চিহ্নও অর্জুনের কথায় ব্যক্ত হয় না। বলিলেন বটে, গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবের হত্যায় পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া এই কথা বলেন নাই, কর্ম্মের ফল দেখিয়া বলিলেন; সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিষাদ ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা দিয়াছেন যে কর্ম্মের ফল দেখিতে নাই, কর্ম্মের স্বভাব দেখিয়া সেই কর্ম্ম উচিত না অনুচিত স্থির করিতে হয়। অর্জুনের প্রথম ভাব এই যে ইঁহারা আমার আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর, সকলে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র, ইঁহাদের হত্যায় অসপত্ন রাজ্যলাভ করিলে সেই রাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন দুঃখ ও পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হয়, বন্ধুবান্ধবশূন্য পৃথিবীর রাজ্য কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। অর্জুনের দ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিয়জনকে হত্যা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, যাঁহারা দ্বেষের পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তৃতীয় ভাব

এই যে স্বার্থের জন্য এইরূপ কর্ম্ম করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত। চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতৃবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধ্বংস ঘটিবে, এইরূপ কুফল সৃষ্টি কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে মহাপাপ। এই চারিটি ভাব ভিন্ন অর্জ্জুনের বিষাদের মূলে আর কোনও ভাব নাই। ইহা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অর্থও বুঝা যায় না। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত গীতার ধর্ম্মের বিরোধ ও সামঞ্জস্যের কথা পরে বলা হইবে। অর্জ্জুনের কথার ভাব সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন করি।

বৈষ্ণবী মায়ার আক্রমণ

অর্জ্জুন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। স্নেহ ও কৃপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অর্জ্জুন অভিভূত ও পরাস্ত, তাঁহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্ত্তে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ সকল অবসন্ন, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, বলবান হস্ত গাণ্ডীব ধারণে অসমর্থ, শোকের উত্তাপে জ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীরের দৌর্ব্বল্য হইয়াছে, ত্বক্ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতরে শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে। এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রথম কবির তেজস্বিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া কেবল সেই কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই; কিন্তু যদি সূক্ষ্মবিচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গূঢ় অর্থ মনে উদয় হয়। অর্জ্জুন পূর্ব্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আন্তরিক উৎপাত হইয়াছে। মনুষ্যজাতির অনেক অতিপ্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনের হৃদয়তলে গুপ্ত-ভাবে রহিয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয়। নিগৃহীত বৃত্তি ও ভাব সকল হয় এই জন্মে, নহে পর জন্মে একদিন চিত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় করিয়া সমস্ত কর্ম্ম স্ববিকাশের অনুকূল পথে চালায়। এই হেতু, যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চরিত্র, সে অন্য জন্মে সাধু ও পবিত্রচেতা হয়। নিগ্রহ না করিয়া বিবেক ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বৃত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত্ত পরি-ষ্কার করিতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানের প্রভাবে তমোভাবের

অপনোদন না হইলে সংযম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অজ্ঞান দূর করিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিত্তশোধন করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু পরিহার্য্য বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত না করিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর পায় না, উপরন্তু যুদ্ধেই অন্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষস বিবেক দ্বারা হত হয়, তখন বিবেক বুদ্ধিকে মুক্ত করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রবৃত্তি চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অনভ্যস্ত সাধককে ভীতি ও শোকে বিহ্বল করিয়া ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য দেশে শয়তানের প্রলোভন, ইহাই মারের আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অজ্ঞানসম্ভূত, সেই প্রলোভন শয়তানের নহে, ভগবানের। অন্তর্য্যামী জগদ্গুরুই সেই সকল প্রবৃত্তি সাধককে আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, অমঙ্গলের জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, চিত্তশোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশরীরে বাহ্যজগতে অর্জুনের সখা ও সারথি, তেমনই তাঁহার মধ্যে অশরীরী ঈশ্বর ও অন্তর্য্যামী পুরুষোত্তম, তিনিই এই গুপ্ত বৃত্তি ও ভাব প্রবল বেগে এক সময় বুদ্ধির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকার তৎক্ষণাৎ স্থূল শরীরে কবিবর্ণিত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক দুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, তাহা আমরা জানি, তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ অনুভবের বহির্ভূত নহে। অর্জুনকে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অখন্ড বলে এক মুহূর্ত্তে অভিভূত করিল, সেইজন্য এই প্রবল বিকার। যখন অধর্ম্ম দয়া প্রেম ইত্যাদি কোমল ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া, অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদ্মবেশী হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতার ভাণ করিয়া বলে, আমি সাত্ত্বিক, আমি জ্ঞান আমি ধর্ম্ম, আমি ভগবানের প্রিয় দূত, পুণ্যরূপী ও পুণ্যপ্রবর্ত্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে।

বৈষ্ণবী মায়ার লক্ষণ

এই বৈষ্ণবী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা ও স্নেহ। মানবজাতির প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শারীরিক ও প্রাণকোষাগত বিকারের বশে পবিত্র প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাঙ্গ হয়। চিত্তই বৃত্তির বাসস্থান, প্রাণ ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কর্ম্মের যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজ্য। বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের অবিরোধী প্রবৃত্তি হয়, চিত্তে ভাব

ওঠে, শরীর দ্বারা তদনুযায়ী কর্ম্ম হয়, বুদ্ধিতে তৎসম্পর্কীয় চিন্তা হয়, প্রাণ সেই ভাব, কর্ম্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃতির এই আনন্দময় ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ শারীরিক বা মানসিক ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া শরীরকে কর্ম্মযন্ত্র না করিয়া ভোগের উপায় করে, শরীর ভোগে আসক্ত হইয়া বার বার শারীরিক ভোগের জন্য দাবী করে, চিত্ত শারীরিক ভোগের কামনায় আক্রান্ত হইয়া নির্ম্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়, আর কলুষিত বাসনাযুক্ত ভাব চিত্তসাগর বিক্ষুব্ধ করে, সেই বাসনার কোলাহল বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া বিব্রত করে, বধির করে, বুদ্ধি আর নির্ম্মল, শান্ত, অভ্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চঞ্চল মনের বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তাবিভ্রাটে, অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। জীবও এই বুদ্ধিভ্রংশে হৃতজ্ঞান হইয়া সাক্ষীভাব ও নির্ম্মল আনন্দভাবে বঞ্চিত হইয়া আধারের সহিত নিজ একত্ব স্বীকার করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি এই ভ্রান্ত ধারণায় শারীরিক ও মানসিক সুখ দুঃখে সুখী ও দুঃখী হয়। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নতির প্রথম সোপান। এই অশুদ্ধতা কেবল তামসিক ও রাজসিক বৃত্তিকে কলুষিত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, সাত্ত্বিক বৃত্তিকে কলুষিত করে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানসিক ভোগের সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে আমার ক্লেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ চিত্তকে কলুষিত করিয়া নির্ম্মল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিও সেই অশুদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হইয়া বলে, অমুক আমার স্ত্রী, ভাই, ভগ্নী, সখা, আত্মীয়, মিত্র তাহাকেই ভালবাসিতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য্য যদি কর, তাহা পাপ, ক্রূরতা, অধর্ম্ম। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবতী কৃপা হয় যে প্রিয়জনের কষ্ট, প্রিয়জনের অনিষ্ট অপেক্ষা ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দেওয়াও শ্রেয়স্কর বোধ হয়, শেষে এই কৃপার উপর আঘাত পড়ে বলিয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া নিজ দৌর্ব্বল্যের সমর্থন করি। এইরূপ বৈষ্ণবী মায়ার প্রমাণ অর্জুনের প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবী মায়ার ক্ষুদ্রতা

অর্জুনের প্রথম কথা, ইঁহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, ভালবাসার পাত্র, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদের কি হিত সাধিত হইবে? বিজেতার গর্ব্ব, রাজার গৌরব, ধনীর সুখ? আমি এই সকল শূন্য স্বার্থ চাই

না। লোকের রাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন? স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছেন বলিয়া, আত্মীয়-স্বজনকে সুখে রাখিতে পারিব বলিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত ঐশ্বর্য্যের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারিব বলিয়া এই সকল সুখ ও মহত্ত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখ চাই, তাঁহারাই আমাদের শত্রু হইয়া যুদ্ধে উপস্থিত। তাঁহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ করিতে সম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে কখন বধ করিতে পারিব না। যদি তাঁহাদের হত্যায় ত্রিলোকরাজ্য অধিকার করিতাম, তাহা হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর অসপত্ন সাম্রাজ্য কি ছার! স্থূল-দর্শী লোক—

"ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"

এবং

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।"

এই উক্তিতে মোহিত হইয়া বলেন, "অহো! অর্জুনের কি মহান্ উদার নিঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, চিরদুঃখ তাঁহার বাঞ্ছনীয়।" কিন্তু যদি অর্জুনের মনের ভাব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জুনের ভাব অতি ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলতা-প্রকাশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্য্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে, আর্য্যের পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্বার্থ-ত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, কৃপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা অধম ভাব। ধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্য স্নেহ, কৃপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আর্য্যভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জুন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, "ধার্ত্তরাষ্ট্রদের বধে আমাদের কি সুখ, কি মনস্তুষ্টি হইতে পারে? তাঁহারা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যদিও অন্যায় করেন ও আমাদের শত্রুতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, তাঁহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে, সুখ হইবে না।" অর্জুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখের জন্য বা যুধিষ্ঠিরের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রবধে নিযুক্ত হন নাই, ধর্ম্মস্থাপন, অধর্ম্মনাশ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন, ভারতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সমস্ত সুখকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি অর্জুনের কর্ত্তব্য।

কুলনাশের কথা

কিন্তু স্বীয় দুর্ব্বলতার সমর্থনে অর্জুন আর এক উচ্চতর যুক্তি আবিষ্কার করিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ নহে, অধর্ম্মযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায় মিত্রদ্রোহ, অর্থাৎ যাঁহারা স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদের অনিষ্ট করা হয়, উপরন্তু স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষত্রিয় বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, অহার বিনাশ সাধিত হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রায়ই রক্তের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক মহান্ কুল বিস্তার পাইয়া জাতিতে পরিণত হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতির অন্তর্গত কুলবিশেষ এক-একটি বলশালী জাতি হইয়াছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ ও পরস্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অর্জুন মিত্রদ্রোহ নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিত্রদ্রোহ নৈতিক হিসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান্ দোষ মিত্রদ্রোহে সন্নিবিষ্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সনাতন কুলধর্ম্মের সম্যক্ পালন কুলের উন্নতির ও অবস্থিতির কারণ, যে মহৎ আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা গার্হস্থ্যজীবনে ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই আদর্শের হানি বা শৃঙ্খলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে তমোভাবের প্রসারণে মহান্ ধর্ম্মে শিথিলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চরিত্রা হয় এবং কুলের পবিত্রতা নষ্ট হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিত্রবিশিষ্ট লোকের ঔরসে মহান্ কুলে পুত্রোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে কুলহন্তাদের নরকপ্রাপ্তি হয় এবং অধর্ম্মের প্রসারে, বর্ণসঙ্করসম্ভূত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নরকপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উভয়ই কুলনাশে নষ্ট হয়। জাতিধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত কুলসমষ্টিতে যে মহান্ জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপরম্পরায় আগত সনাতন আদর্শ ও কর্ম্মশৃঙ্খলা। তাহার পরে অর্জুন আবার তাঁহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্ত্তব্যকর্ম্মবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া যুদ্ধের সময়েই গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া রথে বসিয়া পড়িলেন। কবি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, শোকে তাঁহার বুদ্ধিবিভ্রাট হইয়াছিল বলিয়া অর্জুন এইরূপ ক্ষত্রিয়ের অনুচিত অনার্য্য আচরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা

আমরা অর্জ্জুনের কুলনাশবিষয়ক কথার মধ্যে একটি অতি বৃহৎ ও উন্নত ভাবের ছায়া দেখিতে পাই, এই ভাবের সহিত যে গুরুতর প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্ত্তার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়। অথচ আমরা যদি কেবল গীতার আধ্যাত্মিক অর্থ অন্বেষণ করি, আমাদের জাতীয়, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ম্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিব এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপী বিস্তার সঙ্কুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপরাঙ্মুখ দার্শনিক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, গীতায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ভাব খুঁজিয়া যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যাঁহারা এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী তাঁহারাই গীতার গূঢ়তম শিক্ষার অধিকারী। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন, গীতার পাত্র অর্জ্জুন ভক্ত ও কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটি মহৎ রাজনীতিক সংঘর্ষ গীতাপ্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে অর্জ্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির যন্ত্র ও নিমিত্ত রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার উদ্দেশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রই শিক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জ্জুনও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রাজনীতি ও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম। গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার বক্তা, পাত্র ও প্রচারের কারণ বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলিবে কেন?

মানব-সংসারের পাঁচটি মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিরকাল বর্ত্তমান—ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, জাতি, মানবসমষ্টি। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠার উপর ধর্ম্মও প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ভগবৎপাপ্তি। ভগবৎপ্রাপ্তির দুই মার্গ, বিদ্যাকে আয়ত্ত করা এবং অবিদ্যাকে আয়ত্ত করা, দুইটিই আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্দর্শনের উপায়। বিদ্যার মার্গ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি অবিদ্যাময় প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দ লাভ বা পরব্রহ্মে লয়। অবিদ্যার মার্গ সর্ব্বত্র আত্মা ও ভগবানকে দর্শন করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশ্বরকে বন্ধু, প্রভু, গুরু, পিতা, মাতা পুত্র, কন্যা, দাস, প্রেমিক, পতি, পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়া। শান্তি বিদ্যার উদ্দেশ্য, প্রেম অবিদ্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু ভগবানের প্রকৃতি বিদ্যাবিদ্যাময়ী। আমরা যদি কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি বিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব, যদি কেবল অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ করিব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুইটিকেই যিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণভাবে বাসু-

দেবকে লাভ করেন; তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত। যাঁহারা বিদ্যার শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে অবিদ্যাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। ঈশা উপনিষদে এই মহান্ সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"যাহারা অবিদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অজ্ঞানরূপ তমঃ মধ্যে প্রবেশ করেন। যে ধীর জ্ঞানিগণ আমাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিদ্যারও ফল আছে, অবিদ্যারও ফল আছে, সেই দুই ফল স্বতন্ত্র। যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।"

সমস্ত মানবজাতি অবিদ্যা ভোগ করিয়া বিদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাশ। যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাধক, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মযোগী, তাঁহারা এই মহৎ অভিযানের অগ্রগামী সৈন্য, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌঁছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, পথ প্রদর্শন করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি আসিয়া পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। অবিদ্যায় বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্ন্যাস আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূত, সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মানবজাতির গন্তব্যস্থানে গমনের নির্দ্দিষ্ট পথ। আত্মজ্ঞানের সংকীর্ণতা উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মকবোধ, স্বার্থবোধ, সেই সংকীর্ণতার মূল কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নতির প্রথম সোপান। মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়া থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক উন্নতি, ভোগ ও শক্তিবিকাশে রত থাকে। আমি দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, মনের ক্ষিপ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুল্লতা জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষ্যের এই প্রথম বা আসুরিক জ্ঞান। ইহারও প্রয়োজন আছে; দেহ, মন, প্রাণের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ করা উচিত। সেইজন্য আসুরিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম

অবস্থা; পশু, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্য্যন্ত মনুষ্যের মনে, কর্ম্মে, চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ভ করে, পরার্থে স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্ত্রীসন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, স্ত্রীসন্তানের সুখের জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রীসন্তানের সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণ-ত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে কুলকে বলি দেয়,—যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত রাজপুতজাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল,—জাতির সুখ, গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের সুখ, গৌরব, বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কুলকে, জাতিকে বলি দেয়,—মানবজাতির সুখ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রীসন্তানদের, কুলের, জাতির, সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। এইরূপ পরকে আত্মবৎ দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বলি দেওয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসূত খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা। য়ুরোপের নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন য়ুরোপীয়গণ ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিখিয়াছিলেন, আধুনিক য়ুরোপীয়গণ কুলকে জাতিতে ডুবাইতে শিখিয়াছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ডুবান এখন তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বলিয়া প্রচারিত; টলষ্টয় ইত্যাদি মনীষিগণ এবং সোশ্যালিষ্ট, এনার্কিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এই পর্য্যন্ত য়ুরোপের দৌড়। তাঁহারা অবিদ্যার উপাসক, প্রকৃত বিদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ভারতে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই মনীষিগণ আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহারা জানেন অবিদ্যার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত হয় না, আয়ত্ত হয় না। অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া আত্মবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; জাতির উৎকর্ষ করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই জ্ঞান আর্য্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্য্য শিক্ষার মূলে নিহিত। ব্যক্তিগত ত্যাগ আর্য্যের মজ্জাগত

অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা ন্যূনতা লক্ষিত হয়, সেই দোষ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণের ফল, যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে দেখি, সমাজের হিতে ব্যক্তির ও পরিবারের হিত ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজনীতিক জীবনবিকাশ আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বলিয়া গৃহীত ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, রাজপুতনার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, অবিদ্যাভয়ে আমরা সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই, সেই দোষে তমোভিভূত হইয়া জাতিধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে, দুঃখে, অজ্ঞানে পড়িলাম, অবিদ্যাও আয়ত্ত করিতে পারি নাই, বিদ্যাও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য

কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটি বড় বড় কুলের সমাবেশে একটি জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক-পূর্ব্বপুরুষের বংশধর, নয় ভিন্ন-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে এক বংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ করিত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল। তথাপি প্রাচীনকাল হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, কখনও পাঞ্চাল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা সার্ব্বভৌম রাজা হইয়া সাম্রাজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন কুলধর্ম্ম ও কুলের স্বাধীনতাপ্রিয়তা একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিঁকিতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেষ্টা, অসপত্ন সাম্রাজ্যের চেষ্টা পুণ্যকর্ম্ম এবং রাজার কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুরন্ত ক্ষত্রিয়ও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যস্থাপনে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পূর্ব্বেই এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি অধর্ম্ম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব ক্ষণস্থায়ী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাধা গর্ব্বিত ও তেজস্বী কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেকদিন হইতে ভারতের নেতৃস্থানীয় জাতি ছিল, ইংরাজিতে যাহাকে hegemony বলে অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব, তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন এই জাতির বল ও গর্ব্ব অক্ষুণ্ণভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব স্থাপিত হইবে না, শ্রীকৃষ্ণ ইহা বুঝিতে পারিলেন। অতএব তিনি কুরুজাতির ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই; যাহা ধর্ম্মতঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত করা অধর্ম্ম বলিয়া কুরুজাতির যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই যুধিষ্ঠিরকে ভাবী সম্রাটপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্ম্মিক সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রিয় যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, পাণ্ডবদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম সখা অর্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব্ব অধিকার দেখিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়, গুণ ও সামর্থ্যও দেখিতে হয়। রাজা যুধিষ্ঠির যদি অধার্ম্মিক, অত্যাচারী বা অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাত্রকে অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, ন্যায্য অধিকারে ও দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মে সম্রাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রতিভাবান অনেক বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, কিন্তু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ রাজ্যের অধিকারী হন না। রাজা ধর্ম্মরক্ষা করিবেন, প্রকৃতিরঞ্জন করিবেন, দেশরক্ষা করিবেন। প্রথম দুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধর্ম্মপুত্র, তিনি দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যকর্ম্মা, প্রজার অতীব প্রিয়। শেষোক্ত আবশ্যক গুণে তাঁহার যে ন্যূনতা ছিল, তাঁহার বীর ভ্রাতৃদ্বয় ভীম ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের তুল্য পরাক্রমী রাজা বা বীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিল না। অতএব জরাসন্ধবধে কন্টক উদ্ধার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা যুধিষ্ঠির দেশের প্রাচীন প্রণালী অনুসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধার্ম্মিক ও রাজনীতিবিদ্। দেশের ধর্ম্ম, দেশের প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কর্ম্ম করিয়া যদি তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ

হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্ম্মের হানি, সেই প্রণালীর বিরুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন কেন? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব করা দেশের অহিতকর হয়। সেই হেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু দেশের প্রাচীন প্রণালীর এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। যাঁহার সামরিক বলবৃদ্ধি আছে, তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামাত্র সেই মুকুট মস্তক হইতে আপনি খসিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল তাহার পিতার বা পিতামহের বশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বিজয়ীর পুত্রের বা পৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন? বংশগত অধিকার নহে, রাজসূয় যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্য্য সেই সাম্রাজ্যের মূল, যাঁহার অধিক বল-বীর্য্য তিনিই যজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন। অতএব সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব পাইবার কোন আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা hegemonyই হইতে পারে। এই প্রথার আর একটি দোষ এই ছিল যে, নবসম্রাটের অকস্মাৎ বলবৃদ্ধি ও প্রধানত্ব-লাভে দেশের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়ে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হয়; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের মধ্যে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। যুধিষ্ঠিরের নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ এই ঈর্ষায় তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈর্ষার উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিলেন। দ্বেষের প্রণালীর দোষ অল্পদিনেই ব্যক্ত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধার্ম্মিক তেমনই রাজনীতিবিদ্। তিনি কখনও সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্লবকারী। রাজা ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধর্ম্মকে বিকৃত করিতে কুন্ঠিত হন না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য্য করিবে, সেই নিশ্চয় অবিলম্বে পাপে পতিত হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশীলের মতে নূতন প্রয়াসই পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পতনে বুঝিলেন—বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্ব্বে জানিতেন,—যে, দ্বাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রক্ষণীয় নহে। অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির উচিত ভেদদণ্ড প্রধান রাজনীতি অনুসরণ করিয়া গর্ব্বিত দৃপ্ত ক্ষত্রিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদের পুরাতন সম-কক্ষ শত্রু পাঞ্চালজাতিকে কুরুধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, যত জাতি কুরুদের

বিদ্বেষে যুধিষ্ঠিরের প্রেমে বা ধর্ম্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। যে সন্ধির চেষ্টা হইল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পারে না, তথাপি ধর্ম্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে তিনি সন্ধির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযুদ্ধের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বিজেতা, দিব্যশক্তিপ্রণোদিত মহারথী অর্জ্জুন। অর্জ্জুন অস্ত্রত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক পরিশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত হইত না, দেশের ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোর কুফল ফলিত।

ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ

অর্জ্জুনের সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রয়োজিত, জাতির হিতচিন্তা স্নেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে। তিনি কুরু-বংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হিত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধর্ম্মের ভয়ে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ মহাপাপ, এ কথা সকলে জানে, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায় হওয়া, জাতীয় হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ অর্জ্জুন যদি শস্ত্রত্যাগ করেন, অধর্ম্মের জয় হইবে, দুর্য্যোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বীয় কুদৃষ্টান্তে কলুষিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুলসকল স্বার্থ, ঈর্ষা ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইবে, দেশকে একত্রিত, নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির সমাবেশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্ন ধর্ম্মপ্রণোদিত রাজশক্তি থাকিবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পড়িয়া প্লাবিত করিতে প্রস্তুত হইতেছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্য্য-সভ্যতা ধ্বংস করিয়া জগতে ভাবী হিতের আশা নির্ম্মূল করিত। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাশে দুই সহস্র বর্ষ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা তখনই আরম্ভ হইত।

লোকে বলে অর্জ্জুন যে অনিষ্টের ভয়ে এই আপত্তি করিয়াছিলেন, সত্য

সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ ভ্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ রাখিবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের দৃঢ় নিশ্চয় ছিল, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না। যখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়া মহৎ কর্ম্মে ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম্ম হয়। পরিবারের হিত জাতির হিতে, জগতের হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃস্নেহে, পারিবারিক ভালবাসার মোহে কোটি কোটি লোকের সর্ব্বনাশ করা চলে না, কোটি কোটি লোকের ভাবী সুখ বা দুঃখমোচন বিনষ্ট করা চলে না, তাহাতে ব্যক্তির ও কুলের নরকপ্রাপ্তি হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুধ্বংসে ক্ষতি না হইয়া লাভই হইয়াছে। যেমন পারিবারিক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর মায়া আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাসীর সঙ্গে বিরোধ করিব না, অনিষ্ট করিলেও, আততায়ী হইলেও, দেশের সর্ব্বনাশ করিলেও তিনি ভাই, স্নেহের পাত্র, নীরবে সহ্য করিব; আমাদের মধ্যে যে বৈষ্ণবী-মায়া-প্রসূত অধর্ম্ম ধর্ম্মের ভান করিয়া অনেকের বুদ্ধিভ্রংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন। বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্যকতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্ম্ম। কিন্তু যে দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাঁহার অনিষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য করিয়া সেই মাতৃহত্যা বা অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া আরও গুরুতর পাতক। শিবাজী যখন মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কর, ইহারা দেশভাই, নীরবে সহ্য কর, মোগল মহারাষ্ট্রদেশকে অধিকার করে করুক, মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়,—কথাটি কি নিতান্ত হাস্যকর বোধ হইত না? আমেরিকানরা যখন দাসত্বপ্রথা উঠাইবার জন্য দেশে বিরোধসৃষ্টি ও অন্তঃস্থ যুদ্ধসৃষ্টি করিয়া সহস্র সহস্র দেশভাইয়ের প্রাণসংহার করিলেন, তাঁহারা কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন? এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় হয়।

ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। অবশ্য যদি সেই কুলের রক্ষা জাতির হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্যা জটিল হয়। মহাভারতের যুগে ভারতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনুষ্যজাতির কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেইজন্যই ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা পুরাতন বিদ্যার আকর ছিলেন, পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধর্ম্ম পান্ডবদের দিকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঝিতেন যে কুলই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে ধর্ম্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন অসম্ভব। অর্জুনও সেই ভ্রমে পতিত হইলেন। এই যুগে জাতিই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধর্ম্ম, জাতিনাশ এই যুগের অমার্জনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যুগ আসিতেও পারে যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জগতের বড় বড় জ্ঞানী ও কর্ম্মী জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লবকারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল

প্রথম কৃপার আবেশে অর্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন, কেন না, এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিতচিন্তা সেইকালের ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির হিতচিন্তা আধুনিক মনুষ্যজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কুলনাশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশঙ্কা কি অমূলক ছিল? অনেকে বলে, অর্জুন যাহা ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। তেজস্বী ক্ষত্রিয়বংশের লোপে, ক্ষত্রতেজের হ্রাসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে। একজন বিখ্যাত বিদেশী মহিলা, যাঁহার শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনতশির, এই বলিতে কুন্ঠিত হন নাই যে ক্ষত্রিয়নাশে ইংরেজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথা বলেন, তাঁহারা বিষয়টি না তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্ত্বের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তত্ত্বং ম্লেচ্ছ-

বিদ্যা, অনার্য্য চিন্তাপ্রণালী-সম্ভূত। অনার্য্যগণ আসুরিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি বলিয়া জানেন।

জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, চতুর্ব্বর্ণের চতুর্ব্বিধ তেজই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরহিতচিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজরহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয়বংশের লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্ত্তব্য। ব্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দ্দান্ত উদ্দাম আসুরিক বলে পরিণত হইয়া প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। রোমান কবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসুরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজঃকে সৃষ্টি করিবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা করিবে সাত্ত্বিক কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃপ্রাদুর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শূদ্রের দাস হইবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধর্ম্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অপরপক্ষে আসুরিক বলের প্রভাবে ক্ষণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত্ত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শীঘ্র হয় দুর্ব্বলতা, গ্লানি ও শক্তিক্ষয় হইয়া দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের বৃদ্ধিতে জাতি অনুপযুক্ত হইয়া মহত্ত্বরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তর্বিরোধে, দুর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রুর সহজলভ্য শিকার হয়। ভারতের ও য়ুরোপের ইতিহাসে এই সকল পরিণামের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাভারতের সময়ে আসুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির হইয়াছিল। ভারতের এমন তেজস্বী পরাক্রমশালী প্রচন্ড ক্ষত্রিয়তেজের বিস্তার পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই ভীষণ বলের সদুপযোগ হইবার সম্ভাবনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অসুরপ্রকৃতির—অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটি না একটি নিশ্চয় ঘটিত।

ভারত অসময়ে ম্লেচ্ছের হাতে পড়িত। মনে রাখা উচিত পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ঘটিয়াছে, আড়াই হাজার বৎসর অতিবাহিত হইবার পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধুনদীর অপর পার পর্য্যন্ত পোঁছিতে পারিয়াছে। অতএব অর্জ্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য এতদিন ব্রহ্ম-তেজ-অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সঞ্চিত ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে, তাহার ভগ্নাংশই দুই সহস্র বর্ষ দেশকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাজ-সিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দিনই গুজরাটযুদ্ধে ও লক্ষ্মী-বাইয়ের চিতায় তাহার শেষ স্ফুলিঙ্গ নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক কার্য্যের সুফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, ভারতকে, জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার লুপ্ত ব্রহ্মতেজ জাগাইয়া গেলেন, সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষত্রতেজ সৃষ্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্ব্বাপিত করেন নাই, বরং আসুরিক বল বিনাশ করিয়া ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা করিয়াছেন। আসুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অন্তর্বিরোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্ব্বদা অনিষ্টকর নয়। অন্তর্বিরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশে ও রাজতন্ত্রস্থাপনে রোমের বিরাট সাম্রাজ্য অকাল-বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্বিরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড, অষ্টম হেন্‌রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রমশালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল।

কলিযুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হন নাই। ধর্ম্মরক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কলি-যুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অব-নতির অধিক ভয়, অধর্ম্মবৃদ্ধি স্বাভাবিক, এতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য অধর্ম্মনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আরম্ভ হইবার সময় হইয়াছিল, তাঁহারই আবির্ভাবে ভীত হইয়া কলি নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরীক্ষিত কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে

কলিযুগের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়করূপে ভগবানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা ও রক্ষা করিতে ভগবান কলির মুখে মানবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের ভিত্তি ও আশাস্থল। ভগবান কুরুক্ষেত্রে ভারতের রক্ষা করিয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নূতন জগতের লীলা-পদ্মে কালরূপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

মধুসূদন অর্জুনের কৃপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যকীর্ত্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান বলিলেন,—

"হে অর্জুন! এই সংকট সময়ে এই অনার্য্যের আদৃত স্বর্গপথরোধক অকীর্ত্তিকর মনের মলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত?

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

"হে পৃথাতনয়! হে শত্রুদমনে সমর্থ! ক্লীবত্ব আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ক্ষুদ্র মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর, ওঠ।"

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জুন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অন্তর্য্যামী তাঁহার প্রিয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ, ইহা তোমার স্বপক্ষের সঙ্কটকাল, এখন যদি তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপদ ও

বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠের মনে উঠিবার কথা নয়, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুর্ম্মতি? তোমার ভাব দুর্ব্বলতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। অনার্য্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, কিন্তু তাহা আর্য্যের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্ন হয় এবং ইহলোকে যশ ও কীর্ত্তির লোপ হয়। তাহার পরে আরও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিলেন। এই ভাব ক্লীবোচিত, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি কুন্তির পুত্র, তুমি এইরূপ কথা বল? এই প্রাণের দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদ্যোগী হও।

কৃপা ও দয়া

কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, পরের দুঃখ মোচন করি। যদি নিজের দুঃখ বা ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ সহ্য না করিতে পারিয়া সেই কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, কৃপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখমোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতের ভয়ে, প্রাণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্য্যে বিরত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখের চিরস্থায়িতায় সায় দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দুঃখী হইয়া দুঃখমোচনের যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কৃপা। দয়া বলবানের ধর্ম্ম কৃপা দুর্ব্বলের ধর্ম্ম। দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্ত্রীপুত্র, পিতামাতা, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া জগতের দুঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীব্র দয়ার আবেশে উন্মত্ত কালী জগতময় অসুর সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্তপ্লাবিত করিয়া সকলের দুঃখমোচন করিলেন। অর্জুন কৃপার আবেশে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই ভাব অনার্য্য-প্রশংসিত, অনার্য্য-আচরিত। আর্য্যশিক্ষা উদার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্য্য মোহে পড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম্ম বলিয়া উদার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য্য রাজসিকভাবে ভাবান্বিত হইয়া নিজের, প্রিয়জনের, নিজ পরিবার বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কৃপায় ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গর্ব্ব করে, কঠোরব্রতী আর্য্যকে নিষ্ঠুর ও অধার্ম্মিক বলে। অনার্য্য তামসিক মোহে মুগ্ধ

হইয়া অপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে ধর্ম্মনীতির ঊর্দ্ধতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্য্যের ভাব। কৃপা অনার্য্যের ভাব।

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুঃখ-লাঘবের জন্য শুশ্রূষায়, যত্নে ও পরহিতচেষ্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়া দেয়। যে কৃপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, কাঁদিতে বসিয়া ভাবে আমার কর্ত্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান—সে ক্লীব। এই ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্ব্বলতা। বিষাদ কখন ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই চিত্তমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও দুর্ব্বলভাব পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্ত্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধর্ম্মের রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তির মর্ম্ম।

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জুন বলিলেন,—

"হে মধুসূদন, হে শত্রুনাশকারী, আমি কিরূপে ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীয় গুরুজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রনিক্ষেপ করিব?

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

এই উদারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা ভোগ করা শ্রেয়ঃ। গুরুজনকে যদি বধ করি, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষয়ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ—কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোন্‌টি অধিক প্রার্থনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহাদিগকে বধ করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা থাকিবে না, তাঁহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যনায়ক।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ ॥

দীনতা দোষে আমার ক্ষাত্রিয়-স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেইজন্য তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি আমাকে কিসে শ্রেয়ঃ হইবে নিশ্চিতভাবে তাহা বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্‌।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥

কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ন রাজ্য এবং দেবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দেখি না।"

অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উদ্দেশ্য অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন, তিনি রাজনীতিক আপত্তি উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে যে আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি স্বীকার করি আমি ক্ষাত্রিয়, কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া মহৎ কার্য্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসূচক, অকীর্ত্তিজনক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরুজনকে হত্যা করিলে অধর্ম্মে পতিত হইয়া ধর্ম্ম, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বাঞ্জনীয়, সকলই যাইবে। কামনা তৃপ্ত হইবে, অর্থস্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে কয়দিন? অধর্ম্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্থায়ী, তাহার পর অনির্ব্বচনীয় দুর্গতি হয়। আর যখন ভোগ

করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ বা শান্তি হইবে ? প্রাণ বলে, ইহারা আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা করিলে আমি আর এই জন্মে সুখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যভোগ দাও বা স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যভোগ দাও, আমি কিন্তু শুনিব না। যে শোক আমাকে অভিভূত করিবে, তাহা দ্বারা সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে শিথিল ও অসমর্থ হইবে, তখন তুমি কি ভোগ করিবে ? আমার বিষম চিত্তের দীনতা উপস্থিত, মহান্ ক্ষাত্রিয়-স্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে। আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, শক্তি, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।"

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পন্থা। ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি ভগবানকে গুরু, প্রভু, সখা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণ্য, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার না করিয়া নিজ জ্ঞান, কর্ম্ম ও সাধনার সমস্ত ভার শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত যোগের অধিকারী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি গুরুহত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জুন সমসাময়িক সকল মহাপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন।

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাহার পরে গুরুর ভার গ্রহণ করিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তিখণ্ডন, তাহার পরে গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তিখণ্ডনের মধ্যে কয়েকটি অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না বুঝিলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকটি কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সঞ্জয় উবাচ

একমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন,—

পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া আবার সেই গোবিন্দকে বলিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব না" এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০॥

শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য করিয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে বিষণ্ণ অর্জুনকে এই উত্তর দিলেন।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥

শ্রীভগবান বলিলেন,—

"যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্ত্বকথা লইয়া বাদবিবাদ করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২॥

ইহাও নহে যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপতি-বৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহত্যাগের পরে আর থাকিব না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩॥

যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য কালের গতিতে হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমূঢ় হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥ ১৪॥

মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি সংস্কার সৃষ্ট হয়, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে, যায়, সেই সকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫॥

যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পর্শসকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত হন না, তৎসৃষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম হন।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬॥

যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ হয় না, তথাপি সৎ ও অসৎ দুইটির অন্ত হয়, ইহা তত্ত্বদর্শীগণ দর্শন করিয়াছেন।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

কিন্তু যাহা এইসমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়াছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধ্বংস করিতে পারে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮॥

নিত্য দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহের অন্ত আছে, আত্মা অসীম ও অনশ্বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

যিনি আত্মাকে হন্তা বলেন, এবং যিনি দেহনাশে আত্মাকে নিহত বলিয়া বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও হয় না।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না। সে জন্মরহিত, নিত্য, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥

যিনি ইহাকে নিত্য, অনশ্বর ও অক্ষয় বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কিরূপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান?

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২॥

যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ফেলিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই রূপেই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥

শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥

আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন।

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥

আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকাররহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥ ২৬॥

আর তুমি যদি মনে কর জীব বার বার জন্মায় ও মরে, তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭॥

যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য্য পরিণাম, তাহার জন্য শোক করা অনুচিত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮॥

সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার কোনও কারণ নাই।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯॥

আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য্য কিছু বলিয়া তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পারেন নাই।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল প্রাণীর জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।”

মৃত্যুর অসত্যতা

অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ,—অর্জ্জুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্য্যামী হাসিলেন—সেই ভ্রম শ্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসূত, জগতে অশুভ, দুঃখ ও দুর্ব্বলতা ভোগ ও সংযম দ্বারা ক্ষয় করিবার জন্য তিনি মানবকে এই মায়ার বশীভূত করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখ-দুঃখের অধীনত্ব, প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ, ইত্যাদি অজ্ঞান অর্জ্জুনের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূর করিয়া জগৎকে অশুভমুক্ত করিতে হইবে, সেই শুভ কার্য্যের অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অর্জ্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তাঁহাকেই গীতা প্রদর্শিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অর্জ্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কলিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ করিয়া আসিতেছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম দয়া আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্ম্ম শক্তি আনয়ন করিয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব করিতে আসিয়াছে। আজ কলিযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গীতা প্রদান করিতেছেন, যদি গ্রহণ করিতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সুনিশ্চিত ফল।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের ন্যায় পাপপুণ্য বিচার করিতেছ, জীবন-মরণের তত্ত্ব বলিতেছ, জাতির কল্যাণ অকল্যাণ কিসে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ। স্পষ্ট কথা বল, আমার হৃদয় দুর্ব্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্ত্তব্যপরাঙমুখ; জ্ঞানীর ভাষায় অজ্ঞের ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার দুর্ব্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যমাত্রই মরণ ও বিচ্ছেদ অতি ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্ত্তব্য কঠোর, স্বার্থসিদ্ধি মধুর বুঝিয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাঁদে, কিন্তু এই সকল বৃত্তিকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন না,—না মৃত ব্যক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই

কথা জানেন—মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চির-কাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গে, সুখ দুঃখের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোচুরি খেলা করিতে আসিয়াছি—প্রকৃতির বিশাল নাট্যগৃহে হাসি কান্নার অভিনয় করিতেছি, শত্রু মিত্র সাজিয়া যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন করিতেছি। এই যে অল্পকাল বাঁচিয়া থাকি, কাল, পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানি না, ইহা আমাদের অনন্তক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত মাত্র, ক্ষণিক খেলা, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা আছি, আমরা থাকিব—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর—প্রকৃতির ঈশ্বর আমরা, জীবন-মরণের কর্ত্তা ভগবানের অংশ, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জরা, তেমনই দেহান্তরপ্রাপ্তি,—মরণ নামমাত্র, নাম শুনিয়া আমরা ভয় পাই, দুঃখিত হই, বস্তু যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাপ্তিকে মরণ বলিয়া কাঁদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার-চাঁদ কোথায় গিয়াছে—আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞান-জনিত বলিত; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, বালকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। জ্ঞানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দেখিয়া তাহার ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিয়া দেখেন, কেননা দেহান্তরপ্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, স্থূলদেহে ও সূক্ষ্মদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না,—মৃত্যু ফাঁকা আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই।

মায়া

পুরুষ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ করিবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। আমরা দেখি রূপ, শুনি শব্দ, আঘ্রাণ করি গন্ধ, আস্বাদ করি রস, অনুভব করি স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কার। বুদ্ধির বিষয় চিন্তা। পঞ্চ তন্মাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির

পরস্পর সম্ভোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোষ্ণ, ক্ষুৎপিপাসা, হর্ষশোক ইত্যাদি দ্বন্দ্ব অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমাত্রই অশুদ্ধ, যে নিষ্কাম, সে শুদ্ধ। কামনায় রাগ ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, রাগদ্বেষের বশে পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয়, আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট হইয়াও আসক্তির অভ্যাস-দোষে তাহার ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কারণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয়।

সমভাব

শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আত্মার নিত্যতার উল্লেখ করিয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কারণ। এই স্পর্শসকল অনিত্য, তাহাদের আরম্ভও আছে, অন্তও আছে, অনিত্য বলিয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে যদি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃষ্ট হই, তাহার নাশে বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানে অনশ্বর আত্মার সনাতন ভাব ও অব্যয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্তুতে মত্ত হইয়া থাকি, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইরূপ অভিভূত না হইয়া যে বিষয়ের স্পর্শসকল সহ্য করিতে পারে, অর্থাৎ যে দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোষ্ণে, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলামঙ্গলে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ ও শোক অনুভব না করিয়া সমানভাবে প্রফুল্লচিত্তে হাস্যমুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হয়, অজ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,—অমৃতত্বায় কল্পতে।

সমতার গুণ

এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গীতোক্ত সাধনের প্রতিষ্ঠা। গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপে সমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকৃষ্ণ-প্রচা-

রিত শিক্ষার আর এক দিক ধরিয়া শান্তভোগের শিক্ষা, Epicureanism বা ভোগবাদ, প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ নৈতিক মত বলিয়া জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক য়ুরোপেও নব আকার ধারণ করিয়া Puritanism ও Paganism-এর চির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতা-বাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য্য। সমতায় আসক্তি মরে, রাগদ্বেষ প্রশমিত হয়, আসক্তি নাশে এবং রাগদ্বেষ প্রশমনে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসক্তিরহিত, অতএব শুদ্ধ। ইহাতেই সমতার গুণ যে সমতার সহিত আসক্তি ও রাগদ্বেষ এক আধারে থাকিতে পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ।

দুঃখজয়

গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাঁহারা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখ নিগ্রহ করিয়া, ছাপাইয়া, পদে দলিত করিয়া দুঃখজয়ের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গীতায় অন্যত্র বলিয়াছে, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, নিগ্রহে কি হইবে? দুঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় শুষ্ক, কঠোর, প্রেমশূন্য হইয়া যায়। দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিব না, যন্ত্রণাবোধ স্বীকার করিব না, "এ কিছু নহে" বলিয়া নীরবে সহ্য করিব, স্ত্রীর দুঃখ, সন্তানের দুঃখ, বন্ধুর দুঃখ, জাতির দুঃখ অবিচলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাব বলদৃপ্ত অসুরের তপস্যা—তাহার মহত্ত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে প্রয়োজনও আছে, কিন্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেষ বা চরম শিক্ষা নহে। দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা। শান্তভাবে সুখ-দুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ। প্রাণে সুখ-দুঃখের সঞ্চার বারণ করিব না, বুদ্ধি অবিচলিত করিয়া রাখিব। সমতার স্থান বুদ্ধি, চিত্ত নহে, প্রাণ নহে। বুদ্ধি সম হইলে, চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাদি প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায় না, মানুষ পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় পরব্রহ্মে লয়। প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া, প্রকৃতিবর্জ্জন অসম্ভব। যদি কোমলতা পরিত্যাগ করি, কঠোরতা হৃদয়কে অভিভূত করিবে,—যদি বাহিরে দুঃখের স্পন্দন নিষেধ করি, দুঃখ

ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং অলক্ষিতভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তপস্যায় শক্তি হইবে বটে কিন্তু এই জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখিলাম, পরজন্মে তাহা সর্ব্বরোধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট

গীতায় বিশ্বরূপদর্শন

"বন্দে মাতরম্" শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিপিনচন্দ্র পাল কথাপ্রসঙ্গে অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অসত্য, কবির কল্পনা মাত্র। আমরা এই কথার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। বিশ্বরূপদর্শন গীতার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা অদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দৃঢ়প্রতিষ্ঠা হয়। সেইজন্য অর্জুন অন্তর্য্যামীর অলক্ষিত প্রেরণায় বিশ্বরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইল, বুদ্ধি পূত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বে গীতায় যে জ্ঞান কথিত হইয়াছিল, সে সাধকের উপযোগী জ্ঞানের বহিরঙ্গ, সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সে জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে যদি কবির উপমা বলি, গীতার গাম্ভীর্য্য, সত্যতা ও গভীরতা নষ্ট হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনিক মত ও কবির কল্পনার সমাবেশে পরিণত হয়। বিশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, সত্য; অতি-প্রাকৃত সত্য নহে,—কেননা বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত বিশ্বরূপ অতি-প্রাকৃত হইতে পারে না। বিশ্বরূপ কারণজগতের সত্য: কারণ-জগতের রূপ দিব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত অর্জুন কারণ-জগতের বিশ্বরূপ দেখিলেন।

সাকার ও নিরাকার

যাঁহারা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা শাস্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া নির্গুণত্ব অস্বীকার করেন এবং

আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; সগুণ সাকার ব্রহ্মের উপাসক এই দুই জনেরই উপর খড়্গহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বলি। কেন না যাঁহারা সাকার ও নিরাকার দ্বিবিধ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য কল্পনা বলিয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নষ্ট করিবেন এবং অসীম ব্রহ্মকে সীমার অধীন করিবেন। যদি ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথা সত্য; কিন্তু যদি ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সাকারত্ব অস্বীকার করি, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান রূপের কর্ত্তা, স্রষ্টা, অধীশ্বর, তিনি কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; তিনি যেমন সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। ভগবান সর্ব্বশক্তিমান, স্থূলপ্রকৃতির নিয়ক বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে তাঁহাকে ধরিবার ভান করিয়া আমরা যদি বলি, তুমি যখন অনন্ত, আমি তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেষ্টা কর দেখি, তুমি পারিবে না, তুমি আমার অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডিনান্দ, এ কি হাস্য-কর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরহিত, নিরাকার ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন,—সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রহিয়াছেন, অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। কেন না, ভগবান দেশকালাতীত, অতর্কগম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার সামগ্রী. দেশ ও কালরূপ জাল ফেলিয়া সর্ব্বভূতকে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধরিতে পারিব না। যতবার তর্ক ও দার্শ-নিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্যসাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পার্শ্বে, দূরে, চারিদিকে, মৃদু মৃদু হাসিয়া বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত করে। যে বলে, আমি তাঁহাকে জানিতে পারিলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে, আমি জানি অথচ জানি না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

বিশ্বরূপ

যিনি শক্তির উপাসক, কর্ম্মযোগী, যন্ত্রীর যন্ত্র হইয়া ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে আদিষ্ট তাঁহার চক্ষে বিশ্বরূপদর্শন অতি প্রয়োজনীয়। বিশ্বরূপদর্শনের পূর্ব্বেও তিনি আদেশলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রুজু হইয়াছে, পাশ

হয় নাই। সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ম্মশিক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বিশ্বরূপদর্শনে কর্ম্মের আরম্ভ। বিশ্বরূপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে—যেমন সাধনা, যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশ্বরূপদর্শনে সাধক জগৎময় অপরূপ নারীরূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযুক্ত, সর্ব্বত্র সেই নিবিড়-তিমির-প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে, সর্ব্বত্র সেই রক্তাক্ত খড়্গের আভা নয়ন ঝলসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগৎময় সেই ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, অতিপ্রাকৃত উপলব্ধিকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা নহে। ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ, যাহা দিব্যচক্ষুতে দেখা হইয়াছে, তাহার অনতিরঞ্জিত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশ্বরূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছিলেন কালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশ্বরূপ। একই কথা। দিব্যচক্ষুতে দেখিলেন, বাহ্য-জ্ঞানহীন সমাধিতে নহে—যাহা দেখিলেন ব্যাসদেব তাহার অবিকল অনতি-রঞ্জিত বর্ণনা করিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য, জাগ্রত সত্য।

কারণজগতের রূপ

ভগবান-অধিষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—প্রাজ্ঞ-অধি-ষ্ঠিত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-অধিষ্ঠিত স্বপ্ন, বিরাট-অধিষ্ঠিত জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষুপ্তিতে কারণজগৎ, স্বপ্নে সূক্ষ্মজগৎ, জাগ্রতে স্থূলজগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত ও আমাদের দেশ-কালের অতীত, সূক্ষ্মে তাহা প্রতিভাসিত, স্থূলে আংশিকভাবে স্থূলজগতের নিয়ম অনুসারে অভিনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীবিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন, নচেৎ ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থূলে তাহার ছায়া মাত্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। বিশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থূলে দিব্যচক্ষুতে প্রকাশিত হয়।

দিব্যচক্ষু কি? কল্পনার চক্ষু নহে, কবির উপমা নহে। যোগলব্ধ দৃষ্টি তিনপ্রকার আছে—সূক্ষ্মদৃষ্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দিব্যচক্ষু। সূক্ষ্ম-

দিব্যচক্ষু

দৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানসিক মূর্ত্তি দেখি; বিজ্ঞানচক্ষুতে আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষ্মজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের প্রতিমূর্ত্তি ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দেখি; দিব্যচক্ষুতে কারণজগতের নামরূপ উপলব্ধি করি,—সমাধিতেও উপলব্ধি করি, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও দেখিতে পাই। যাহা স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা যদি ইন্দ্রিয়গোচর হয়, ইহাকে দিব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝিতে হয়। অর্জুন দিব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত বিশ্বরূপ দেখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্বরূপদর্শন স্থূলজগতের ইন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য, কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে।

ধর্ম্ম ও জাতীয়তা

জগন্নাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শক্তি সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগ-পূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সংকল্পের টানে, নিম্ন-প্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতদিন অহঙ্কারই কর্ত্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালানো অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।

সাধারণ মনুষ্যসমাজের তিনটি মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি, সুঠাম চাকচিক্যময় উজ্জ্বল অমল সুখকর, তাহাকে বহিয়া লইয়াছে বলবান সুশিক্ষিত অশ্ব, সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্নে ত্বরারহিত অমন্থর গতিতে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌঁছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয় রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিকযুগের পরে প্রাচীন আর্য্যদের সমাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টি বিলাসী কর্ম্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীম-বেগে বজ্রনির্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে শ্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সংকট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙ্গিয়া যায়, আবার কষ্টেসৃষ্টে মেরামতের পর সদর্প চলন। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, "এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য" চীৎকার করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহঙ্কার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেষ্ট ভোগ সুখ আছে, বিপদও অনিবার্য্য, ভগবানের নিকট পৌঁছা অসম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী।

তৃতীয়টি মলিন পুরান কচ্ছপগতি আধভাঙ্গা গরুরগাড়ী, টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সংকীর্ণ গ্রাম্যপথে; একজন ময়লা-কাপড়পরা ভুঁড়িসর্ব্বস্ব শ্লথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহংকার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জ্ঞান, সে পাঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক নির্দ্দেশ করে, মুখে এই বুলি "যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেষ্টা তাহাই খারাপ।" এই রথে ভগবানের নিকট না হৌক শূন্য ব্রহ্মে পৌঁছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহংকারের গরুর গাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদৃপ্ত মোটরের ছুটাছুটি, তখন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিপদ এই যে রথ বদলানোর সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহংকারের জ্ঞান শক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটি। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, "না থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই"—তাঁহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, "এদিকে ওদিকে মেরামত করিয়া লও না"—এই সহজ উপায়ে নাকি গরুর গাড়ী অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে;—ইঁহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে, "পুরাতন কালের সুন্দর রথটি ফিরিয়া আসুক"—তাঁহারা সেই অসাধ্য-সাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অনুরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সাত্ত্বিক অহংকারের নূতন রথ নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটিই আদর্শ, সেইটিই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গড়িয়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্দ্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্দ্ধদেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে পারগ নন। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত। দ্রষ্টা কর্ত্তা অনেক ভগবদ্‌বিভূতির অনেক চেষ্টায় আস্তে আস্তে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্যামীর অভিসন্ধি।

*

* *

জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মজ্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ প্রত্যয়ের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্ম্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধবস্তাধবস্তি—competition—যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়া-ঝাটি—এই কোলাহলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্ম্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি, আনন্দ-বৈচিত্র্যের জন্য—ভেদের নয়—পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভাস, আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিষ্ফল চেষ্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়—যেমন পাশ্চাত্যদেশে, নয় নির্ব্বাণোন্মুখ কর্ম্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে—যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগবত ভাবের আবেগে—যেমন প্রথম খৃষ্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেঁকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ-প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, ভাব নিজের খরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্ব্বাণপ্রিয়তার সংঘসৃষ্টি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কর্ম্মের সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জ্ঞান কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাটপুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God—আনন্দপুরী।

মানব সমাজের তিন ক্রম

মানুষের জ্ঞান ও শক্তি ক্রমবিকাশে নানারূপ ধারণ করে। সেই বিকাশের তিনটি অবস্থা দেখি—শরীর-প্রধান প্রাণনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত অবস্থা, বুদ্ধি-প্রধান উন্নত মধ্য অবস্থা, আত্মপ্রধান শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

শরীর-প্রধান প্রাণ-নিয়ন্ত্রিত মানুষ কাম ও অর্থের দাস। জানে সহজ স্বার্থ, সাধারণ ভাব ও প্রেরণা (instinct ও impulse) কামনায়-কামনায় অর্থে-অর্থে সংঘর্ষ উঠিয়া ঘটনা-পরম্পরায় সৃষ্ট যে ব্যবস্থা সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাকেই পছন্দ করে, এমন অল্প বা অনেক ব্যবস্থার সংহতিকে ধর্ম্ম বলে। রুচি-পরম্পরাগত, কুলগত বা সামাজিক আচার এইরূপ নিম্ন প্রাকৃত অবস্থার ধর্ম্ম। প্রাকৃত মানুষের মোক্ষের কল্পনা থাকে না, আত্মার সন্ধান সে পায় নাই। তাহার অবাধ শরীরিক ও প্রাণিক প্রবৃত্তির অবাধ লীলাক্ষেত্র একটা কল্পিত স্বর্গ। ওই দিকে তাহার চিন্তা উঠিতে পারে না। দেহপাতে স্বর্গগমনই তাহার মোক্ষ।

বুদ্ধি-প্রধান মানুষ কাম ও অর্থকে চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। কামের শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা কোথায়, জীবনের অনেক ভিন্নমুখী অর্থের মধ্যে কোন অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ও আদর্শ জীবনের স্বরূপ কি,—বুদ্ধি-চালিত কি নিয়মের সাহায্যে সে-স্বরূপ পরিস্ফুট, আদর্শ সিদ্ধ হয়, এই গবেষণায় সে ব্যাপৃত; এই স্বরূপ, আদর্শ নিয়মের কোন একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অনুশীলনকে বুদ্ধিমান সমাজের ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। মানস-জ্ঞানে আলোকিত উন্নত সমাজের নিয়ন্তা এইরূপ ধর্ম্মবুদ্ধিই।

আত্মপ্রধান মানুষ বুদ্ধি মন প্রাণ শরীরের অতীত গূঢ় আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, আত্মজ্ঞানেই জীবনের গতি প্রতিষ্ঠা করে,—মোক্ষ, আত্মপ্রাপ্তি, ভগবানকে লাভ করা জীবনের পরিণতি বুঝিয়া আত্মপ্রধান মানুষ সেই দিকে তাহার সমস্ত গতি পরিচালিত করিতে চায়, যে জীবন-প্রণালী ও আদর্শ অনুশীলন আত্ম-প্রাপ্তির উপযোগী, যাহাতে মানবীয় ক্রমবিকাশের চক্র সেই উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা তাহাকেই সে ধর্ম্ম বলে। শ্রেষ্ঠ সমাজ এইরূপ আদর্শ এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা চালিত।

প্রাণ-প্রধান হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে বুদ্ধির অতীত আত্মায়, ধাপে ধাপে ভাগবত পর্ব্বতে মনুষ্যযাত্রীর ঊর্দ্ধগামী নিয়মে আরোহণ।

* * *

কোনও এক সমাজে একমাত্র ধারা দৃষ্ট হয় না। প্রায় সকল সমাজেই এই তিন প্রকার মানুষ বাস করে, সেই মনুষ্য-সমষ্টির সমাজও মিশ্রজাতীয় হয়।

প্রাকৃত সমাজেও বুদ্ধিমান ও আত্মবান পুরুষ থাকে। তাঁহারা যদি বিরল, সংহতিরহিত বা অসিদ্ধ (হন), (তবে) সমাজের উপর বিশেষ কিছু ফল হয় না। যদি বহুসংখ্যককে সংহতিবদ্ধ করিয়া শক্তিমান সিদ্ধ (হন), তবেই প্রাকৃত সমাজকে মুষ্টিতে ধরিয়া কতকটা উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন। তবে প্রাকৃতজনের আধিক্যের দরুণ বুদ্ধিমানের বা আত্মবানের ধর্ম্ম প্রায়ই বিকৃত হয়, বুদ্ধির ধর্ম্ম convention-এ পরিণত হয়, আত্মজ্ঞানের ধর্ম্ম রুচি ও বাহ্যিক আচারের চাপে ক্লিষ্ট, প্লাবিত, প্রাণহীন, স্বলক্ষ্যভ্রষ্ট হয়,—এই পরিণাম সর্ব্বদা দেখি।

বুদ্ধির প্রাবল্য যখন হয়, (তখন) বুদ্ধি সমাজের নেতা সাজিয়া অবোধ রুচি ও আধারকে ভাঙ্গিয়া বদলাইয়া মানসজ্ঞানে আলোকিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা (করে) দেখি। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোক (enlightenment) সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রী এই চেষ্টার একটা রূপ মাত্র। সিদ্ধি অসম্ভব। আত্মজ্ঞানের অভাবে বুদ্ধিমানও প্রাণ-মন-শরীরের টানে নিজের আদর্শ নিজে বিকৃত করে। নিম্নপ্রকৃতির হাত এড়ান কঠিন। মধ্য অবস্থা, মধ্য অবস্থায় স্থায়িত্ব নয়—হয় নীচের দিকে পতন, নয় উচ্চের দিকে উঠা। এই দুই টানে বুদ্ধি দোদুল্যমান।

অহঙ্কার

আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে যে, আর্য্যধর্ম্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে। গর্ব্ব রাজসিক অহঙ্কারের একটা বিশেষ পরিণাম মাত্র, অথচ সাধারণতঃ অহঙ্কার শব্দের এই অর্থই বোঝা যায়; অহঙ্কার-ত্যাগের কথা বলিতে গর্ব্ব পরিত্যাগ বা রাজসিক অহঙ্কার বর্জনের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহঙ্কার। অহং-বুদ্ধি মানবের বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রীড়ায় তাহার তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়, সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার জ্ঞানপ্রধান ও সুখপ্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে, এই ভাবগুলি সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জ্ঞানীর অহং, নিষ্কাম কর্ম্মীর অহং সত্ত্বপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, সুখপ্রধান। রাজসিক অহঙ্কার কর্ম্মপ্রধান। আমি কর্ম্ম করিতেছি, আমি জয় করিতেছি, পরাজিত হইতেছি, চেষ্টা করিতেছি, আমারই কার্য্যসিদ্ধি, আমারই অসিদ্ধি, আমি বলবান, আমি সিদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এই সকল ভাব রজঃপ্রধান, কর্ম্মপ্রধান, প্রবৃত্তিজনক। তামসিক অহঙ্কার অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতায় পূর্ণ। আমি অধম, আমি নিরুপায়, আমি অলস, অক্ষম, হীন আমার কোনও আশা নাই, প্রকৃতিতে লীন হইতেছি, লীন হওয়াই আমার গতি, এই সকল ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃত্তি ও অপ্রকাশজনক। যাঁহারা তামসিক অহঙ্কারে ক্লিষ্ট, তাঁহাদের গর্ব্ব নাই, অথচ অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু সেই অহঙ্কার অধোগতি, নাশ ও শূন্যব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু। যেমন গর্ব্বের অহঙ্কার আছে তেমনই নম্রতার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহঙ্কার আছে, তেমনই দুর্ব্বলতার অহঙ্কারও আছে। যাঁহারা তামসিকভাবে গর্ব্বহীন, তাঁহারা অধম, দুর্ব্বল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত। তামসিক নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তামসিক সহিষ্ণুতার কোনও মূল্য নাই ও কোনও সুফল নাই। যিনি সর্ব্বত্র নারায়ণকে দর্শন করিয়া সকলের নিকট নম্র, সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান্ হন, তাঁহারই পুণ্য হয়। যিনি এই সকল অহঙ্কৃত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াকে অতিক্রম করেন, তাঁহার গর্ব্বও নাই, নম্রতাও নাই, ভগবানের জগন্ময়ী শক্তি তাঁহার মনপ্রাণরূপ আধারে যে ভাব দেন, তিনি তাহা লইয়া সন্তুষ্ট,

অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তামসিক অহঙ্কার সর্ব্বথা বর্জনীয়। রাজসিক অহঙ্কারকে জাগাইয়া সত্ত্ব-প্রসূত জ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্ম্মূল করা উন্নতির প্রথম সোপান। রাজসিক অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তির উপায় জ্ঞান শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তি বলেন না যে, আমি সুখী; তিনি বলেন, আমার প্রাণে সুখবিকাশ হইতেছে; তিনি বলেন না যে, আমি জ্ঞানী; তিনি বলেন, আমার মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার হইতেছে। তিনি জানেন যে, সেই সুখ ও জ্ঞান তাঁহার নহে, জগন্মাতার। অথচ সর্ব্বপ্রকার অনুভবের সহিত যখন আনন্দসম্ভোগের জন্য লিপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা ভক্তের ভাব অহঙ্কৃত। "আমার হইতেছে," যখন বলা হয় তখন অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ করা হইল না। গুণাতীত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অহঙ্কারজয়ী। তিনি জানেন, জীব সাক্ষী ও ভোক্তা, পুরুষোত্তম অনুমন্তা, প্রকৃতি কর্ত্তা, ইহার মধ্যে "আমি" নাই, সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের বিদ্যাবিদ্যাময়ী শক্তির লীলা। অহংজ্ঞান জীব-অধিষ্ঠিত প্রকৃতির মধ্যে একটি মায়াপ্রসূত ভাবমাত্র। এই অহংজ্ঞানরহিত ভাবের শেষ অবস্থা সচ্চিদানন্দে লয়। কিন্তু যিনি গুণাতীত হইয়াও পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা-মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি পুরুষোত্তম ও জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বলা যায় না। এই ভাব পরমেশ্বরেরও আছে, তাঁহার মধ্যে অজ্ঞান বা লিপ্ততা নাই, কিন্তু আনন্দময় অবস্থা স্বস্থ না হইয়া জগন্মুখী হয়। যাঁহার এই ভাব, তিনিই জীবন্মুক্ত। লয় রূপ মুক্তি দেহপাতে লাভ করা যায়। জীবন্মুক্তদশা দেহেই অনুভূত হয়।

পূর্ণতা

পূর্ণযোগের পন্থায় পদার্পণ করিয়াছ, পূর্ণযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহাই একবার তলাইয়া দেখিয়া অগ্রসর হও। সিদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইবার মহৎ আকাঙ্ক্ষা যাহার, তাহার দুটি কথা সম্যক জানা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ও পন্থা। পন্থার কথা পরে বলিব, আগে উদ্দেশ্যের পূর্ণ চিত্র তোমাদের চোখের সামনে পূর্ণভাবে দৃঢ়-রেখায় ফলান দরকার।

পূর্ণতার অর্থ কি? পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম্ম। মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতার প্রয়াসী, পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকাশ, আত্মার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় অগ্রসর। পূর্ণতা তাহার গন্তব্যস্থান, মানুষ ভগবানের একটি অর্দ্ধবিকশিত রূপ সেই জন্য সে ভাগবত পূর্ণতার পথিক। এই মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত-পদ্মের পূর্ণতা লুক্কায়িত, তাহা ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত ফুটাইতে সচেষ্ট। যোগ-অভ্যাসে যোগশক্তিতে সে মহাবেগে ত্বরিতবিকাশে ফুটিতে আরম্ভ করে। লোকে যাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলে, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সাধুতা, চিত্তবৃত্তির ললিত বিকাশ, চরিত্রের তেজ, প্রাণের বল, দৈহিক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির একটি খণ্ড-ধর্ম্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতীত বিজ্ঞান-শক্তির পূর্ণতায় প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে। কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, মানুষের মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক পুরুষত্ব তাহার একটি খণ্ড বিকাশ মাত্র। আর মনের বিকাশ বিজ্ঞানের একটি খণ্ড বাহ্যিক বিকৃত খেলা, মনের প্রকৃত পূর্ণতা আসে যখন সে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। অখণ্ড আত্মা জগৎকে বিজ্ঞান-শক্তিদ্বারা সৃজন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, বিজ্ঞানশক্তির দ্বারা খণ্ডকে অখণ্ডে তুলিয়া দেয়। আত্মা মানুষের মধ্যে মানসরূপ পর্দ্দায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, পর্দ্দা সরাইয়া আত্মার স্বরূপ দেখা দেয়। আত্মশক্তি মনে খর্ব্বীকৃত অর্দ্ধ-প্রকাশিত অর্দ্ধলুক্কায়িত রূপ ও ক্রীড়া অনুভব করে, বিজ্ঞানশক্তি যখন খোলে তখনই আত্মশক্তির পূর্ণ স্ফুরণ।

স্তবস্তোত্র

সাধক, সাধন ও সাধ্য এই তিন অঙ্গ লইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন সাধন আদিষ্ট হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সাধ্যও অনুসৃত হয়। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে নানা সাধ্য থাকিলেও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধকের সাধ্য এক—সেই সাধ্য আত্ম-তুষ্টি। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বুঝাইলেন যে, আত্মার জন্য সব, আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য সুখ, আত্মার জন্য দুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য মরণ। সেইজন্য আত্মা কি এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন আত্মজ্ঞান লইয়া এত বৃথা মাথা-ঘামান কেন ? এই সব সূক্ষ্মবিচারে সময় নষ্ট করা বাতুলতা, সংসারের প্রয়োজনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেষ্টা লইয়া থাক। কিন্তু সংসারের কি কি বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবজাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসাও আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান, তেমনই আমার সাধ্য। আমি যদি নিজ দেহকে আত্মা বুঝি, তাহার তুষ্টিসাধনার্থ আর-সকল বিচার ও বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বার্থপর নরপিশাচ হইয়া থাকিব। যদি স্ত্রীকেই আত্মবৎ দেখি, আত্মবৎ ভালবাসি, স্ত্রৈণ হইয়া ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, পরকে কষ্ট দিয়া তাহারই সুখ করিব, পরের অনিষ্ট করিয়া তাহারই ইষ্ট সিদ্ধ করিব। যদি দেশকেই আত্মবৎ দেখি, আমি খুব বড় একজন দেশ-হিতৈষী হইব, হয়ত ইতিহাসে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইব, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরদেশের অনিষ্ট, ধনলুণ্ঠন, স্বাধীনতা-অপহরণ করিতে পারি। যদি ভগবানকে আত্মা বুঝি অথবা আত্মবৎ ভালবাসি—সে একই কথা, কেননা প্রেম হইল চরমদৃষ্টি—আমি ভক্ত যোগী, নিষ্কাম কর্ম্মী হইয়া সাধা-রণ মনুষ্যের অপ্রাপ্য শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দ ভোগ করিতে পারি। যদি নির্গুণ পরব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানি, পরম শান্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতে পারি। যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ,—যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয়। মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছে, প্রথম ক্ষুদ্র, পরে অপেক্ষাকৃত বড়, শেষে সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য সাধন করিয়া গন্তব্যস্থান শ্রীহরির পরম-

ধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে। এক যুগ ছিল, মানবজাতি কেবল শরীর সাধন করিত, শরীর সাধন সেই কালের যুগধর্ম্ম, অন্যধর্ম্মকে খাট করিয়াও তখন শরীর সাধন করা শ্রেয়ঃ পথ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে শরীর, যে শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায় ও প্রতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লাভ করিত না। সেইরূপ আর-একযুগে স্ত্রী-পরিবার, আর-এক যুগে কুল, আর-এক যুগে—যেমন আধুনিক যুগে—জাতিই সাধ্য। সর্ব্বোচ্চ পরাৎপর সাধ্য পরমেশ্বর, ভগবান। ভগবানই সকলের প্রকৃত ও পরম আত্মা, অতএব প্রকৃত ও পরম সাধ্য। সেইজন্য গীতায় বলে, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, আমাকেই শরণ কর। ভগবানের মধ্যে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হয়, তাঁহাকে সাধন করিলে তিনিই আমাদের ভার লইয়া আমাদিগকে যন্ত্র করিয়া স্ত্রী, পরিবার, কুল, জাতি, মানবসমষ্টির পরম তুষ্টি ও পরম কল্যাণ সাধন করিবেন।

এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় নানা সাধনও হয়। ভগবৎ-সাধনের এক প্রধান উপায় স্তবস্তোত্র। স্তবস্তোত্র সকলের উপযোগী সাধন নহে। জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান ও সমাধি; কর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্মসমর্পণ শ্রেষ্ঠ উপায়; স্তবস্তোত্র ভক্তির অঙ্গ—শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে বটে, কেননা অহৈতুক প্রেম ভক্তির চরম উৎকর্ষ, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ স্তবস্তোত্র দ্বারা আয়ত্ত করিয়া তাহার পরে স্তবস্তোত্রের প্রয়োজনীয়তা অতিক্রম করিয়া সেই স্বরূপ ভোগে লীন হইয়া যায়; তথাপি এমন ভক্ত নাই যে স্তবস্তোত্র না করিয়া থাকিতে পারে, যখন আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না, তখনও স্তবস্তোত্রে প্রাণের উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠে। কেবল স্মরণ করিতে হয় যে সাধন সাধ্য নহে, আমার যে সাধন, সে পরের সাধন না-ও হইতে পারে। অনেক ভক্তের এই ধারণা দেখা যায় যে, যিনি ভগবানের স্তবস্তোত্র করেন না, স্তোত্র শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন না, তিনি ধার্ম্মিক নহেন। ইহা ভ্রান্তি ও সংকীর্ণতার লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোত্র করিতেন না, তথাপি কে বুদ্ধকে অধার্ম্মিক বলিবে? ভক্তিমার্গ সাধনের জন্য স্তবস্তোত্রের সৃষ্টি।

ভক্তও নানাপ্রকার, স্তবস্তোত্রেরও নানা প্রয়োগ হয়। আর্ত্ত ভক্ত দুঃখের সময়ে ভগবানের নিকট কাঁদিবার জন্য, সাহায্য প্রার্থনার জন্য, উদ্ধারের আশায় স্তবস্তোত্র করেন, অর্থার্থী ভক্ত কোনও অর্থসিদ্ধির আশায়, ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্য জয় কল্যাণ ভুক্তি মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সংকল্প করিয়া স্তবস্তোত্র করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেকবার ভাগবানকে প্রলোভন দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিতে যান, এক-একজন অভীষ্টসিদ্ধি না পাইয়া পরমেশ্বরের উপর ভারি চটিয়া উঠেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক ইত্যাদি গালাগালি দিয়া বলেন, আর ভগবানকে পূজা করিব না, মুখ দেখিব না, কিছুতেই মানিব না। অনেকে হতাশ হইয়া নাস্তিক হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগৎ দুঃখের রাজ্য,

অন্যায়-অত্যাচারের রাজ্য, ভগবান নাই। এই দুই প্রকার ভক্তি, অজ্ঞ ভক্তি, তাই বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। অবিদ্যা সাধন বিদ্যার প্রথম সোপান। বালকও অজ্ঞ, কিন্তু বালকের অজ্ঞতায় মাধুর্য্য আছে, বালকও মায়ের নিকট কাঁদিতে আসে, দুঃখের প্রতীকার চায়, নানারূপ সুখ ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছুটিয়া আসে, সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে চটিয়াও উঠে, দৌরাত্ম্য করে। জগজ্জননীও হাস্যমুখে অজ্ঞভক্তের সকল আব্দার ও দৌরাত্ম্য সহ্য করেন।

জিজ্ঞাসু ভক্ত কোন অর্থসিদ্ধির জন্য বা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্তবস্তোত্র করেন না, তাঁহার পক্ষে স্তবস্তোত্র শুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধির এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। জ্ঞানীভক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও থাকে না, কেননা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভাব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের জন্য স্তবস্তোত্রের প্রয়োজন। গীতায় বলে, এই চারিশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্ষণীয় নহে, সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান একাত্ম। ভগবান ভক্তের সাধ্য, অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্য, জ্ঞানী-ভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম—এই তিন সূত্রে আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে আবদ্ধ। কর্ম্ম আছে, সেই কর্ম্ম ভগবদ্দত্ত, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, প্রার্থনীয় কিছুই নাই; প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও অভিমানশূন্য—নিঃস্বার্থ, নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান শুষ্ক ও ভাবরহিত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও প্রেমে পূর্ণ। সাধ্য এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ।

আমাদের ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্ম্মরত। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিবিধ। ভগবান অন্তরাত্মায়, মানসিক জগতে, স্থূল জগতে—এই ত্রিধামে প্রকৃতিসৃষ্ট মহাশক্তিচালিত বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এই ত্রিধামে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার চেষ্টা সনাতন ধর্ম্মের ত্রিবিধত্ব। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিমার্গগামী। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—এই তিনটি স্বতন্ত্র বা মিলিত উপায়ে সেই যুক্তাবস্থা মানুষের সাধ্য। এই তিন উপায়ে আত্মশুদ্ধি করিয়া ভগবানের সহিত যোগলিপ্সা সনাতন ধর্ম্মের ত্রিমার্গগামী গতি। আমাদের ধর্ম্ম ত্রিকর্ম্মরত। মানুষের প্রধান বৃত্তি-সকলের মধ্যে তিনটি ঊর্ধ্বগামিনী, ব্রহ্মপ্রাপ্তি-বলদায়িনী—সত্য, প্রেম ও শক্তি। এই তিন বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। সত্য, প্রেম ও শক্তি দ্বারা ত্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্ম্মের ত্রিকর্ম্ম।

সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্ম্ম নিহিত; সনাতনকে অবলম্বন করিয়া পরিবর্ত্তনশীল মহান্, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধর্ম্ম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বভাবসৃষ্ট। সনাতন ধর্ম্ম জগতের সনাতন স্বভাব আশ্রিত, এই নানাবিধ ধর্ম্ম নানাবিধ আধারগত স্বভাবের ফল। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ইত্যাদি নানা ধর্ম্ম আছে। অনিত্য বলিয়া সেইগুলি উপেক্ষণীয় বা বর্জনীয় নয়, বরং এই অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম দ্বারাই সনাতন ধর্ম্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সনাতন ধর্ম্মের পুষ্টি না হইয়া অধর্ম্মই বর্দ্ধিত হয় এবং গীতায় যাহাকে সঙ্কর বলে, অর্থাৎ সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ক্রমোন্নতির বিপরীত গতি বসুন্ধরাকে পাপে ও অত্যাচারে দগ্ধ করে। যখন সেই পাপের ও অত্যাচারের অতিরিক্ত মাত্রায় মানুষের উন্নতির বিরোধিনী ধর্ম্মদলনী আসুরিক শক্তিসকল স্ফীত ও বলযুক্ত হইয়া স্বার্থ, ক্রূরতা ও অহঙ্কারে দশদিক আচ্ছন্ন করে, অনীশ্বর জগতে ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারার্ত্ত পৃথিবীর দুঃখলাঘব করিবার মানসে ভগবানের অবতার কিম্বা বিভূতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধর্ম্মপথ নিষ্কন্টক করেন।

সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ পালনের জন্য ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বর্ণা-

শ্রিত ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্মের আচরণ সর্ব্বদা রক্ষণীয়। কিন্তু এই নানাবিধ ধর্ম্মের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহান্ দুই রূপ আছে। মহান্ ধর্ম্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম জাতিধর্ম্মের অঙ্কাশ্রিত করিয়া আচরণ না করিলে জাতি ভাঙ্গিয়া যায় এবং জাতিধর্ম্ম লুপ্ত হইলে ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ক্ষেত্র ও সুযোগ নষ্ট হয়। ইহাও ধর্ম্মসঙ্কর—যে ধর্ম্মসঙ্করের প্রভাবে জাতি ও সঙ্করকারীগণ উভয়ে অতল নরকে নিমগ্ন হয়। জাতিকে আগে রক্ষা করিতে হয়, তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়। বর্ণাশ্রিত ধর্ম্মকেও যুগধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে না পারিলে মহান্ যুগধর্ম্মের প্রতিকূল গতিতে বর্ণাশ্রিত ধর্ম্ম চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া সমাজও চূর্ণ ও বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র সর্ব্বদা মহতের অংশ বা সহায়স্বরূপ, এই সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় ধর্ম্মসঙ্করসম্ভূত মহান্ অনিষ্ট ঘটে। ক্ষুদ্র ধর্ম্মে ও মহান্ ধর্ম্মে বিরোধ হইলে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহান্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার ও সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত জাতিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্য্যজাতির বংশধর, আর্য্যশিক্ষা ও আর্য্যনীতির অধিকারী। এই আর্য্যভাবই আমাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম আর্য্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্য্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্ম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য্য-শিক্ষাও নীতি-হারা। আমরা আর্য্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্রধর্ম্মরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। জাতিরক্ষার উপায় আর্য্যচরিত্রের পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ ও আর্য্যভাব-উদ্দীপক কর্ম্ম-প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্য্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মপ্রচার ঊষর ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।

জাতিধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যুগধর্ম্মসেবা সহজসাধ্য হইবে। এই যুগ শক্তি ও প্রেমের যুগ। যখন কলির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির অধীন ও সাহায্যকারী হইয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে, সত্য ও শক্তি প্রেমকে

আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেমবিকাশ করিতে সচেষ্ট হয়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মৈত্রী ও দয়া, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধর্ম্মের সাম্য ও ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধর্ম্মের ভক্তি ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলস্বরূপ। কলিযুগে সনাতন ধর্ম্ম মৈত্রী, কর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম গঠিত আর্য্য-ধর্ম্মে এই শক্তি-সকল প্রবিষ্ট ও বিকশিত হইয়া বিস্তার ও স্বপ্রবৃত্তিপূরণের পথ খুঁজিতেছে। শক্তিস্ফুরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্ম্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎ কর্ম্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নতির আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সংকোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপ শিক্ষাও বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।

যুগধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম সাধিত হইলে জগৎময় সনাতন ধর্ম্ম অবাধে প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বকাল হইতে যাহা বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উক্তি শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও কার্য্যে অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্য্যদেশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য্য ভাবের নবোত্থান।

মায়া

আমাদের পুরাতন দার্শনিকগণ যখন জগতের মূলতত্ত্বগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপঞ্চের মূলে একটি অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর অস্তিত্ব অবগত হইলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বহুকালের অনুসন্ধানে বাহ্যজগতেও এই অনশ্বর সর্ব্বব্যাপী একত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। তাঁহারা আকাশকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শনিকগণও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূল, তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পরিণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা যোগবলে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, স্থূল ভৌতিক প্রপঞ্চের পশ্চাতে একটি সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ আছে, এই প্রপঞ্চের মূল ভৌতিক তত্ত্ব সূক্ষ্ম আকাশ। এই আকাশও শেষ বস্তু নহে, তাঁহারা শেষ বস্তুকে প্রধান বলিতেন। প্রকৃতি বা জগন্ময়ী ক্রিয়াশক্তি তাঁহার সর্ব্বব্যাপী স্পন্দনে এই প্রধান সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতে কোটি কোটি অণু উৎপাদন করেন এবং এই অণুদ্বারা সূক্ষ্মভূত গঠিত হয়। প্রকৃতি বা ক্রিয়াশক্তি আপনার জন্য কিছুই করেন না; যাঁহার শক্তি, তাঁহারই তুষ্টিসম্পাদনার্থ এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও নানাবিধ গতি। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকৃতির ক্রীড়ায় অধ্যক্ষ ও সাক্ষী। পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্ম জগতের অনশ্বর অদ্বিতীয় মূল সত্য। মুখ্য মুখ্য উপনিষদে আর্য্য ঋষিগণের তত্ত্ব অনুসন্ধানে যে সত্যগুলির আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ এই ব্রহ্মবাদ ও পুরুষপ্রকৃতিবাদ প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্ত্বদর্শিগণ এই মূল সত্য-গুলি লইয়া নানা তর্ক ও বাদ-বিবাদে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী সৃষ্টি করি-লেন। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা বেদান্ত দর্শনের প্রবর্ত্তক; যাঁহারা প্রকৃতি-বাদের পক্ষপাতী তাঁহারা সাংখ্যদর্শন প্রচার করিলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র পথের পথিক হই-লেন। এইরূপ নানা পন্থা আবিষ্কৃত হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল চিন্তাপ্রণালীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপনিষ-দের সত্যগুলি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলেন। পুরাণকর্ত্তাগণও ব্যাসদেবের রচিত

পুরাণকে আধার করিয়া সেই সত্যগুলির নানা ব্যাখ্যা—উপন্যাস ও রূপকচ্ছলে সাধারণ লোকের নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে বিদ্বান-মণ্ডলীর বাদ-বিবাদ বন্ধ হইল না, তাঁহারা স্ব স্ব মত প্রকাশপূর্ব্বক বিশদরূপে দর্শন-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার সিদ্ধান্তসকল তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের ষড়দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্ত্তী চিন্তার ফল। শেষে শঙ্করাচার্য্য দেশময় বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব্ব ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পরে আর পাঁচটি দর্শন অল্পসংখ্যক বিদ্বানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহাদের আধিপত্য ও প্রভাব চিন্তা-জগৎ হইতে প্রায় তিরোহিত হইল। সর্ব্বজনসম্মত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া তিনটি মুখ্য শাখা ও অনেক গৌণ শাখা স্থাপিত হইল। জ্ঞানপ্রধান অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিপ্রধান বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বর্ত্তমান। জ্ঞানমার্গী, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মাদলক্ষণ বলিয়া উড়াইয়া দেন; ভক্ত, জ্ঞানমার্গীর তত্ত্বজ্ঞানস্পৃহাকে শুষ্ক তর্ক বলিয়া উপেক্ষা করেন। উভয় মতই ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ত্বজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া মুক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রমসঙ্কুল তামসিকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদ-দর্শিত ধর্ম্মপথে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রক্ষিত হইয়াছে।

যদি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজনসম্মত আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত আর্য্যজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত করিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্র চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের অনুযায়ী তর্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একদিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু অপরদিকের অপলাপ হয়। অদ্বৈতবাদীদিগের মায়াবাদ এইরূপ অপলাপের দৃষ্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানলিপ্সা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসপ্রিয়তা বর্দ্ধিত হয়, রজঃশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্য-প্রাপ্ত হয় এবং একদিকে জ্ঞানপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, সংসারে জাতবিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যা-বৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক অজ্ঞ অপ্রবৃত্তি-মুগ্ধ অকর্ম্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দ্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন সর্ব্বচেষ্টা নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিতে হয়। কিন্তু মানুষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্ণা ভিন্ন অনেক প্রবল ও উপযোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাতি টিকিতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক ও ব্যবহারিক

বলিয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া অধিকারভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তিনি সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কর্ম্মমার্গের তীব্র প্রতিবাদ করায় বিপরীত ফল ফলিয়াছে। শঙ্করের প্রভাবে সেই কর্ম্মমার্গ লুপ্তপ্রায় হইল, বৈদিক ক্রিয়াসকল তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে জগৎ মায়াসৃষ্ট, কর্ম্ম অজ্ঞানপ্রসূত ও মুক্তির বিরোধী, অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ ইত্যাদি তমঃ-প্রবর্ত্তক-মত এমন দৃঢ়রূপে বসিয়া গেল যে, রজঃশক্তির পুনঃ-প্রকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির রক্ষার্থে ভগবান পুরাণ ও তন্ত্রপ্রচারে মায়াবাদের প্রতিরোধ করিলেন। পুরাণে উপনিষদ-প্রসূত আর্য্যধর্ম্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ত্র শক্তি-উপাসনায় মুক্তি ও ভুক্তি রূপ দ্বিবিধ-ফল-প্রাপ্ত্যর্থে লোককে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা জাতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃপ্রসূত অনর্থের নিষেধ করিবার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধী উপদেশ দিয়াছেন।

মায়াবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর পরম মায়াবী, তাঁহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, ত্রৈগুণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। একই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অভিব্যক্তি মাত্র, স্বয়ং পরিণামশীল ও নশ্বর। যদি ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও বহুত্ব কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন, এই প্রশ্ন অনিবার্য্য। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্ম হইতেই ভেদ ও বহুত্ব প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা উৎপন্ন, ইহাই উপনিষদের উত্তর। সেই শক্তিকে কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ-অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়াছে। ইহাতে তার্কিকের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; কিরূপে এক বহু হয়, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একটি সহজ উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে পারে না, বহু মিথ্যা, ভেদ অলীক, সনাতন অদ্বিতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন। ইহাতেও গোল, মায়া আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসূত, কিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন হয়? শঙ্কর উত্তর করিলেন, মায়া কি তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্ব্বচনীয়, মায়া প্রসূত হয় না, মায়া চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এই তর্কে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মধ্যে আর-একটি সনাতন অনির্ব্বচনীয় বস্তু প্রতিষ্ঠিত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না।

শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যুক্তি উৎকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শক্তি, সচ্চিদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। আত্মার পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তি-ময়ী, সেই ইচ্ছা দ্বারাই এক হইতে বহু, অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরামার্থের হিসাবে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসূত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব, ব্রহ্মের দেশ-কালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মের মধ্যে প্রপঞ্চযুক্ত দেশকাল; ব্রহ্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসূত, ব্রহ্মের মধ্যে বর্ত্তমান, সনাতন অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মে আদ্যন্তবিশিষ্ট জগতের প্রতিষ্ঠা, তত্র ব্রহ্মের বিদ্যা-অবিদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। যেমন মানুষের মধ্যে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিবার শক্তি ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মের মধ্যেও বিদ্যা ও অবিদ্যা, সত্য ও অনৃত আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃষ্টি। যেমন মানুষের কল্পনা দেশকালের গতিতে সত্যে পরিণত হয়, তেমনই যাহাকে আমরা অনৃত বলি তাহা সর্ব্বথা অনৃত নহে, সত্যের অননুভূত দিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বং সত্যং; দেশকালাতীত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতীত নহি, আমরা জগৎ মিথ্যা বলিবার অধিকারী নহি। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা নহে, জগৎ সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইবার সময় আসিবে ও শক্তি উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বলিতে পারিব, অনধিকারী বলিলে মিথ্যাচার ও ধর্ম্মের বিপরীত গতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলা অপেক্ষা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ব্রহ্ম বলা উচিত। ইহাই উপনিষদের উপদেশ, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সত্যের উপর আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।

নিবৃত্তি

আমাদের দেশে ধর্ম্মের কখনও সংকীর্ণ ও জীবনের মহৎ কর্ম্মের বিরোধী ব্যাখ্যা মনীষিগণের মধ্যে গৃহীত হইত না। সমস্ত জীবনই ধর্ম্মক্ষেত্র, হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে কলুষিত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে। আমরা প্রায়ই এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সন্ন্যাস, ভক্তি ও সাত্ত্বিক ভাব ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ এই সংকীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। হিন্দুরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুই ভাগে জীবনের যত কার্য্য বিভক্ত করিতেন; পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত জীবনের অধিকাংশ ক্রিয়া ও বৃত্তির অনুশীলন, এই তিন ভাগ করা হইয়াছে। ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, সংকীর্ত্তন, গির্জায় পাদ্রীর বক্তৃতা শ্রবণ ইত্যাদি কর্ম্মকে ধর্ম্ম বা religion বলে, morality বা সৎকার্য্য ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, তাহা স্বতন্ত্র, তবে অনেকেই religion ও morality দুইটিই ধর্ম্মের গৌণ অঙ্গ বলিয়া স্বীকারও করেন। গির্জায় না যাওয়া, নাস্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং religion-এর নিন্দা বা তৎসম্বন্ধে ঔদাসীন্যকে অধর্ম্ম irreligion বলে, কুকার্য্য immorality বলে, পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে তাহাও অধর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু অধিকাংশ কর্ম্ম ও বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের বহির্ভূত। religion ও life, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম স্বতন্ত্র। আমাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্ম শব্দের এইরূপ বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্ন্যাসীর কথা, ভগবানের কথা, দেবদেবীর কথা, সংসারবর্জ্জনের কথাকে তাঁহারা ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন; কিন্তু আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, তাঁহারা বলেন, ইহা সংসারের কথা, ধর্ম্মের কথা নহে। তাঁহাদের মনে পাশ্চাত্য religion-এর ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ধর্ম্ম শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র religion-এর কথা মনে উদয় হয়, নিজের অজ্ঞাতসারেও সেই অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী কথায় এইরূপ বিদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমরা উদার ও সনাতন আর্য্যভাব ও শিক্ষা হইতে ভ্রষ্ট হই। সমস্ত জীবন ধর্ম্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম্ম। কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম্ম নহে, কর্ম্মও ধর্ম্ম। আমাদের সমস্ত সাহিত্য ব্যাপ্ত করিয়া এই মহতী শিক্ষা সনাতনভাবে রহিয়াছে —এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অনেকের ধারণা যে কর্ম্ম ধর্ম্মের অঙগ বটে, কিন্তু সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নহে; কেবল যেগুলি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, নিবৃত্তির অনুকূল, সেইগুলি এই নামের যোগ্য। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। যেমন সাত্ত্বিক-কর্ম্ম ধর্ম্ম, তেমনই রাজসিক-কর্ম্মও ধর্ম্ম। যেমন জীবের উপর দয়া করা ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মযুদ্ধে দেশের শত্রুকে হনন করাও ধর্ম্ম। যেমন পরোপকারার্থে নিজের সুখ, ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া ধর্ম্ম, তেমনই ধর্ম্মের সাধন শরীরকে উচিতভাবে রক্ষা করাও ধর্ম্ম। রাজনীতিও ধর্ম্ম, কাব্যরচনাও ধর্ম্ম, চিত্রলিখনও ধর্ম্ম, মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্ম্ম। যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, তাহাই ধর্ম্ম, সেই কর্ম্ম বড় হউক, ছোট হউক। ছোট-বড় আমরা হিসাব করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্ ভাবে মানুষ নিজ স্বভাবোচিত বা অদৃষ্টদত্ত কর্ম্ম আচরণ করে তিনি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। উচ্চ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই, যে-কর্ম্মই করি, তাহা তাঁহারই চরণে অর্পণ করা, যজ্ঞ বলিয়া করা, তাঁহার প্রকৃতিদ্বারা কৃত বলিয়া সমভাবে স্বীকার করা।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ।।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

অর্থাৎ যাহা দেখি, যাহা করি, যাহা ভাবি, সবই তাঁহার মধ্যে দেখা, তাঁহার চিন্তায় যেন বস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল শ্রেষ্ঠ পথ, সেই আবরণকে পাপ ও অধর্ম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ। মনের মধ্যে সকল কর্ম্মে বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কিছু না কামনা করিয়া কর্ম্মের স্রোতে যাহা পাই, তাহা ভোগ করিব, সকল কর্ম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় আচরণ এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত নিবৃত্তি। বুদ্ধিই নিবৃত্তির স্থান, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে প্রবৃত্তির ক্ষেত্র। বুদ্ধি প্রবৃত্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় বলিয়া যত গোল। বুদ্ধি নির্লিপ্তভাবে সাক্ষী ও ভগবানের prophet বা spokesman হইয়া থাকিবে, নিষ্কাম হইয়া তাঁহার অনুমোদিত প্রেরণা প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে জ্ঞাপন করিয়া দিবে; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় তদনুসারে স্ব স্ব কর্ম্ম করিবে। কর্ম্ম ত্যাগ অতি ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ। শরীরের নিবৃত্তি নিবৃত্তি নহে, নির্লিপ্ততাই প্রকৃত নিবৃত্তি।

প্রাকাম্য

১

লোকে যখন অষ্টসিদ্ধির কথা বলে, তখন অলৌকিক যোগপ্রাপ্ত কয়েকটি অপূর্ব্ব শক্তির কথা ভাবে। অবশ্য অষ্টসিদ্ধির পূর্ণবিকাশ যোগীরই হয়, কিন্তু এই শক্তিসকল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে, বরং আমরা যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বলি, তাহা অষ্টসিদ্ধির সমাবেশ।

অষ্টসিদ্ধির নাম মহিমা, লঘিমা, অণিমা, প্রাকাম্য, ব্যাপ্তি, ঐশ্বর্য্য, বশিতা ঈশিতা। এইগুলিই পরমেশ্বরের অষ্ট স্বভাবসিদ্ধ শক্তি বলিয়া পরিচিত! প্রাকাম্য ধর,—প্রাকাম্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া। বাস্তবিক, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকাম্যের অন্তর্গত। প্রাকাম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আঘ্রাণ লয়, ত্বকে স্পর্শ অনুভব করে, রসনায় রসাস্বাদন করে, মনে বাহ্যস্পর্শসকল আদায় করে। সাধারণ লোকে ভাবে, স্থূলে ইন্দ্রিয়েই জ্ঞানধারণের শক্তি; তত্ত্ববিদ্ জানে চোখ দেখে না, মন দেখে, কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আঘ্রাণ করে না, মন আঘ্রাণ করে। যাঁহারা আরও তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার জানেন মনও দেখে না, শোনে না, আঘ্রাণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আঘ্রাণ করে। জীবই জ্ঞাতা। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ। ভগবানের অষ্টসিদ্ধি জীবেরও অষ্টসিদ্ধি।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া মন ও পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃতির মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় ও ভোগের জন্য আয়ত্ত করে)। যখন জীবরূপ ঈশ্বর শরীরলাভ করেন বা শরীর হইতে নির্গমন করেন, তখন যেমন বায়ু গন্ধকে ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর হইতে ইন্দ্রিয়সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, আস্বাদ, ঘ্রাণ ও মন অধিষ্ঠান করিয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দৃষ্টি, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, মনন এইগুলিই প্রাকাম্যের ক্রিয়া। ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই

প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া প্রকৃতির বিকারে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সূক্ষ্মশরীরে বিকাশ করেন, স্থূলশরীর লাভ করিবার সময় এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া প্রবেশ করেন, মৃত্যুকালে এই ষড়িন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করেন। সূক্ষ্মদেহেই হউক, স্থূল-দেহেই হউক, তিনি এই ষড়িন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয়সকল ভোগ করেন।

কারণদেহে সম্পূর্ণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শক্তি সূক্ষ্মদেহে বিকাশলাভ করে, পরে স্থূলদেহে বিকশিত হয়। কিন্তু প্রথম হইতে স্থূলে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, জগতের ক্রমবিকাশে ইন্দ্রিয়সকল ক্রমে বিকশিত হয়, শেষে কয়েকটি পশুর মধ্যে মানুষের উপযোগী বিকাশ ও প্রাখর্য্য লাভ করে। মানুষের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় অল্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও বুদ্ধির বিকাশে অধিক শক্তি প্রয়োগ করি। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রাকাম্য বিকাশের শেষ অবস্থা নয়। যোগ দ্বারা সূক্ষ্মদেহে যত প্রাকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই যোগ-প্রাপ্ত প্রাকাম্য সিদ্ধি বলে।

২

পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তিরও ক্ষেত্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহত। জীব ঈশ্বর, ভগবানের অংশ, সূক্ষ্মদেহে ও স্থূলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক শক্তি বিকাশ করিতেছেন। স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ, মানুষ যতদিন স্থূলদেহের শক্তিদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততদিন বুদ্ধিবিকাশেই সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নচেৎ ইন্দ্রিয়ের প্রাখর্য্যে এবং মনের অভ্রান্ত ক্রিয়াতে—এক কথায়, প্রাকাম্য সিদ্ধিতে—পশুই উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাকে instinct বলে, তাহা এই প্রাকাম্য। পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যল্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক হইয়া সর্ব্বকার্য্যে কি অনুষ্ঠেয়, কি বর্জ্জনীয়, তাহা দেখাইয়া দিবে। পশুর মনই এই কার্য্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নিশ্চয়াত্মক, বুদ্ধিই নির্ণয় করে. মন কেবল সংস্কারসৃষ্টির যন্ত্র। আমরা যাহা দেখি, শুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কাররূপে পরিণত হয়, বুদ্ধি সেই সংস্কার-গুলি গ্রহণ করে, প্রত্যাখ্যান করে, উহা লইয়া চিন্তা সৃষ্টি করে। পশুর বুদ্ধি এই নির্ণয়কর্ম্মে অপারগ; বুদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বারা পশু বুঝে চিন্তা করে। মনের এক অদ্ভুত শক্তি আছে, অন্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারে, বিচার না করিয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া লয় এবং কর্ম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ

করিতে দেখি নাই, অথচ জানি যেন কে ঘরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে; কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশঙ্কিত হইয়া থাকি, কোথা হইতে যেন গুপ্ত ভয়ের কারণ রহিয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ বলিবার পূর্ব্বেও কি বলিবে, তাহা বুঝিয়া লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া হয়; এ সকলই মনের শক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবাধ ক্রিয়া। কিন্তু বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্ব কার্য্য করিতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াছি যে, এই ক্রিয়া, এই প্রাকাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। পশু এই প্রাকাম্যকে আশ্রয় না করিলে দুদিনে মরিয়া যাইবে। কি পথ্য, কি অপথ্য, কে মিত্র, কে শত্রু, কোথায় ভয়, কোথায় নিরাপদ, প্রাকাম্যই এই সকল জ্ঞান পশুকে দেয়। এই প্রাকাম্য দ্বারা কুকুর প্রভুর ভাষা না বুঝিয়াও তাহার কথার অর্থ বা মনের ভাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকাম্য দ্বারা ঘোড়া যে পথে একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে। এই সকল প্রাকাম্যক্রিয়া মনের। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিতেও পশু মানুষকে হারাইয়া দেয়। কোন্ মানুষ কুক্কুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ করিয়া একশত মাইল আর সকলের পথ ত্যাগ করিয়া একটি বিশিষ্ট জন্তুর পশ্চাৎ অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করিতে সমর্থ? বা পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায়? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা গুপ্ত শব্দকারীকে বাহির করিতে পারে? Telepathy বা দূরে চিন্তাগ্রহণ সিদ্ধির কথা বলিয়া কোন এক ইংরাজী সংবাদ-পত্র বলিয়াছে, telepathy মনের প্রক্রিয়া, পশুর সেই সিদ্ধি আছে, মানুষের নাই, অতএব telepathy বিকাশে মানুষের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। স্থূলবুদ্ধি বৃটনের উপযুক্ত তর্ক বটে! অবশ্য মানুষ বুদ্ধিবিকাশের জন্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে তাহার বুদ্ধিবিকাশ এত শীঘ্র হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখুঁত বুদ্ধিবিকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্বিকাশ করা মানবজাতির কর্ত্তব্য। ইহাতে বুদ্ধির বিচার্য্য জ্ঞান বিস্তারিত হইবে, মনুষ্যও মন এবং বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনুশীলনে অন্তর্নিহিত দেবত্বপ্রকাশের উপযুক্ত পাত্র হইবে। কোনও শক্তিবিকাশ অবনতির কারণ হইতে পারে না—কেবল শক্তির অবৈধ প্রয়োগে, মিথ্যা ব্যবহারে, অসামঞ্জস্য দোষে অবনতি সম্ভব। অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা যায় যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের পুনর্বিকাশ, প্রাকাম্যের বৃদ্ধি আরম্ভ করিবার দিন আসিয়াছে।

জাতীয়তা

পুরাতন ও নূতন

দেখিতেছি, আমরা দেশকে পুরাতনের কারাগার ভাঙিগয়া নূতনকে সৃষ্টি করিবার জন্যে ডাকিতেছি বলিয়া অনেকের মনে ক্রোধ, ভীতি ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা পুরাতনই সর্ব্বমঙ্গল, নিখুঁত সত্য, পূর্ণ জ্ঞান ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের অনিন্দনীয় সমৃদ্ধিশালী কোষাগার, পুরাতনের বলিয়াই ভারতের ভারতীয়ত্ব। আমরা যাহারা ভগবানে ও ভাগবত শক্তির উপর অটল শ্রদ্ধা রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত, অকুণ্ঠ সাহসে ভবিষ্যতের নূতন আকার গড়িতে ইচ্ছুক, আমরা না কি যৌবনের মদে উন্মত্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানে পুষ্ট উচ্ছৃঙ্খল পথের পথিক। পুরাতনকে সরাইয়া নূতনের আগমন সহজ করা অতীব বিপজ্জনক, সর্ব্বনাশের পন্থা। পুরাতন যদি যায়, তবে ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কোথায় রহিল? পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকা শ্রেয়, সেই চিরন্তন মোক্ষপরতা, সেই অতুল্য কল্যাণকর মায়াবাদ, সেই অচল স্থিতিশীলতা, যাহা ভারতের একমাত্র সম্পদ। বলিতে পারিতাম, ভারতের, বিশেষ বঙ্গদেশের যে এখনকার অবস্থা, তাহা হইতে কি অধিক সর্ব্বনাশ, কি অধিক শোচনীয় পরিণাম হইতে পারে, তাহা বোঝা বা কল্পনা করা দুষ্কর। পুরাতনকে আঁকড়িয়া যদি এই অবস্থাই হইল, তবে নূতনের চেষ্টা করায় দোষ কি? জাতির মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত, পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশেষ্ট থাকা ভাল না এই জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার জীবনের মুক্ত পথে বাহির হইবার প্রবৃত্তিই শ্রেয়স্কর? কিন্তু যাঁহারা আপত্তি করেন, তাঁহারা অনেকে পণ্ডিত চিন্তাশীল গণ্যমান্য ব্যক্তি, তাঁহাদের উক্তি এইরূপে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করি না। বরং আমাদের কথার তাৎপর্য্য, আমাদের এই আহ্বানের গভীরতর তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করি।

সনাতন ও পুরাতন এক নয়। সনাতন চিরকালের, যাহা ত্রিকালাতীত যাহা অবিনশ্বর, যাহা সকল রূপান্তরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে, যাহাকে দেখি বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং, তাহাই সনাতন। পুরাতন বলিয়া ভারতের ধর্ম্ম ও মূল চিন্তাকে আমরা সনাতন ধর্ম্ম সনাতন সত্য বলি না। আত্মানুভূতিলব্ধ সনাতন আত্মজ্ঞান বলিয়া সেই চিন্তা, সনাতন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই ধর্ম্ম সনাতন। পুরাতন সনাতনের একটি সময়োপযোগী রূপ মাত্র।

অতীতের সমস্যা

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ আধিপত্যে ভারতবাসী আর্য্যজ্ঞানে ও আর্য্যভাবে বঞ্চিত হইয়া শক্তিহীন, পরাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণপ্রিয় হইয়া রহিয়াছিল। এই তামসিক ভাব এখন অপনোদিত হইতেছে। কেন ইহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা একবার মীমাংসা করা আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তামসিক অজ্ঞান ও ঘোর রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র স্বার্থপর, কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ, দেশদ্রোহী, শক্তিমান অসুরপ্রকৃতি লোক জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই সময়ে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পাদনার্থ ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরাজ বণিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাপ-ভারার্ত্ত ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল। এই অদ্ভুত কান্ড ভাবিয়া এখনও জগৎ আশ্চর্য্যান্বিত। ইহার কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গুণের অশেষ প্রশংসা করিতেছে। ইংরাজ জাতির অনেক গুণ আছে; না থাকিলে তাঁহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী জাতি হইতে পারিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বলেন ভারতবাসীর নিকৃষ্টতা, ইংরাজের শ্রেষ্ঠতা, ভারতবাসীর পাপ, ইংরাজের পুণ্য এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে কয়েকটি ভ্রান্তধারণা উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানপূর্ব্বক নির্ভুল মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক। অতীতের সূক্ষ্ম সন্ধানের অভাবে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ দেশ যদি অসভ্য, দুর্ব্বল বা নির্ব্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ রাজপুত, মারাঠা, শিখ, পাঠান, মোগল প্রভৃতির বাসভূমি; তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী, চিন্তাশীল মান্দ্রাজী. রাজনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের সময়ে নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্, মাধোজী সিন্ধিয়ার ন্যায় যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি, হায়দর আলি ও রঞ্জিত সিংহের ন্যায় তেজস্বী ও প্রতিভাশালী রাজ্য-নির্ম্মাতা প্রদেশে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শৌর্য্যে, বুদ্ধিতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যূন

ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতীর মন্দির, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শক্তির ক্রীড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ প্রবল ও বর্দ্ধনশীল মুসলমান শত শত বর্ষব্যাপী প্রয়াসে অতিকষ্টে জয় করিয়া কখনও নির্ব্বিঘ্নে শাসন করিতে পারেন নাই, সেই দেশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিকের আধিপত্য স্বীকার করিল, শতবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের ছায়ায় নিশ্চেষ্টভাবে নিদ্রিত হইয়া পড়িল! বলিবে একতার অভাব এই পরিণামের কারণ। স্বীকার করিলাম, একতার অভাব আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা ছিল না। মহাভারতের সময়েও একতা ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত অশোকের সময়েও ছিল না মুসলমানের ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল না। একতার অভাব এই অদ্ভুত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। যদি বল, ইংরাজদিগের পুণ্য ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা সেই সময়ের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা কি বলিতে সাহসী হইবেন যে, সেইকালের ইংরাজ বণিক সেইকালের ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পুণ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যে ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রমুখ ইংরাজ বণিক ও দস্যুগণ ভারতভূমি জয় ও লুণ্ঠন করিয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা এবং জগতে অতুলনীয় দুর্গুণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, শক্তিমান অসুরগণের পুণ্যের কথা শ্রবণ করিলে হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর। সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভরিতা অসুরের গুণ, অসুরের পুণ্য, সেই পুণ্য ক্লাইভ প্রভৃতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাপ ভারতবাসীর পাপ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না। অতএব ইংরাজের পুণ্যে এই অঘটন ঘটন হয় নাই।

ইংরাজও অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন দেবে অসুরে যুদ্ধ হয় নাই, অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য অসুরে এমন কি মহৎ গুণ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্য্য ও বুদ্ধি সফল হইল, ভারতবাসী অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ শৌর্য্য ও বুদ্ধি বিফল হইল? প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আরসকল গুণে ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরহিত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের পূর্ণ বিকাশ ছিল; এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বৃত্তি। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের সেবাভাবে উন্মত্ত, সর্ব্বত্র স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্য্য স্বদেশকে ইষ্টদেবতা বলিয়া যজ্ঞরূপে সমর্পণ করিয়া দেশের হিতের জন্যই করেন, দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণের

সেই ভাব ছিল না; সেই ভাব কোন জড়বাদী পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ী-রূপে থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় করেন নাই, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ, নিজ নিজ আর্থিক লাভার্থ আসিয়াছিলেন; স্বদেশের হিতার্থে ভারত-বিজয় ও লুণ্ঠন করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধ্যর্থে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক না হইয়াও তাঁহারা জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ম্ম উৎকৃষ্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ—এই অভিমান; আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আমি বর্দ্ধিত—এই বিশ্বাস; কেবল আমার স্বার্থসাধন না করিয়া তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য, আবশ্যক হইলে সেই যুদ্ধে নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জন করা বীরের ধর্ম্ম, এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ। জাতীয় ভাব রাজসিক ভাব; স্বদেশপ্রেম সাত্ত্বিক। যিনি নিজের "অহং" দেশের "অহং"-এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, যিনি নিজের "অহং" সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের "অহং" বর্দ্ধিত করেন, তিনি জাতীয়ভাবাপন্ন। সেই কালের ভারত-বাসীরা জাতীয়ভাবশূন্য ছিলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতির হিত দেখি-তেন না, এমন কথা বলি না, কিন্তু জাতির ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইলে এই নানা ভেদসঙ্কুল দেশেও একতা সম্ভব; কেবল একতা চাই, একতা চাই বলিলে একতা সাধিত হয় না; ইহাই ইংরাজের ভারত-বিজয়ের প্রধান কারণ। অসুরে অসুরে সংঘর্ষ হইল, জাতীয়-ভাবাপন্ন একতাপ্রাপ্ত অসুরগণ জাতীয়ভাবশূন্য একতাশূন্য সমানগুণবিশিষ্ট অসুরগণকে পরাজিত করিলেন। বিধাতার এই নিয়ম, যিনি দক্ষ ও শক্তিমান তিনিই কুস্তিতে জয়ী হয়েন; যিনি ক্ষিপ্রগতি ও সহিষ্ণু তিনিই দৌড়ে প্রথম গন্তব্যস্থানে পৌঁছেন। সচ্চরিত্র বা পুণ্যবান বলিয়া কেহ দৌড়ে বা কুস্তিতে জয়ী হন নাই, উপযুক্ত শক্তি আবশ্যক। তেমনই জাতীয়ভাবের বিকাশে দুর্ব্বৃত্ত ও আসুরিক জাতিও সাম্রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের অভাবে সচ্চরিত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিত্র ও গুণ হারাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

রাজনীতির দিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু ইহার মধ্যে আরও গভীর সত্য নিহিত আছে। বলিয়াছি, তামসিক অজ্ঞান

ও রাজসিক প্রবৃত্তি ভারতে অতি প্রবল হইয়াছিল। এই অবস্থা পতনের অগ্রগামী অবস্থা। রজোগুণসেবায় রাজসিক শক্তির বিকাশ হয়; কিন্তু অমিশ্র রজঃ শীঘ্র তমোমুখী হয়, উদ্ধত শৃঙ্খলাবিহীন রাজসিক চেষ্টা অতি শীঘ্র অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শক্তিহীনতা, বিষাদ ও নিশ্চেষ্টতায় পরিণত হয়। সত্ত্বমুখী হইলেই রজঃশক্তি স্থায়ী হয়। সাত্ত্বিক ভাব যদিও না থাকে, সাত্ত্বিক আদর্শ আবশ্যক; সেই আদর্শ দ্বারা রজঃশক্তি শৃঙ্খলিত ও স্থায়ী-বলপ্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খলতা ইংরাজের এই দুই মহান সাত্ত্বিক আদর্শ চিরকাল ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়ী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরোপকারলিপ্সাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার বলে ইংলন্ড জাতীয় মহত্ত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। উপ-রন্তু য়ুরোপে যে জ্ঞানতৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞা-নিক আবিষ্কার করিয়াছেন, কণামাত্র জ্ঞানলাভের জন্য শত শত লোক প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্ত্বিক জ্ঞানতৃষ্ণা ইংরাজ জাতির মধ্যে বিকশিত ছিল। এই সাত্ত্বিক শক্তিতে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই সাত্ত্বিক শক্তি ক্ষীণ হইতেছে বলিয়া ইংরাজের প্রাধান্য, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে। সাত্ত্বিক লক্ষ্যভ্রষ্ট রজঃশক্তি তমোমুখী হইতেছে। অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান সাত্ত্বিক জাতি ছিলেন; সেই সাত্ত্বিক বলে জ্ঞানে, শৌর্য্যে, তেজে, বলে তাঁহারা অতুলনীয় হইয়াছিলেন এবং একতাবিহীন হইয়াও সহস্র বর্ষকাল ধরিয়া বিদেশীর আক্রমণের প্রতিরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোবৃদ্ধি ও সত্ত্বের হ্রাস হইতে লাগিল। মুসলমানের আগমনকালে জ্ঞানের বিস্তার সংকুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন রজঃপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের সিংহাসনে অধিরূঢ়; উত্তর ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ আত্মকলহের প্রাধান্য, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে তামসিকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজ্ঞান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় লইয়াছিল: সেই সত্ত্ববলে দক্ষিণ ভারত অনেকদিন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান ও গৌরব বর্দ্ধিত হইল, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, যোগশক্তি বিকাশ ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির স্থানে তামসিক পূজা ও সকাম রাজসিক ব্রতোদ্যাপনের বাহুল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লুপ্ত হইলে লোকে বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান ভাবিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ জাতিধর্ম্ম লোপেই গ্রীস, রোম, মিসর, আসিরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল; কিন্তু সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা করিত। শঙ্কর, রামা-নুজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতসিঞ্চন করিয়া মরণাহত ভারতে

প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ স্রোতের এমন বল ছিল যে সেই টানে উত্তমও অধমে পরিণত হইল; সাধারণ লোকে শঙ্করদত্ত জ্ঞান দ্বারা তামসিক ভাবের সমর্থন করিতে লাগিল, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ঘোর তামসিক নিশ্চেষ্টতার আশ্রয়ে পরিণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ মহারাষ্ট্রধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তির অপব্যবহার করিয়া শিবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিনষ্ট করিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্রোতের পূর্ণ বেগ দেখা গেল। সমাজ ও ধর্ম্ম তখন কয়েক-জন আধুনিক বিধানকর্ত্তার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যিক আচার ও ক্রিয়ার আড়ম্বর ধর্ম্ম নামে অভিহিত, আর্য্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়, আর্য্যচরিত্র বিনষ্টপ্রায়, সনাতন ধর্ম্ম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর অরণ্যবাসে ও ভক্তের হৃদয়ে লুকাইয়া রহিল। ভারত তখন ঘোর তমঃ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ প্রচণ্ড রাজসিক প্রবৃত্তি বাহ্যিক ধর্ম্মের আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, পরের অনিষ্ট পূর্ণবেগে সাধন করিতেছিল। দেশে শক্তির অভাব ছিল না, কিন্তু আর্য্যধর্ম্মলোপে, সত্ত্বলোপে সেই শক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্ম-বিনাশ করিল। শেষে ইংরাজের আসুরিক শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া ভারতের আসুরিক শক্তি শৃঙ্খলিত ও মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। ভারত পূর্ণ তমোভাবের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, অজ্ঞান, অকর্ম্মণ্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসম্মানবিসর্জন, দাসত্বপ্রিয়তা, পর-ধর্ম্মসেবা, পরের অনুকরণ, পরাশ্রয়ে আত্মোন্নতিচেষ্টা, বিষাদ, আত্মনিন্দা, ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাদি সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কোনটির অভাব ছিল? সেই শতাব্দীর সর্ব্ব চেষ্টা এই গুণসকলের প্রাবল্যে তমঃশক্তির চিহ্নে সর্ব্বত্র চিহ্নিত।

ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনার জ্বালাময়ী শক্তি জাতির শিরায় শিরায় খরতর-বেগে বহিতে লাগিল। তাহার সহিত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেগ যুবক-বৃন্দকে অভিভূত করিল। আমরা পাশ্চাত্যজাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা ভারতবাসী, আমরা আর্য্য। আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হয় না। সেই স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি মাতৃপূজা। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান বাহ্যেন্দ্রিয় অতিক্রম করিয়া প্রাণে আঘাত করিল, সেইদিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদান্ত-শিক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় অভ্যুত্থানের বীজস্বরূপ। যেমন জীব ভগবানের অংশ, তাহার শক্তি ভগ-বানের শক্তির অংশ, তেমনই এই সপ্তকোটি বঙ্গবাসী, এই ত্রিশকোটি ভারত-

বাসীর সমষ্টি সর্ব্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ত্রিশকোটির আশ্রয়, শক্তি-স্বরূপিণী, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারিণী ভারত-জননী ভগবানের একটি শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহবিশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃ-মূর্ত্তি জাতির মনে প্রাণে জাগরিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই কয় বর্ষের উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভগবানের বিধানে বিহিত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কি?

তাহার পরে আর্য্য জাতির সনাতন শক্তির পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্য্য-চরিত্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশক্তির পুনর্বিকাশ, তৃতীয় আর্য্যোচিত জ্ঞান-তৃষ্ণা ও কর্ম্মশক্তির দ্বারা নবযুগের আবশ্যক সামগ্রী সঞ্চয় এবং এই কয় বর্ষের উন্মাদিনী উত্তেজনা শৃঙ্খলিত ও স্থিরলক্ষ্যের অভিমুখী করিয়া মাতৃ-কার্য্যোদ্ধার। এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্ম্মান্বেষণ করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনা অতিক্রম করিয়া কিছুদিন শক্তি আনয়নের পথ খুঁজিয়া লউন। যে মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শক্তি চাই। তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের শিক্ষায় যে শক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শক্তি অঘনঘটনপটীয়সী। সেই শক্তি তোমাদের শরীরে অবতরণ করিতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শক্তিই মা। তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার উপায় শিখিয়া লও। মা তোমাদিগকে যন্ত্র করিয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য্য সম্পাদন করিবেন যে, জগৎ স্তম্ভিত হইবে। সেই শক্তির অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃ-মূর্ত্তি তোমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা করিতে শিখিয়াছ, এখন অন্তর্নিহিত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্য্যোদ্ধারের অন্য পন্থা নাই।

দেশ ও জাতীয়তা

দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম্ম নহে, আর-কিছুই নহে, কেবল দেশ। আর-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও আবশ্যক। অনেক পরস্পরবিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে, কখনও সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, কিন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, এক মা—একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান অজেয় জাতিই হইবে। ধর্ম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির-বিরোধ, মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাপি ভয় নাই, একদিন স্বদেশমূর্ত্তিধারিণী মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা ভ্রাতৃভাবে মাতৃপ্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতি-কষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে হয় বর্ত্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে। এই সকল বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা বিফল হয় না, তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ অতিক্রম করে, বিনষ্ট করে, জয়ী হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস করি, এক মায়ের পঞ্চভূতে মিশিয়া যাই, আন্তরিক সহস্র বিবাদ সত্ত্বেও মায়ের ডাকে মিলিত হইব। প্রাকৃতিক নিয়ম এই, সর্ব্ব দেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এক দেশে দুই জাতি চিরকাল থাকিতে পারে না, মিলিত হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যদি না থাকে, জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা এক হউক, তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্টি হইবেই। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, এক বৃহৎ জাতি হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ত্র জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক স্বতন্ত্রতাই সাম্রাজ্যনাশের কারণ হয়।

কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মানুষের বুদ্ধিতে বা বুদ্ধির অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক ক্রিয়া সত্বরে বা বিলম্বে ফলবতী হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার দিকে টান ছিল, স্রোত ছিল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের বিভিন্ন অংগ এক করিবার জন্য আকর্ষণ করিয়াছে। এই প্রাকৃতিক চেষ্টার কয়েকটি প্রধান অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদেশিক বিভিন্নতা, দ্বিতীয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, তৃতীয় মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও বিলম্ব, ভাষার বিভিন্নতা প্রাদেশিক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্তরায় ভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক সুবিধা দ্বারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সত্ত্বেও আকবর ভারতকে এক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঔরংজেব নিকৃষ্ট বুদ্ধির বশ না হইলে কালের মাহাত্ম্যে, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলণ্ডে কাথলিক ও প্রটেষ্টান্ট, তেমনই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া যাইত। তাঁহার বুদ্ধির দোষে বর্ত্তমান কূটবুদ্ধি কয়েকজন ইংরাজ রাজনীতিবিদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া আর নির্ব্বাপিত হইতে চায় না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতিবিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন করিতে অসমর্থ ছিলেন। রণজিৎ সিংহ বা গুরুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখিয়া পঞ্চনদমাতা দেখিয়াছিলেন। শিবাজী ও বাজীরাও ভারতমাতা না দেখিয়া হিন্দুর মাতা দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় রাজনীতিবিদ্‌ মহারাষ্ট্রমাতা দেখিয়াছিলেন। আমরাও বঙ্গভঙ্গের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম—সেই দর্শন অখণ্ড-দর্শন, অতএব বঙ্গদেশের ভাবী একতা ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারতমাতার অখণ্ডমূর্ত্তি এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা নানারূপ স্তবস্তোত্র করিতাম, সে কল্পিত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, ম্লেচ্ছবেশভূষাসজ্জিত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে প্রকৃত মা নিবিড় অস্পষ্ট আলোকে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাদের মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতেন। যেদিন অখণ্ডস্বরূপ মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মত্ত হইব, সেদিন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও উন্নতি সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব মাতৃভাষা রক্ষা করিয়াও সাধারণ ভাষারূপে হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ করিয়া সেই অন্তরায় বিনষ্ট করিব। হিন্দু-মুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন করিতে পারিব। মাতৃ-দর্শনের অভাবে সেই অন্তরায়-নাশের বলবতী ইচ্ছা নাই বলিয়া উপায় উদ্ভাবিত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চলিয়াছে। কিন্তু

অখণ্ডস্বরূপ চাই, যদি হিন্দুর মাতা, হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বলিয়া মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পতিত হইয়া জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশে বঞ্চিত হইব।

স্বাধীনতার অর্থ

স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্ত্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ—তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলে না। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য।

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বলিব। জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর দূত ও আজ্ঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতায়ই উন্নতির সম্ভাবনা। স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবনিয়ত জাতীয় কর্ম্ম ও চেষ্টা জাতীয় উন্নতির একমাত্র পন্থা। বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধর্ম্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত হইবে না। পরের স্বভাবনিয়ত পথে অগ্রসর হইবার শক্তি ও প্রেরণা আমাদের নাই, সেই পথে গেলে আমরা অতি সুন্দর রূপে পরের অনুকরণ করিতে পারি, পরের উন্নতির লক্ষণ ও বেশভূষায় অতি দক্ষতার সহিত স্বীয় অবনতি আচ্ছাদন করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষাকালে আমাদের পরধর্ম্মসেবাসম্ভূত দুর্ব্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও সেই অসারতার ফলে বিনাশ-প্রাপ্ত হইব। রোমের আধিপত্যভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিসকল অনেকদিন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দুর্দ্দশা হইল, প্রত্যেক পরাধীনতা-পরায়ণ জাতির সেই মনুষ্যত্ব-বিনাশ ও ঘোর দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। পরাধীনতার প্রধান ভিত্তি জাতির স্বধর্ম্মনাশ ও পরধর্ম্মসেবা,

যদি পরাধীন অবস্থায় স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে বা পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, পরাধীনতার বন্ধন আপনি খসিয়া পড়িবে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনা সর্ত্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে স্বাধীনতার আশা পোষণ করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক ও রাজদ্রোহসূচক যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহী, রাষ্ট্রবিপ্লবকারী ও সর্ব্ববিধ রাজনীতিক কার্য্যে বর্জনীয়। কিন্তু সেইরূপ আশা বা আদর্শের সহিত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ বলিয়া আসিতেছেন যে, এইরূপ স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপুরুষদেরও লক্ষ্য, এখনও ইংরাজ বিচারকগণ মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেছেন যে, স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্বাধীনতালাভের বৈধ চেষ্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্য। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহির্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কখন আবশ্যক মনে করেন না। আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যদি বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরূপ স্বরাজ সম্ভব হয় আপত্তি কি? আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না, দেশরক্ষার জন্য করিতেছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসীকে মিথ্যা রাজনীতি ও দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি।

সমাজের কথা

মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য সৃষ্ট। যাঁহারা মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে ভুলিয়া সমাজকে বড় করিয়া তোলেন, তাঁহারা অপদেবতার পূজা করেন। অযথা সমাজপূজা মনুষ্য-জীবনের কৃত্রিমতার লক্ষণ, স্বধর্ম্মের বিকৃতি।

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের। যাঁহারা সমাজের দাসত্ব, সমাজের বহু বাহ্যিক শৃঙ্খল মানুষের আত্মায় মনে প্রাণে চাপাইয়া তার অন্তঃস্থ ভগবানকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির প্রকৃত লক্ষ্য হারাইয়া বসিয়াছেন। এই অত্যাচারের দোষে অন্তর্নিহিত দেবতা জাগ্রত হয় না; শক্তিও ঘুমাইয়া পড়ে। দাসত্বই যদি করিতে হয়, সমাজের নয়, ভগবানের দাস্য স্বীকার কর। সেই দাস্যে মাধুর্য্যও আছে, উন্নতিও আছে। পরম আনন্দ, বন্ধনেও মুক্তি, অবাধ স্বাধীনতা তাহার চরম পরিণাম।

সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ উপায়, যন্ত্র। মানুষের আত্মপ্রণোদিত কর্ম্মস্ফুরিত ভগবৎগঠিত জ্ঞান ও শক্তি জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা, যাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি জীবনের আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান, এই শক্তি সমাজরূপ যন্ত্রকে চালাইবে, সমাজকে গঠন করিবে, প্রয়োজনমত বদলাইয়াও দিবে, ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। নিশ্চল স্থগিত সমাজ মৃত মনুষ্যত্বের কবর হইয়া যায়, জীবনের স্ফুরণে জ্ঞানশক্তির বিকাশে সমাজেরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। সমাজযন্ত্রের মধ্যে সহস্রবন্ধনে বহু মানুষকে ফেলিয়া পেষণ করায় নিশ্চলতা ও অবনতি অনিবার্য্য।

আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াছি। সমাজ কিন্তু তাহাতে বড় হয় না, ক্ষুদ্র নিশ্চল ও নিস্ফল হয়। আমরা সমাজকে উত্তরোত্তর উন্নতির উপায় নহে, নিগ্রহ ও বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাই আমাদের অবনতির, নিশ্চেষ্টতার, নিরুপায় দুর্ব্বলতার কারণ। মানুষকে বড় কর, অন্তঃস্থ ভগবান যেখানে গুপ্তভাবে বিরাজমান সেই মন্দিরের সিংহদ্বার খুলিয়া দাও, সমাজ আপনিই মহান, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, উন্মুক্ত উচ্চাশায় প্রয়াসের সফল ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে।

ভ্রাতৃত্ব

আধুনিক সভ্যতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ এই তিন তত্ত্ব—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে fraternity বলে, তাহা মৈত্রী নহে। মৈত্রী মনের ভাব; যে সর্ব্বভূতের কল্যাণ ইচ্ছা করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান, অহিংসাপরায়ণ সর্ব্বভূতহিতরত পুরুষকে "মিত্র" বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব। এইরূপ ভাব ব্যক্তির মানসিক সম্পত্তি,—ব্যক্তির জীবন ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে; এই ভাব রাজনীতিক বা সামাজিক শৃঙ্খলার মুখ্য বন্ধন হওয়া অসম্ভব। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের তিন তত্ত্ব ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক নিয়ম নহে, সমাজ ও দেশের ব্যবস্থার নবগঠনোপযোগী সূত্রত্রয়, সমাজের, দেশের বাহ্য অবস্থিতিতে প্রকাশোন্মুখ প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব। Fraternity-র অর্থ ভ্রাতৃত্ব।

ফরাসী বিপ্লবকারিগণ রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও সাম্য লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তাঁহাদের দৃঢ় লক্ষ্য ছিল না, ভ্রাতৃত্বের অভাব ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অসম্পূর্ণতার কারণ। সেই অপূর্ব্ব উত্থানে রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনীতিক সাম্যও কতক পরিমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধতিকে অধিকার করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে সামাজিক সাম্য অসম্ভব, ভ্রাতৃত্বের অভাবে য়ুরোপ সামাজিক সাম্যে বঞ্চিত হয়। এই তিন মূলতত্ত্বের পূর্ণবিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর করে; সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, সাম্যের অবর্ত্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃত্ব সাম্যের প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্বের অবর্ত্তমানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃভাব থাকিলে ভ্রাতৃত্ব। য়ুরোপে ভ্রাতৃভাব নাই, য়ুরোপে সাম্য ও স্বাধীনতা কলুষিত, অপ্রতিষ্ঠিত, অসম্পূর্ণ—এইজন্য য়ুরোপে গণ্ডগোল ও বিপ্লব নিত্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে য়ুরোপ সগর্ব্বে progress বা উন্নতি বলে।

য়ুরোপের যেটুকু ভ্রাতৃভাব, তাহা দেশ লইয়া—একদেশের লোক, হিতাহিত এক, একতায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে—এই জ্ঞান য়ুরোপের

একত্বের হেতু। তাহার বিরুদ্ধে আর-একটি জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে এই—আমরা সকলে মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানুষে ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, অনিষ্টকর; জাতীয়তা ভেদের কারণ, জাতীয়তা অজ্ঞান-প্রসূত, অনিষ্টকারক, অতএব জাতীয়তাকে বর্জন করিয়া মনুষ্যজাতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করি। বিশেষতঃ যে ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বরূপ মহান্ আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই দুই পরস্পরবিরোধী জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই দুই জ্ঞান ও ভাব পরস্পর-বিরোধী নহে। জাতীয়তাও সত্য, মানবজাতির একতাও সত্য, দুই সত্যের সামঞ্জস্যেই মানবজাতির কল্যাণ; যদি আমাদের বুদ্ধি এই সামঞ্জস্যে অসমর্থ হয়, অবিরোধী তত্ত্বের বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে ভ্রান্ত রাজসিক বুদ্ধি বলিতে হয়।

সাম্যশূন্য রাজনীতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর বিতৃষ্ণ হইয়া য়ুরোপ এখন সোশিয়ালিজমের দিকে ধাবিত হইয়াছে। দুই দল হইয়াছে, এনার্কিষ্ট ও সোশালিষ্ট। এনার্কিষ্ট বলে,—এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, গভর্ণমেন্ট বলিয়া বড় লোকের অত্যাচারের যন্ত্র স্থাপন করিয়া রাজনীতিক স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, অতএব সর্ব্বপ্রকার গভর্ণমেন্ট উঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপন কর। গভর্ণমেন্টের অবর্ত্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, বলবানের অত্যা-চার নিবারণ করিবে, এই আপত্তির উত্তরে এনার্কিষ্ট বলে, শিক্ষাবিস্তারে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার কর, জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা করিবে, যদি কেহ ভ্রাতৃভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যাচার করে, তাহাকে যে-সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে। সোশালিষ্ট এই কথা বলে না; সে বলে, গভর্ণমেন্ট থাকুক, গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সমাজ ও শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করি, এখন যে সমাজের ও শাসনতন্ত্রের দোষ আছে, সেই সকল সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সুখী, স্বাধীন ও ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে। সেইজন্য সোশালিষ্ট সমাজকে এক করিতে চায়; ব্যক্তি-গত সম্পত্তি না থাকিয়া সমাজের সম্পত্তি যদি থাকে—যেমন একান্নবর্ত্তী পরি-বারের সম্পত্তি, কোন ব্যক্তির নহে, পরিবারের, পরিবারই দেহ, ব্যক্তি সে দেহের অঙ্গ—তাহা হইলে সমাজে ভেদ থাকিবে না, সমাজ এক হইবে।

এনার্কিষ্টের ভুল, ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গভর্ণমেন্ট বিনাশের চেষ্টা। সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে শাসনতন্ত্র উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশুভাবের আধিপত্য। রাজা সমাজেব কেন্দ্র, শাসনতন্ত্র স্থাপনে মনুষ্য পশুভাব এড়াইতে সক্ষম। যখন সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে, তখন ভগবান, কোনও পার্থিব প্রতিনিধি নিযুক্ত

না করিয়া স্বয়ং পৃথিবীতে রাজ্য করিয়া সকলের হৃদয়ে সিংহাসন পাতিয়া বসিবেন, খৃষ্টানদের Reign of the Saints সাধুদের রাজ্য, আমাদের সত্যযুগ স্থাপিত হইবে। মনুষ্যজাতি এত উন্নতি লাভ করে নাই যে, এই অবস্থা শীঘ্র হইতে পারে, কেবল এই অবস্থার আংশিক উপলব্ধি সম্ভব।

সোশালিষ্টের ভুল ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সাম্যের উপর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। সাম্যহীন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব; ভ্রাতৃত্বহীন সাম্য টিকিতে পারে না, মতভেদে, কলহে, আধিপত্যের উদ্দাম লালসায় বিনষ্ট হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, পরে সম্পূর্ণ সাম্য।

ভ্রাতৃত্ব বাহিরের অবস্থা—ভ্রাতৃভাবে যদি থাকি, সকলের এক সম্পত্তি, এক হিত, এক চেষ্টা যদি থাকে, তাহাকেই ভ্রাতৃত্ব বলে। বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভ্রাতৃপ্রেমে ভ্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই ভ্রাতৃপ্রেমেরও প্রতিষ্ঠা চাই। আমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব একরূপ ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে প্রবেশ করিতে হয়, যেমন নিজের মাকে অতিক্রম করিয়া সকলে দেশভাইয়ের মাকে উপাসনা করি, সেইরূপ দেশকে অতিক্রম করিয়া জগজ্জননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। খণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছিতে হয়। কিন্তু যেমন ভারতজননীর উপাসনায় শরীরের জননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হই না, তেমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননীকে অতিক্রম করিয়াও বিস্মৃত হইব না। তিনিও কালী, তিনিও মা।

ধর্ম্মই ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা। সকল ধর্ম্ম এই কথা বলে যে, আমরা এক, ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, দ্বেষপ্রসূত। প্রেম সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষা। আমাদের ধর্ম্মও বলে, আমরা সকলে এক, ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানী সকলকে সমান চক্ষে দেখিবেন, সকলের মধ্যে এক আত্মা, সমভাবে প্রতিষ্ঠিত এক নারায়ণ দর্শন করিবেন। এই ভক্তিপূর্ণ সমতা হইতে বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্তব্যস্থান আমাদের শেষ অবস্থায় সর্ব্বব্যাপী হইবে, ইতিমধ্যে তাহার আংশিক উপলব্ধি করিতে হয়, অন্তরে, বাহিরে, পরিবারে, সমাজে, দেশে, সর্ব্বভূতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ, সম্প্রদায় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় করিয়া এই ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী আধার গঠন করিতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্য্যন্ত সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা আছে, আধার আছে, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন শক্তি চাই, যাহাতে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ, সেই আধার চিরস্থায়ী বা নিত্য নূতন হইয়া থাকে। ভগবান এখনও সেই শক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ

হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পাত্র হইবার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। কবে সেই দিন আসিবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহৃদয়ে সঞ্চারিত ও স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিবেন?

ভারতীয় চিত্রবিদ্যা

আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধর্ম্মের, সাহিত্যের শিল্পের অক্ষয় আকর ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে য়ুরোপের এই ধারণা ছিল যে, আমাদের যেমন উচ্চ দরের সাহিত্য ও শিল্প ছিল, ভারতীয় চিত্রবিদ্যা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং সে জঘন্য সৌন্দর্য্যহীন ছিল। আমরাও পাশ্চাত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে য়ুরোপীয় চশমা পরিয়া ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সিট্‌কাইয়া নিজ মার্জিত বুদ্ধি ও নির্দ্দোষ রুচির পরিচয় দিতাম। আমাদের ধনীদের গৃহ গ্রীক প্রতিমা ও ইংরাজী ছবির cast-এ বা নির্জীব অনুকরণে ভরিয়া গেল, সাধারণ লোকের বাড়ীর দেওয়াল জঘন্য তৈলচিত্রে শোভিত হইতে লাগিল। যে ভারতজাতির রুচি ও শিল্পচাতুর্য্য জগতে অপ্রতিম ছিল, বর্ণ ও রূপ গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি স্বভাবতঃ নির্ভুল ছিল, সেই জাতির চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী-মজুরের রুচি হইতে অধম হইল। রাজা রবিবর্ম্মা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিলেন। সম্প্রতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসীর চোখ খুলিতেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন যুবক লুপ্ত ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পরে আশা করা যায় যে, ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।

ভারতীয় চিত্রবিদ্যার উপর পাশ্চাত্যের বিতৃষ্ণার দুই কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ nature-এর অনুকরণ করিতে অক্ষম, ঠিক মানুষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, গাছের মত গাছ না আঁকিয়া বিকৃত মূর্ত্তি করেন, তাঁহাদের perspective নাই, ছবিগুলি চ্যাপ্টা ও অস্বাভাবিক বোধ হয়। দ্বিতীয় আপত্তি, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও সুন্দর রূপের নিতান্ত অভাব। শেষোক্ত আপত্তি আর য়ুরোপীয়ের মুখে শুনা যায় না। আমাদের পুরাতন বুদ্ধমূর্ত্তির অতুলনীয় শান্তভাব, আমাদের

পুরাতন দুর্গামূর্ত্তিতে অপার্থিব শক্তির প্রকাশ দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ প্রীত ও স্তম্ভিত হন। যাঁহারা বিলাতে শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় চিত্রকর য়ুরোপের perspective না জানুন, ভারতের যে perspective-এর নিয়ম তাহা অতি সুন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত। ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। বাহ্য আকৃতি এই আন্তরিক সত্যের আবরণ, ছদ্মবেশ— সেই ছদ্মবেশের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া আমরা যাহা ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব ভারতীয় চিত্রকরগণ ইচ্ছা করিয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রত্যেক অঙ্গে এবং চতুর্দ্দিকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানসিক ভাব বা ঘটনার অন্তর্গত সত্য প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় চিত্রের প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ।

পাশ্চাত্য বাহিরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্য-বস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্ম্মে, দর্শনে, সাহিত্যে—তেমনই চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ পায়।

হিরোবুমি ইতো

মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা আস্তে আস্তে ক্রম-বিকাশের স্রোতে অগ্রসর হইয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। যাঁহারা সেই ক্রম-বিকাশের সাহায্যার্থে বিভূতি-রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র। তাঁহারা যে জাতির মধ্যে ও যে যুগে অবতরণ করেন, সেই জাতির চরিত্র ও আচার, সেই যুগের ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ঐশ্বরিক শক্তি ও স্বভাবের বলে সাধারণ মানবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়া জগতের গতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইতিহাসে অমর নাম রাখিয়া স্বলোক গমন করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম ও চরিত্র মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার অতীত। প্রশংসা করি বা নিন্দা করি, তাঁহারা ভগবদ্-দত্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। মানবজাতির ভবিষ্যৎ সেই কার্য্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পথে খর-স্রোতে বহিবে। সীজার, নেপোলিয়ান, আকবর, শিবাজী এইরূপ বিভূতি। জাপানের মহাপুরুষ হিরোবুমি ইতোও এই শ্রেণীর ভুক্ত এবং যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের একজনও গুণে, প্রতিভায় বা কর্ম্মের মহত্ত্বে ও ভবিষ্যৎ ফলে ইতোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ইতোর ইতিহাসে ও জাপানের অভ্যুদয়ে, তাঁহার প্রধান স্থান সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সকলেই না-ও জানিতে পারেন যে, ইতোই সেই অভ্যুদয়ের ক্রম, উপায় ও উদ্দেশ্য উদ্ভাবনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একা এই মহৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, জাপানের আর সকল মহাপুরুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মাত্র। ইতোই জাপানের ঐক্য, জাপানের স্বাধীনতা, জাপানের বিদ্যাবল, সৈন্যবল, নৌসেনাবল, অর্থবল, বাণিজ্য, রাজনীতি মনে কল্পনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনিই ভাবী জাপানের সাম্রাজ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন। যাহা করিয়াছেন, প্রায়ই অন্তরালে দাঁড়াইয়া করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর কাইসার ওয়িলহেম বা বিলাতের লয়েড জর্জ যাহা করিতেছেন, যাহা ভাবিতেছেন, সমস্ত জগৎ তখনই তাহা জানিতে পারে। ইতো যাহা ভাবিতেছিলেন, যাহা করিতেছিলেন, কেহ জানিত না—যখন তাঁহার নিভৃত কল্পনা ও চেষ্টা ফলীভূত হইল, তখন জগৎ বিস্মিত হইয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই এতদিন প্রস্তুত হইতেছিল। অথচ কি প্রকাণ্ড কার্য্য, কি অদ্ভুত প্রতিভা সেই কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে! যদি ইতো নিজে মনের কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইতেন, সমস্ত জগৎ পদে পদে তাঁহাকে উন্মত্ত

অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসী ও ব্যর্থ-স্বপ্নের অনুরক্ত idealist বলিয়া উপহাস করিত। কে বিশ্বাস করিত যে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান দুর্লভ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ত্ত করিবে, ইংলন্ড জার্ম্মাণী ফ্রান্সের সমকক্ষ প্রবল পরাক্রমশালী জাতি হইবে, চীনকে পরাভূত করিবে, রুশকে পরাভূত করিবে, দূর দেশ-বিদেশে জাপানী বাণিজ্য, জাপানী চিত্রকলা, জাপানী বুদ্ধির প্রশংসা ও জাপানী সাহসের ভয় বিস্তার করিবে, কোরিয়া অধিকার করিবে, ফরমোজা অধিকার করিবে, বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিবে, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, জাতীয় শিক্ষার চরম উন্নতি সাধিত করিবে। নেপোলিয়ন বলিতেন, আমার শব্দকোষে অসাধ্য কথা বাদ দিয়াছি। ইতো সেই কথা বলেন নাই, কিন্তু কার্য্যে তাহাই করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের কার্য্য অপেক্ষা ইতোর কার্য্য বড়। এইরূপ মহাপুরুষ হত্যাকারীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে কাহারও দুঃখ করিবার নাই। যিনি জাপানের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, জাপানই যাঁহার চিন্তা, জাপানই যাঁহার উপাস্য দেবতা, তিনি জাপানের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বড় সুখের কথা, সৌভাগ্যের কথা, গৌরবের কথা। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। হিরোবুমি ইতোর ভাগ্যে এই দুইটি পরম ফল এক জীবন-বৃক্ষে পাওয়া গেল।

জাতীয় উত্থান

আমাদের প্রতিপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্ত্তমান মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আন্দোলনকে আরম্ভাবধি বিদ্বেষজাত বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহাদের অনুকরণপ্রিয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবৃত্তি করিতে ত্রুটি করেন না। আমরা ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উত্থানস্বরূপ আন্দোলন ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহাতে শক্তিব্যয় করিতেছি। এই আন্দোলন যদি বিদ্বেষজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কখনও প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা পর্যন্ত ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধর্ম্মের বহির্ভূত; বিদ্বেষ ও ঘৃণা জগতের ক্রমোন্নতির বিকাশে বর্জনীয় হয়, অতএব যাঁহারা স্বয়ং এই বৃত্তিগুলি পোষণ করেন কিম্বা জাতির মধ্যে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা অজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে কখনও যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যখন এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রতিঘাতস্বরূপ বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসূত হওয়া অনিবার্য্য। এই রূপ পাপসৃষ্টির জন্য বঙ্গদেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ-পত্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী ব্যক্তিবিশেষের আচরণ দায়ী। সংবাদপত্রে প্রতিদিন উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষসূচক তিরস্কার এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগালি অপমান ও প্রহার পর্য্যন্ত অনেকদিন সহ্য করিয়া শেষে এই উপদ্রব-সহিষ্ণু ও ধীরপ্রকৃতি ভারতবাসীরও অসহ্য হয় এবং গালির বদলে গালি ও প্রহারের বদলে প্রহারের প্রতিদান আরম্ভ হয়। অনেক ইংরাজও তাঁহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশুভদৃষ্টির দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপরন্তু রাজপুরুষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন হইতে প্রজার স্বার্থবিরোধী, অসন্তোষজনক ও মর্ম্মবেদনাদায়ক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রবণ, স্বার্থে আঘাত পড়ায়, অপ্রিয় আচরণে কিম্বা প্রাণের প্রিয় বস্তু বা ভাবের উপর দৌরাত্ম্য করায় সেই সর্ব্বপ্রাণী-নিহিত ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ক্রোধের আতিশয্যে ও অন্ধগতিতে বিদ্বেষ ও বিদ্বেষজাত আচরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহুকাল হইতে ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে প্রজার কোনও প্রকৃত অধিকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে

অসন্তোষ অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কর্জনের শাসন-সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করিয়া বঙ্গভঙ্গজাত অসহ্য মর্ম্ম-বেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়া রাজপুরুষদিগের নিগ্রহ-নীতির ফলে বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার করি যে, অনেকে ক্রোধে অধীর হইয়া সেই বিদ্বেষাগ্নিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন। ভগবানের লীলা অতি বিচিত্র, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে জগতের ক্রমোন্নতি পরিচালিত অথচ অশুভ প্রায়ই শুভের সহায়তা করে, ভগবানের অভীপ্সিত মঙ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভ যে বিদ্বেষ সৃষ্টি, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ-অভিভূত ভারতবাসীর মধ্যে রাজসিক শক্তি জাগরণের উপযোগী উৎকট রাজসিক প্রেরণা উৎপন্ন হইল। তাই বলিয়া আমরা অশুভের বা অশুভকারীর প্রশংসা করিতে পারি না। যিনি রাজসিক অহঙ্কারের বশে অশুভ কার্য্য করেন, তাঁহার কার্য্য দ্বারা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট শুভ ফলের সহায়তা হয় বলিয়া তাঁহার দায়িত্ব ও ফল-ভোগরূপ বন্ধন কিছুমাত্র ঘুচে না। যাঁহারা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত; বিদ্বেষ-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-প্রচারে তাহার দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মজাত পাপফল ভোগ না হইয়া ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও অমিশ্র পুণ্যের সৃষ্টি হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা-জনক কথা লিখিব না, অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিব। জাতিতে জাতিতে স্বার্থবিরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্ত্তমান অবস্থার অপরি-হার্য্য অঙ্গস্বরূপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে ও স্বজাতি-স্বার্থসাধনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। অত্যাচার বা অন্যায় কার্য্য ঘটিলে আমরা তাহার তীব্র উল্লেখে এবং জাতীয় শক্তির সংঘাত ও সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় ও বৈধ প্রতিরোধ দ্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধর্ম্মনীতিতে অধিকারী। কোনও ব্যক্তিবিশেষ, তিনি রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন, অমঙ্গলজনক অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্রসমাজোচিত আচারের অবিরোধী বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া সেই কার্য্য বা সেই মতের প্রতিবাদ ও খণ্ডনে অধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যক্তির উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ বা সৃজনে আমরা অধিকারী নহি। অতীতে যদি এইরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে, সে অতীতের কথা; ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদপত্র ও কার্য্যক্ষম যুবক-বৃন্দকে এই উপদেশ দিতেছি।

আর্য্যজ্ঞান, আর্য্যশিক্ষা, আর্য্য-আদর্শ জড়জ্ঞানবাদী রাজসিক ভোগ-পরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। য়ুরোপীয়-দের মতে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে কর্ম্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে

বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কর্ম্ম করিতে হয়, নচেৎ কামনাহীন সন্ন্যাসী হইয়া বসিতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আর্য্যগণ যেদিন উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিয়া পঞ্চনদভূমি অধিকার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে এই সনাতন শিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সনাতন প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, মনুষ্য পশু কীট পতঙ্গে, সাধু পাপীতে, শত্রু মিত্রে, দেব অসুরে প্রকাশ হইয়া জগৎময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব। মিত্র শত্রু সকলই ক্রীড়ার সহচর, দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আর্য্য মিত্রকে রক্ষা করেন, শত্রুকে দমন করেন, কিন্তু তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব ফলে নারায়ণকে দর্শন করিয়া ইষ্টানিষ্টে, শত্রুমিত্রে, সুখ-দুঃখে, পাপপুণ্যে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন। ইহার এই অর্থ নহে যে সর্ব্ব পরিণাম তাঁহার ইষ্ট, সর্ব্ব জন তাঁহার মিত্র, সর্ব্ব ঘটনা তাঁহার সুখ-দায়ক, সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহার আচরণীয়, সর্ব্ব ফল তাঁহার বাঞ্ছনীয়। সম্পূর্ণ যোগপ্রাপ্তি না হইলে দ্বন্দ্ব ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপ্য, কিন্তু আর্য্য-শিক্ষা সাধারণ আর্য্যের সম্পত্তি। আর্য্য ইষ্টসাধনে ও অনিষ্টবর্জ্জনে সচেষ্ট হয়েন কিন্তু ইষ্টলাভে জয়মদে মত্ত হন না, অনিষ্টসম্পাদনে ভীত হন না। মিত্রের সাহায্য, শত্রুর পরাজয় তাঁহার চেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, কিন্তু তিনি শত্রুকে বিদ্বেষ ও মিত্রকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বজন-সংহারও করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। সুখ তাঁহার প্রিয়, দুঃখ তাঁহার অপ্রিয় হয়, কিন্তু তিনি সুখে অধীর হন না, দুঃখেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রীতভাব অবিচলিত হইয়া থাকে। তিনি পাপবর্জ্জন ও পুণ্যসঞ্চয় করেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম্মে গর্ব্বিত হয়েন না, পাপে পতিত হইলে দুর্ব্বল বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পঙ্ক হইতে উঠিয়া কর্দ্দমাক্ত শরীরকে মুছিয়া পরিষ্কার ও শুদ্ধ করিয়া পুনরায় আত্মোন্নতিতে সচেষ্ট হয়েন। আর্য্য কর্ম্মসিদ্ধির জন্য বিপুল প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও বিরত হন না, কিন্তু অসিদ্ধিতে দুঃখিত, বিমর্ষ বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে অধর্ম্ম। অবশ্য যখন কেহ যোগারূঢ় হইয়া গুণাতীতভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে, জগন্মাতা যে কার্য্য দেন, তিনি বিনাবিচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্বপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাঁহাকে লইয়া মায়ের কার্য্য সাধন করেন,

বিপক্ষ বলিয়া যাঁহাকে দেখান, তাঁহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। এই শিক্ষাই আর্য্যশিক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। নারায়ণ সর্ব্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা করিব? আমরা যদি পাশ্চাত্য ভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করি, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা অনিবার্য্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে। কিন্তু আমাদের উত্থান কেবল আর্য্যজাতির উত্থান নহে। আর্য্যচরিত্র, আর্য্য শিক্ষা, আর্য্যধর্ম্মের উত্থান। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতির প্রভাব বড় প্রবল ছিল, তথাপি প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে; মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, আর্য্য অভিমানের তীব্র অনুভবে ধর্ম্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে। রাজনীতি ধর্ম্মের অঙ্গ, কিন্তু তাহা আর্য্যভাবে, আর্য্যধর্ম্মের অনুমোদিত উপায়ে আচরণ করিতে হয়। আমরা ভবিষ্যৎ আশাস্বরূপ যুবকদিগকে বলি, যদি তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। বিদ্বেষের তীব্র উত্তেজনায় ক্ষনিক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যাঁহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতৃভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য তেজ সঞ্চার কর, সেই শক্তিতে আমরা অটুটবলান্বিত ও চিরজয়ী হইব।

আমাদের আশা

আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশক্তি নাই, আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শিক্ষিত য়ুরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন করিতে প্রয়াসী হই? পণ্ডিত ও বিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত অবিবেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমাত্র পন্থা, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ। স্বীকার করিলাম, আমরা যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, আমরাও যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা কি সত্যকথা যে বাহু-বলই শক্তির আধার, না শক্তি আরও গূঢ়, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয়? সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য যে কেবলমাত্র বাহুবলে কোন বিরাট কার্য্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। যদি দুই পরস্পরবিরোধী সমান বলশালী শক্তির সংঘর্ষ হয়, যাহার নৈতিক ও মানসিক বল অধিক,—যাহার ঐক্য, সাহস, অধ্যবসায়, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ উৎকৃষ্ট,—যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শক্তি বিকশিত, তাহারই জয় নিশ্চয় হইবে। এমন কি বাহুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হীন, সে-ও নৈতিক ও মানসিক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। তবে বলিতে পার যে, বাহুবল অপেক্ষা নৈতিক ও মানসিক বলের গুরুত্ব আছে, কিন্তু বাহু-বল না থাকিলে নৈতিক বল ও মানসিক বলকে কে রক্ষা করিবে? যথার্থ কথা। কিন্তু ইহাও দেখা গিয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, দুই সম্প্রদায়, দুই পরস্পরবিরোধী সভ্যতার সংঘর্ষে যে-পক্ষের দিকে বাহুবল, রাজশক্তি, যুদ্ধের উপকরণ প্রভৃতি উপায় পূর্ণমাত্রায় ছিল, তাহার পরাজয় হইয়াছে, যে-পক্ষের দিকে এই সকল উপায় আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে। এই ফলের বৈপরীত্য কেন হয়? 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ', কিন্তু ধর্ম্মের পিছনে শক্তি চাই, নচেৎ অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, ধর্ম্মের গ্লানি স্থায়ী থাকিবার কথা। বিনা কারণে কার্য্য হয় না। জয়ের কারণ শক্তি। কোন্ শক্তিতে দুর্ব্বল পক্ষের জিত হয়, প্রবল পক্ষের শক্তি পরাজিত বা বিনষ্ট হয়? আমরা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তসকল পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিব, আধ্যাত্মিক শক্তির বলে এই অঘটন ঘটিয়াছে, আধ্যাত্মিক শক্তিই বাহুবলকে তুচ্ছ করিয়া মানবজাতিকে

জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থূলপ্রকৃতির লীলাক্ষেত্র নহে। শুদ্ধ আত্মা শক্তির উৎস, যে আদ্যাপ্রকৃতি গগনে অযুত সূর্য্য ঘুরাইতে থাকে, অঙ্গুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সৃষ্ট পূর্ব্বগৌরবের চিহ্ন-সকল ধ্বংস করে, সেই আদ্যাপ্রকৃতি শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকৃতি অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি উল্লঙ্ঘন করিবার শক্তি দেয়। সমস্ত জগৎ সেই শক্তির সৃষ্টি। যাহার আধ্যাত্মিক বল বিকশিত তাহার জয়ের উপকরণ আপনিই সৃষ্ট হয়, বাধাবিপত্তি আপনি সরিয়া গিয়া অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্য্য করিবার ক্ষমতা আপনিই ফুটিয়া তেজস্বিনী ও ক্ষিপ্রগতি হয়। য়ুরোপ আজকাল এই Soul-force বা আধ্যাত্মিক শক্তিকে আবিষ্কার করিতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার ভরসায় কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। যতবার ভারতজাতির বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্রস্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।

কিন্তু স্থূলজগতের সকল শক্তির বিকাশ সময়সাপেক্ষ, অবস্থার উপযুক্ত ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়ারের ন্যায় কমিয়া-বাড়িয়া শেষে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হয়। আমাদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে। এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় রহিয়াছি। মহাপুরুষদের তপস্যা, স্বার্থত্যাগীর কষ্ট-স্বীকার, সাহসীর আত্মবিসর্জন, যোগীর যোগশক্তি, জ্ঞানীর জ্ঞানসঞ্চার, সাধুর শুদ্ধতাই আধ্যাত্মিক বলের উৎস। একবার এই নানাবিধ পুণ্য ভারতকে সঞ্জীবনী সুধায় ভাসাইয়া মৃত জাতিকে জীবিত, বলিষ্ঠ, তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছিল, আবার সেই তপোবল নিজের মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া অদম্য অজেয় হইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বৎসরের নিপীড়ন, দুর্ব্বলতা ও পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শক্তির উৎস অন্বেষণ করিতে শিখিতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত বিদ্যা নহে, সভাসমিতির ভাব-সঞ্চারিণী শক্তি নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জীবের সংযোগে যে গভীর অবিচলিত, অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়ী পাপপুণ্যবর্জ্জিত শক্তি সম্ভূত হয়, সেই মহা-সৃষ্টিকারিণী, মহাপ্রলয়ঙ্করী, মহাস্থিতিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী মহাসরস্বতী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মহালক্ষ্মী, শক্তিদায়িনী মহাকালী, সেই সহস্র তেজের সংযো-জনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতো-দ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র, মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতের

সভ্যতার শক্তিপ্রদর্শন এবং জগৎময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও অধিকার। আমরা যদি পাশ্চাত্য সভ্যতার বলে, সভাসমিতির বলে, বক্তৃতার-জোরে, বাহুবলে, স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ত-শাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মিক শক্তিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও সথূল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। সেইজন্য ভগবান আমাদের পাশ্চাত্যভাবযুক্ত আন্দোলন ধ্বংস করিয়া বহির্ম্মুখী শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী করিয়াছেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় দিব্যচক্ষুতে যাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া বার বার বলিতেন, শক্তিকে অন্তর্ম্মুখী কর, কিন্তু সময়ের দোষে তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শক্তি অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে। যখন আবার বহির্ম্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আমাদের দেশে ও য়ুরোপে মুখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্তর্ম্মুখী, য়ুরোপের জীবন বহির্ম্মুখী। আমরা ভাবকে আশ্রয় করিয়া পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিচার করি, য়ুরোপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া পাপ পুণ্য ইত্যাদি বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্য্যামী ও আত্মস্থ বুঝিয়া অন্তরে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, য়ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বুঝিয়া বাহিরে তাঁহাকে দেখে ও উপাসনা করে। য়ুরোপের স্বর্গ স্থূলজগতে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, ভোগ-বিলাস তাঁহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য; যদি অন্য স্বর্গ কল্পনা করেন, তাহা এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ভোগ-বিলাসের প্রতিকৃতি, তাঁহাদের ভগবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পার্থিব রাজার ন্যায় রত্নময় সিংহাসনে আসীন হইয়া সহস্র বন্দনাকারী দ্বারা স্তবস্তুতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসাম্রাজ্য চালান। আমাদের শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ; আমাদের কৃষ্ণ বালক, হাস্যপ্রিয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ক্রীড়া করা তাঁহার ধর্ম্ম। য়ুরোপের ভগবান কখন হাসেন না, ক্রীড়া করেন না, তাহাতে তাঁহার গৌরব নষ্ট হয়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব আর থাকে না। সেই বহির্ম্মুখী ভাব ইহার কারণ—ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রতিষ্ঠা, চিহ্ন না দেখিলে তাঁহারা জিনিষটি দেখিতে পান না, তাঁহাদের দিব্যচক্ষু নাই, সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, সবই স্থূল। আমাদের শিব ভিক্ষুক, কিন্তু ত্রিলোকের সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্য অল্পেতে সাধককে দান করেন —ভোলানাথ, কিন্তু জ্ঞানীর অপ্রাপ্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি। আমাদের প্রেমময় রঙ্গপ্রিয় শ্যামসুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পিতা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সখা ও সুহৃদ। ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ্ম সূক্ষ্মদৃষ্টি, অপ্রতিহত দিব্যচক্ষু স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া আত্মস্থ ভাব, আসল সত্য, অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব বাহির করিয়া আনে।

পাপপুণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষিত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দেখি। নিন্দিত কর্ম্মের মধ্যে পবিত্র ভাব, বাহ্যিক পুণ্যের মধ্যে পাপিষ্ঠের স্বার্থ লুক্কায়িত থাকিতে পারে; পাপপুণ্য, সুখদুঃখ মনের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আবরণ মাত্র। আমরা ইহা জানি; সামাজিক সুশৃঙ্খলার জন্য আমরা বাহ্যিক পাপ-

পুণ্যকে কর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া মান্য করি, কিন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের আদরণীয়। যে সন্ন্যাসী আচার-বিচার, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, পাপপুণ্যের অতীত, জড়োন্মত্তপিশাচবৎ আচরণ করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেষ্ঠ বলি। পাশ্চাত্য বুদ্ধি এই তত্ত্বগ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বৎ আচরণ করে, তাহাকে জড় বুঝে, যে উন্মত্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বুঝে যে পিশাচবৎ আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী পিশাচ বুঝে; কেননা সূক্ষ্ম দৃষ্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দেখিতে অসমর্থ।

* *
*

সেইরূপ বাহ্যদৃষ্টিপরবশ হইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতে প্রজাতন্ত্র কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্ত্রসূচক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না, আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, প্রজাতন্ত্রের বাহ্যচিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রতিপন্ন হয়। আমরাও এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন আর্য্যরাজ্যে প্রজাতন্ত্রের অভাব ছিল না; প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক উপকরণ অসম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতন্ত্রের অন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নতি রক্ষা করিত। প্রথমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র ছিল, গ্রামের লোক সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুষদের অধীনে গ্রামের ব্যবস্থা, সমাজের ব্যবস্থা করিতেন; এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষুন্ন রহিল, বৃটিশ শাসনতন্ত্রের নিষ্পেষণে সেইদিন নষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও, যেখানে সর্ব্বসাধারণকে সম্মিলিত করিবার সুবিধা ছিল, সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যে, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভারতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, বড় বড় রাজ্যে, যেখানে এইরূপ বাহ্যিক উপকরণ থাকা অসম্ভব, প্রজাতন্ত্রের ভাব রাজতন্ত্রকে পরিচালিত করিত। প্রজার আইনব্যবস্থাপক সভা ছিল না, কিন্তু রাজারও আইন করিবার বা প্রবর্ত্তিত আইন পরিবর্ত্তন করিবার লেশমাত্র অধিকার ছিল না। প্রজারা যে আচারব্যবহার রীতিনীতি আইনকানুন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষাকর্ত্তা রাজা। ব্রাহ্মণগণ আধুনিক উকিল ও জজদের ন্যায় সেই প্রজা-অনুষ্ঠিত নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় করিতেন, ক্রমে ক্রমে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেন, তাহা লিখিতশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন। শাসনের ভার রাজারই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ; তাহা ভিন্ন রাজা প্রজার অনুমোদিত কার্য্যই করিবেন, প্রজার অসন্তোষ যাহাতে হয়, তাহা কখন করিবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত।

রাজা তাহার ব্যতিক্রম করিলে, প্রজারা আর রাজাকে মান্য করিতে বাধ্য ছিল না।

* *
*

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ। বহির্জগৎ অন্তর্জগতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তর্জগৎ বহির্জগতে প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাব ও শ্রদ্ধা শক্তি ও কর্ম্মের উৎস, ভাব ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কর্ম্মের বাহ্যিক আকারে ও উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা প্রজাতন্ত্রের বাহ্যিক আকার ও উপকরণ লইয়া ব্যস্ত। ভাবকে পরিস্ফুট করিবার জন্য বাহ্যিক আকার করণ; ভাব আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ সৃজন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই বহিঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা মরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন না। আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজাতন্ত্রের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পরিস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন করিতেছে, বাহ্য আকার গঠন করিতেছে. কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব মল্লান হইতেছে, সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে। প্রাচ্য প্রভাতোন্মুখ, আলোকের দিকে ধাবিত—পাশ্চাত্য তিমিরগামী রাত্রির দিকে ফিরিয়া যাইতেছে।

* *
*

ইহার কারণ, সেই বাহ্য আকার ও উপকরণে আসক্তির ফলে প্রজাতন্ত্রের দুষ্পরিণাম। প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুকূল শাসনতন্ত্র সৃজন করিয়া আমেরিকা এতদিন গর্ব্ব করিতেছিল যে আমেরিকার তুল্য স্বাধীন দেশ জগতে আর নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ও কর্ম্মচারিগণ কংগ্রেসের সাহায্যে স্বেচ্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, অবিচার ও সর্ব্বগ্রাসী লোভকে আশ্রয় দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। একমাত্র প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের সময়ে প্রজারা স্বাধীন, তখনও ধনীরা প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন, পরেও প্রজার প্রতিনিধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছায় অর্থশোষণ করেন, আধিপত্য করেন। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কিন্তু যে কর্ম্মচারিবর্গ ও পুলিশ প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শাসনকার্য্য চালাইবার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া বসিয়াছে, প্রজারা তাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য বিপদ পরিস্ফুট হইতেছে। চঞ্চলমতি অর্দ্ধশিক্ষিত প্রজার প্রত্যেক মতপরিবর্ত্তনে শাসনকার্য্য ও রাজনীতি আলোড়িত

হয় বলিয়া বৃটিশজাতি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা হারাইয়া বাহিরে-অন্তরে বিপদগ্রস্ত হইতেছে। শাসনকর্তৃগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানরহিত, নিজ স্বার্থ ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিবার জন্য নির্ব্বাচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ভুল বুঝাইয়া বৃটিশজাতির বুদ্ধি বিকৃত করিতেছেন, মতির অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য-বর্দ্ধন করিতেছেন। এই সকল কারণ বশতঃ একদিকে প্রজাতন্ত্রবাদ ভ্রান্ত বলিয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছে, অপরদিকে এনার্কিষ্ট, সোশালিষ্ট, বিপ্লবকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ ইংলণ্ডে চলিতেছে—রাজনীতিক্ষেত্রে; আমেরিকায়—শ্রমজীবী ও লক্ষপতির বিরোধে; জর্ম্মাণীতে—মত-সংগঠনে; ফ্রান্সে—সৈন্য ও নৌ-সৈন্যে; রুশে—পুলিশ ও হত্যাকারীর সংগ্রামে— সর্ব্বত্র গণ্ডগোল, চঞ্চলতা, অশান্তি।

* *
*

বহির্ম্মুখী দৃষ্টির এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কয়েকদিন রাজসিক তেজে তেজস্বী হইয়া অসুর মহান্ শ্রীসম্পন্ন, অজেয় হয়, তাহার পরে অন্তর্নিহিত দোষ বাহির হয়, সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত্র, সেই দেশেই অন্তর ও বাহির, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা কার্য্যতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সেই মীমাংসা করিতে পারিব না। প্রাচ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত করিতে হইবে। অন্তরে প্রতিষ্ঠা, বাহিরে প্রকাশ। ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, নিজ স্বভাব ও প্রাচ্যবুদ্ধির উপযুক্ত সৃজন করিতে হইবে।

গুরু গোবিন্দসিংহ

গুরু গোবিন্দসিংহ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দসিংহের জীবনী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পুস্তকে গুরু গোবিন্দসিংহের রাজনীতিক চেষ্টা ও চরিত্র সরল ও সহজ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু শিখদের দশম গুরু কেবল যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ধার্ম্মিক মহাপুরুষ ও ভগবদাদিষ্ট ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, নানকের সাত্ত্বিক বেদান্ত শিক্ষাবহুল ধর্ম্মকে নূতন আকার দিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার ধর্ম্মমত ও তৎকৃত শিখধর্ম্ম ও শিখসমাজের পরিবর্ত্তন বিশদরূপে চিত্রিত হইলে এই সুন্দর জীবনী অসম্পূর্ণতা দোষে দূষিত হইত না। লেখক সংক্ষেপে শিখজাতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত লিখিয়া গোবিন্দসিংহের চরিত্র ও আগমনের ঐতিহাসিক বীজ ও কারণ বুঝিবার সুবিধা করিয়াছেন। সেইরূপে পরবর্ত্তী বৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ করিলে দশম গুরুর অসাধারণ কার্য্যের ফলাফল ও মহতী চেষ্টার পরিণতি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইত। শিখ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে গুরু গোবিন্দসিংহ। তিনি যে জাতি সংগঠনে তাঁহার সমগ্র প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিলেন, সেই জাতির ইতিহাসই এই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবন-চরিত। যেমন শিকড় ও ডগার অভাবে কাণ্ড শোভা পায় না, তেমনি শিখ সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব ও পর বৃত্তান্তের অভাবে গোবিন্দসিংহের জীবনচরিত অসম্পূর্ণ বোধ হয়। আশা করি লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে এই অংগ যোগ দিবেন এবং শিখ মহাপুরুষের ধর্ম্মমত ও সমাজ সংস্কারের বিশদ বর্ণনা করিয়া স্বলিখিত পুস্তক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে খালসা-সংস্থাপক স্বদেশহিতৈষী মহাবীরের উদার চরিত্র ও অদ্ভুত কার্য্য-কলাপের দিকে মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছুক হন, এই জীবনী তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিবে ও ঐশ্বরিক প্রেরণা দৃঢ়ীভূত করিবে।

পত্রাবলী

30th August.

প্রিয়তমা মৃণালিনী,

তোমার ২৪এ আগষ্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কোন্ ছেলেটি পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি লিখ নাই। দুঃখ হ'লে বা কি হয়। সংসারে সুখের অন্বেষণে গেলেই সেই সুখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সর্ব্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম যে পুত্র কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। ধীর চিত্তে সব সুখ দুঃখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র উপায়।

আমি কুড়ি টাকা না পড়িয়া দশ টাকা পড়িয়াছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব বলিয়াছিলাম; পনের টাকা যদি দরকার, পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে সরোজিনী তোমার জন্যে দার্জ্জিলিংএ কাপড় কিনিয়াছে, তার টাকা পাঠাইয়াছি। তুমি যে এইদিকে ধার করিয়া বসেছ, তাহা কি করিয়া জানিব? পনের টাকা লেগেছিল, পাঠাইয়াছি; আর তিন চারি টাকা লাগিবে, তাহা আগামী মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুড়ি টাকা পাঠাইব।

এখন সেই কথাটি বলি। তুমি বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছ, যাহার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত, সে বড় বিচিত্র ধরণের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসাধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয় তুমি জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা হইলে ওকে পাগল না বলিয়া প্রতিভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু ক'জনের চেষ্টা সফল হয়? সহস্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ জনের মধ্যে একজন কৃতকার্য্য হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণও করিতে পারি নাই, অতএব আমাকে পাগলই বুঝিবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ স্ত্রীজাতির সব আশা সাংসারিক সুখ দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রণেতৃগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য

চরিত্র, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক্ বা মহাপুরুষ হোক অসাধারণ লোককে বড় মানিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা হয়, তাহার কি উপায় হইবে? ঋষিগণ এই উপায় ঠিক করিলেন, তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে বলিলেন, তোমরা অন্য হইতে পতিঃ পরমোগুরুঃ, এই মন্ত্রই স্ত্রীজাতির একমাত্র মন্ত্র বুঝিবে। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তিনি যে-কার্য্যই স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সাহায্য দিবে, মন্ত্রণা দিবে, উৎসাহ দিবে, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সুখ, তাঁহারই দুঃখে দুঃখ করিবে। কার্য্য নির্ব্বাচন করা পুরুষের অধিকার, সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া স্ত্রীর অধিকার।

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধর্ম্মের পথ ধরিবে না নূতন সভ্য ধর্ম্মের পথ ধরিবে? পাগলকে বিবাহ করিয়াছ সে তোমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-দোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম বন্দোবস্ত হইবে? পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও কি ওকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছুটিবে, তুমি ওকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগ্‌লী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক তবু তুমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্ব্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই তুমি শেষোক্ত পথই ধরিবে।

আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দিয়া চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে মত্ত রহিয়াছি। জীবনের অর্দ্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পরি-বারের উদর পূরিয়া কৃতার্থ হয়।

আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম। ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা। যে টাকা সরোজিনী বা ঊষাকে দিয়াছি তার জন্য কোন অনুতাপ

নাই, পরোপকার ধর্ম্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা মহাধর্ম্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়।

কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া যহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে। তুমি বল্‌ছিলে 'আমার কোন উন্নতি হলো না', এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি?

দ্বিতীয় পাগলামী সম্প্রতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামিটা এই, যে-কোন-মতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ করিতে হইবে। আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারিবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিতে কোন বাধা নাই, সেই পথে সিদ্ধি সকলের হইতে পারে, কিন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধরিয়া নিয়া যাইতে পারিবে না, যদি মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও লিখিব।

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই

ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল। তুমি ন-মাসির কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলোকে আমার সরল ভালমানুষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানুষ স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহস্র লোককে প্রবেশ করাইবেন। কার্য্যসিদ্ধি আমি থাকিতেই হইবে তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু হইবে নিশ্চয়ই।

এখন বলি তুমি এ বিষয়ে কি করিতে চাও? স্ত্রী স্বামীর শক্তি, তুমি ঊষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজামন্ত্র জপ করিবে? উদাসীন হইয়া স্বামীর শক্তি খর্ব্ব করিবে? না সহানুভূতি ও উৎসাহ দ্বিগুণিত করিবে? তুমি বলিবে, এই সব মহৎ কর্ম্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি করিতে পারে, আমার মনের বল নাই, বুদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার যে-যে অভাব আছে তিনি শীঘ্র পূরণ করিবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় লইয়াছে, ভয় তাহাকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দেয়। আর আমার উপর যদি বিশ্বাস করিতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যদি শোন, আমি তোমাকে আমারই বল দিতে পারি, তাহাতে আমার বলের হানি না হইয়া বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলি স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।

চিরদিন কি এই ভাবে থাকিবে? আমি ভাল কাপড় পরিব, ভাল আহার করিব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নতি বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও অতি হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুমি এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, জগতে ভগবানের কাজ করিতে আসিয়াছি, সেই কাজ আরম্ভ করি।

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি অতিমাত্র সরল। যে যাহা বলে, তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল অস্থির থাকে, বুদ্ধি বিকাশ পায় না, কোন কর্ম্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শুনিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া স্থির ভক্তি রাখিতে হইবে।

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ। বঙ্গদেশে কাল অমনতর হইয়াছে। লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুনিতে পারে

না; ধর্ম্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেষ্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাসি ও বিদ্রূপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; ব্রাহ্মস্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একটু একটু হইয়াছে, বারিরও ছিল, অল্প পরিমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত আশ্চর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা সহজে পারিবে, আর একবার চিন্তা করিবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল স্বভাব ফুটিবে; পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবলি এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে।

এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় করিবার কিছু নাই, তবে চিন্তা করিবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু করিতে হইবে না কেবল রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান করিতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতে হয়, আমি যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে ব্যাঘাত না করিয়া সর্ব্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এই করিবে?

তোমার

23 Scott's Lane,
CALCUTTA.
17th February, 1907.

প্রিয় মৃণালিনী—

অনেক দিন চিঠি লিখি নাই, সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য তুমি নিজ গুণে ক্ষমা না করিলে আমার আর উপায় কি? যাহা মজ্জাগত তাহা এক দিনে বেরোয় না, এই দোষ শোধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাটিবে।

8th জানুয়ারি আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এস, তখন যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পুতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে। এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে কঠিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গতিবিধি তোমার আক্ষেপ ও দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে করিবে আমি তোমাকে উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতেছি, তাহা মনে করিবে না। এই পর্য্যন্ত আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেক দোষ করিয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক, কিন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বুঝিতে হইবে যে আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের আদেশেই হইল। তুমি আসিবে, তখন আমার কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবে। আশা করি ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তুমি যদি আমার সহধর্ম্মিণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে যাহাতে তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন। এই পত্র

কাহাকেও দেখিতে দিবে না, কারণ যে কথা বলিয়াছি, সে অতিশয় গোপনীয়। তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বলি নাই, বলা নিষিদ্ধ। আজ এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্বামী

পুনশ্চ।—সংসারের কথা সরোজিনীকে লিখিয়াছি, আলাদা তোমাকে লেখা অনাবশ্যক, তাহা পত্র দেখিয়া বুঝিবে।

6th December, 1907.

প্রিয় মৃণালিনী—

আমি পরশু চিঠি পাইয়াছিলাম, সে দিনই র‍্যাপারও পাঠান হইয়াছিল. কেন পাও নাই তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

* * *

আমার এইখানে এক মুহূর্ত্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, 'বন্দে মাতরমের' গোলমাল মিটাই-বার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠিছ না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না।

আমার একটী কথা শুনিবে কি? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনা বৃদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে, প্রফুল্লচিত্তে সব বিপদ ও ভয় অতিক্রম করিতে পারিব। জানি দেওঘরে একেলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য্য, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙ্গালীর মত পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম, আমার নির্দ্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, যাহাদের সঙ্গে তুমি এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন, তাঁহারা কটুবাক্য বলিলে, অন্যায় কথা বলিলে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ করো না। আর যাহা বলেন তাহা যে সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে দুঃখ দিবার জন্যে বলা হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করো না। অনেকবার রাগের মাথায় না ভেবে কথা বেরোয়, তাহা ধরে থাকা ভাল নয়। যদি নিতান্ত না

থাকিতে পার আমি গিরিশ বাবুকে বলিব, তোমার দাদামহাশয় বাড়ীতে থাকিতে পারেন আমি যতদিন কংগ্রেসে থাকি।

আমি আজ মেদনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে সুরাটে যাব। হয়ত 15th or 16th ই যাওয়া হইবে। জানুয়ারি ২রা তারিখে ফিরিয়া আসিব।

তো—

পণ্ডিচেরীর পত্র

৭ই এপ্রিল,
১৯২০।

স্নেহের—

তোমার চিঠি পেয়েছি, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠেনি। এই যে লিখতে বসেছি, সেটাও একটা miracle (আশ্চর্য্য কান্ড), কেন না আমার চিঠি লেখা হয় once in a blue moon (ক্ষুদে মঙ্গলবারে একবার); বিশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বৎসরে একবারও করিনি। শেষ করে যদি post-এ (ডাকে) দিতে পারি, তা হ'লেই miracleটা (অসাধ্যসাধনটা) সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম, তোমার যোগের কথা। তুমি আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যিনি আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতী শক্তি দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া। তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা,—যাকে পূর্ণযোগ বলি—সেই পন্থায় চলতে হবে। * * * যা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, লেলে যা দিয়েছিলেন * * সেটি ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, এদিক ওদিক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খন্ডযোগের এটী ওটী ছোঁয়া, তোলা; হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটীর এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটীর পিছনে যাওয়া।

তারপর পন্ডিচারীতে এসে এই চঞ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্য্যামী জগদ্‌গুরু আমাকে আমার পন্থার পূর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন। তার সম্পূর্ণ theory (তত্ত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই development (বিকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি, আর দুই বৎসর লাগতে পারে।

যোগ-পন্থাটী কি, তা পরে লিখবো; অথবা তুমি যদি এখানে এস, তখনই সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই মাত্র বলতে পারি যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম্ম ও পূর্ণ ভক্তির সামঞ্জস্য ও ঐক্যকে মানসিক ভূমির (level) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খন্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত, অখন্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদিই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক জন করতে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত আছেনই।

ভগবান মানুষে যা চান, সেটী হচ্ছে তাঁকে এখানেই মূর্ত্তিমান করা, ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে—to realise God in life (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত্ত করা)।

পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি, জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্" ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক জন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মসিদ্ধি? আগে মানসিক levelএ (ভিত্তিতে) যত খণ্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্ম-রসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তার পর উপরে উঠা। উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, জগতের সমস্যা solved (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম ও জীবন—এই দ্বন্দ্বের অবিদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লীলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাকে বলে "সমগ্রং মাং জ্ঞাতুম্"। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হল আত্মার পাঁচটী ভূমি। যতই উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকসিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূল কথা)।

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আমি এইমাত্র বিজ্ঞানের তিনটী স্তরের নিম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বৃত্তি তার মধ্যে টেনে তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই সিদ্ধি যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান আমার through (মধ্য) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সিদ্ধি দেবেন, এর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। আমি কর্ম্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার, ভগবানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হবে, উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম্মসিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হব না; এ কর্ম্ম আমার নয়, ভগবানের। আমি আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন তখন চলব।

বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আমি জানি। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে,

সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নূতন রূপ, কিন্তু আসল রূপান্তর নয়। তবে এরও দরকার ছিল। বাঙলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে সেইগুলির সংস্কার exhaust (ক্ষয়) করে আসল সারটী নিয়ে জমী উর্ব্বর করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা—অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া ইত্যাদি। যা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষ্ণব ধর্ম্মের পালা—লীলা, প্রেম, ভাবের আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগুলি অতি পুরাতন, নবযুগের অনুপযোগী, এ সব টিঁকবে না, কারণ এরূপ উন্মাদনা টেঁকবার নয়। তবে বৈষ্ণব ভাবের এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ রাখে, জীবনের একটি অর্থ হয়; (কিন্তু) খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে দলাদলির ভাব লক্ষ্য করেছ সেটী অনিবার্য্য। মনের ধর্ম্ম—এই খণ্ডকে নিয়ে পূর্ণ বলা, আর-সকল খণ্ডকে বহিস্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী নিয়ে আসেন, তিনি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন— (পূর্ণকে) মূর্ত্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) শিষ্যেরা তা পারে না, (গুরুতে তত্ত্বটি) মূর্ত্ত নয় বলে। পুঁটলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যে দিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুঁটলি আপনি খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে বিচলিত হই নে। অধ্যাত্ম ভাব খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক,—পরে দেখা যাবে। এটী নবযুগের শৈশব, এমন কি embryonic (ভ্রূণ) অবস্থা। আভাস মাত্র, আরম্ভ নয়।

*　　　　*　　　　*

এই যোগের বিশিষ্টতা এই যে, সিদ্ধি একটু উপরে না উঠলে ভিত্তিও পাকা হয় না। (আমার যোগের) যারা সাধন করছে তাদের আগে অনেক পুরাতন সংস্কার ছিল, কয়েকটি খসেছে কয়েকটি এখনও আছে। আগে (তোমাদের) ছিল সন্ন্যাসের সংস্কার, অরবিন্দ-মঠ করতে চেয়েছিলে; এখন (তোমাদের) বুদ্ধি মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, (কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি। সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগী সংসারী হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে ধরতে পার নি। আর আমার যোগটা নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব—জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, যেমন ভক্তির দিকে, কর্ম্মের দিকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, আর ভাবুকতার কুয়াসা dissipated হয়নি—কাটেনি। তোমরা সাত্ত্বিকতার গণ্ডি পুরামাত্রায় কাটাতে পার নি, অহং এখনও রয়েছে; এক কথায় তার development (বিকাশ) হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাড়ি নেই, আমি তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে develop করতে দিচ্ছি। এক ছাঁচে সকলকে

ঢালতে চাই নে আসল জিনিষটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানা ভাবে নানা মূর্ত্তিতে ফুটবে। সকলে ভিতর থেকে grow করছে (বাড়ছে), গড়ে উঠছে। বাহির থেকে গঠন করতে চাই নে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে।

ভেদপ্রতিষ্ঠ সমাজ চাই না, আত্মপ্রতিষ্ঠ—আত্মার ঐক্যের মূর্ত্তি—সংঘ চাই। এই idea বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেব-জীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহমের ছায়া যদি পড়ে, সংঘ দলে পরিণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে (শুদ্ধ) সংঘ শেষে দেখা দেবে এইটিই তাই; (যেন) সব হবে এই একমাত্র কেন্দ্রের পরিধি, যারা এর বাহিরে তারা ভেতরকার লোক নয়, (অথবা ভেতরকার) হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্ত্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই (যেন ভ্রান্ত)।

তুমি হয়ত বলবে, সংঘের কি দরকার? মুক্ত হয়ে সর্ব্বঘটে থাকব; সব একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সত্যি কথা; কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি দিক মাত্র। আমাদের কারবার শুধু নিরাকার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার মূর্ত্তি ভিন্ন জীবনের effective (কার্য্যকরী) গতি নেই। অরূপ যে মূর্ত্ত হয়েছে, সে নামরূপ গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার দিতে হবে।

রাজনীতিকে ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র। তবে তারও দরকার ছিল। আমরাও বিলাতী ধরণের রাজনীতি করেছি; না করলে দেশ উঠত না; আমাদের experience (অভিজ্ঞতা) লাভ ও পূর্ণ development (বিকাশ) হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে। কিন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম্ম তারই অনুরূপ করা চাই।

লোকে এখন রাজনীতিকে spiritualise (অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত) করতে চায় * * * তার ফল হবে, যদি কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম Indianised Bolshevism (ভারতীয় বোল্‌সেভীজম্)। সে রকম কর্ম্মেও আমার আপত্তি নেই; যাঁর যে প্রেরণা, তিনি তাই করুন। তবে এটা আসল বস্তু নয়; অশুদ্ধ রূপে Spiritual (অধ্যাত্ম) শক্তি ঢাললে—কাঁচা

ঘটে কারণোদধির জল—হয় ঐ কাঁচা জিনিষটা ভেঙ্গে যাবে, জল ছড়িয়ে নষ্ট হবে, নয় অধ্যাত্ম শক্তি evaporate করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই থাকবে; সর্ব্বক্ষেত্রেই তাই। Spiritual influence (অধ্যাত্ম প্রেরণা) দিতে পারি, তবে সেই শক্তি expended (খরচ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের মূর্ত্তি গড়ে স্থাপন করতে। বানরটি প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শক্তিমান হয়ে ভক্ত হনুমান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতদিন সেই শক্তি থাকবে। আমরা কিন্তু ভারত-মন্দিরে চাই হনুমান নয়—দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম।

• সকলের সঙ্গে মিলতে পারি—কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জন্য, আমাদের আদর্শের spirit (ভাব) ও রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে। তা না করলে দিশেহারা হব, প্রকৃত কর্ম্ম হবে না। Individually (ব্যক্তিগত ভাবে) সর্ব্বত্র থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সর্ব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে এখনও সে সময় আসেনি। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ; যারা আদর্শ পেয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে Spiritual Commune-এর (অধ্যাত্ম-সংঘ) মত রূপ দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কর্ম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুরূপ আকৃতি দেবে। শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয়: স্বাধীন রূপ, সমুদ্রের মত যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গী লয়ে এটাকে ঘিরে, ওটাকে প্লাবিত করে, সবকে আত্মসাৎ করবে; করতে করতে Spiritual Community (দেবজাতি) দাঁড়াবে। এইটি হচ্ছে আমার বর্ত্তমান idea (ভাব), এখনও পুরো developed হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তিনি যা করান।

তারপর তোমার পত্রের কয়েকটি বিশেষ কথার আলোচনা করি। তোমার যোগের সম্বন্ধে যা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছু লিখতে চাই না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্ব্বাণ-পথের লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সর্ব্ববস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, "সর্ব্বমিদম্ ব্রহ্ম—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত্ত তরঙ্গ ছোটে; এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল কর্ম্মে পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আমি নিজের মধ্যে) অনেক দিন থেকে মানসিক ভূমিতে মনের ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় করে তুলছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের (Supramental) রূপ ধারণ করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি।

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ—"আমি দেবতা নই, অনেক পিটিয়ে শানান লৌহা।" * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা

আছেন, তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। বড় আধার আছে, মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আমি accurate (যথাযথ) বলে গ্রহণ করছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের স্পর্শ যদি পড়ে, আত্মা যদি জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বেশী বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, বিকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে সব বাধা ন্যূনতার হিসাব রাখে না; ঠেলে ওঠে। আমারও কি কম দোষ ছিল, মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নি? ভগবান কি কম পিটিয়েছেন? দিনের পর দিন, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত দেবতা হয়েছি বা কি হয়েছি জানি না; তবে কিছু হয়েছি বা হচ্ছি—ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন তাই যথেষ্ট। সকলেরই তাই। * * * আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।

আমি যা অনেকদিন থেকে দেখছি তার দু' একটি কথা সংক্ষেপে বলি। আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্ম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস—জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্ব্বত্রই দেখি inability বা unwillingness to think, (চিন্তা করবার অক্ষমতা অনিচ্ছা) বা চিন্তা-"ফোবিয়া"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ, দেখবে দুটি জিনিস—অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সুশৃংখল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে; সেই শক্তির বলে জগৎকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভীত, সন্দিগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট—এ সব নবসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা।

তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্ব্বত্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা; য়ুরোপে চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা। সামান্য কুলীমজুরও চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তলিয়ে দেখতে চায়। প্রভেদ এই যে য়ুরোপের শক্তি ও চিন্তার fatal limitation (অলঙ্ঘ্য

সীমা) আছে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এসে তার চিন্তাশক্তি আর চলে না। সেখানে য়ুরোপ সব দেখে হেঁয়ালি, nebulous metaphysics (কুহেলিকাময় তত্ত্ব-শাস্ত্র), yogic hallucination (যোগজ মতিভ্রম); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই limitation (সীমা) ও surmount (অতিক্রম) করবার য়ুরোপে কম চেষ্টা হচ্ছে না। আমাদের অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শক্তি যার এক ফুৎকারে য়ুরোপের সমস্ত প্রকাণ্ড শক্তি তৃণের মত উড়ে যেতে পারে। কিন্তু সে শক্তি পাবার জন্য শক্তির (উপাসনা) দরকার। আমরা কিন্তু শক্তির উপাসক নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্তি পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্ব্বপুরু-ষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়েছিলেন; বিশাল সভ্যতা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বেগও কমে গেল। আমাদের সভ্যতা হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধর্ম্মের গোঁড়ামি, অধ্যাত্মভাব একটি ক্ষীণ আলোক বা ক্ষণিক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন ভারতের স্থায়ী পুনরুত্থান অসম্ভব।

বাঙ্গলা দেশেই এই দুর্ব্বলতার চরম অবস্থা। বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধি আছে, ভাবের capacity (সামর্থ্য) আছে, intuition (অন্তর্জ্ঞান) আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বীরো-চিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ, তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী নিজের দেশে কি হয়েছে— খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ পর্য্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করছে। শক্তি-সাধনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে; ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মনে, প্রাণে, হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এ দেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই।

আর্য্যজাতির উদার বীরযুগে এত হাঁকডাক, নাচানাচি ছিল না, কিন্তু

যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙালীর চেষ্টা দু'দিন স্থায়ী থাকে।

তুমি বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো। রাজনীতিক্ষেত্রে ও-সব করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাৎ হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্রে কি শুভতর পরিণাম হবে? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় নি। হয়েছে; যত movement (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে তা অধিকাংশ possibility-র (সম্ভাবনার) বৃদ্ধি; স্থিরভাবে actualise (বাস্তবরূপদান) করবার এটি ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আমি আর emotional excitement (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমত্ততা), ভাব, মনমাতানোকে base (প্রতিষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রতিষ্ঠা করতে আমি চাই বিশাল বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দৃঢ়, অবিচলিত শক্তি; শক্তিসমুদ্রে জ্ঞানসূর্য্যের রশ্মির বিস্তার; সেই আলোকময় বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, ঐক্যের স্থির ecstasy (তীব্রানন্দ)। লাখ লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট। প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই; আমি গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক, কেহ যদি ভিতর থেকে নিজের সুপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবৎ-জীবন লাভ করে, এটাই আমি চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।

এই lecture (বক্তৃতা) পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আমি বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ। ওঁরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করছি। তবে other side of the shield (বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, ত্রুটি, ন্যূনতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি! এগুলি থাকলে সে জ্যোতি মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না।

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য্য এই যে আমিও পুঁটলি বাঁধছি। তবে আমার বিশ্বাস যে সে পুঁটলি St. Peterএর (খৃষ্টের প্রথম শিষ্য, খৃষ্টীয় স্বর্গের দ্বারী) চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিজ্ গিজ করছে। এখন পুঁটলি খুলছি না, অসময়ে খুলতে গেলে শিকার পালাতে পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আমি তৈয়ারী হইনি বলে। অপক্ব অপক্বের মধ্যে গিয়া কি কাজ করতে পারে ?

ইতি—

তোমার 'সেজদা'।

পত্রাবলী

বাধা বিঘ্ন

চিন্তাশূন্য বিশালতার অবস্থাকে প্রাণ ভালবাসে না। সে চায় গতি, যেরকম গতিই হোক, জ্ঞানের বা অজ্ঞানের। কোন অচঞ্চল স্থির অবস্থা তার পক্ষে নীরস লাগে।

*

ব্যথায়, হতাশায়, নিরানন্দে, নিরুৎসাহে কেউ কখনও যোগপথে উন্নতি লাভ করেনি। ওই সব না থাকা ভাল।

*

ঊর্দ্ধের অনুভূতি চাই, নিম্নপ্রকৃতির রূপান্তরও চাই। হর্ষ বিষাদ হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নতির অন্তরায়—এসব অতিক্রম করে ঊর্দ্ধের বিশাল ঐক্য ও সমতা প্রাণে ও সর্ব্বত্র নামাতে হয়।

*

বাসনা দাবী খেয়াল কল্পনার জোর যতদিন থাকে প্রাণের আধিপত্য ত থাকেই। এই সব হচ্ছে প্রাণের খোরাক, খোরাক দিলে সে প্রকাণ্ড ও বলবান হবে না কেন?

*

যদি বাসনা পোষণ কর, অধীর হয়ে যাও সাধনার ফলের জন্যে, তাহলে শান্ত নীরব কেমন করে থাকবে। মানুষের স্বভাবের রূপান্তরের মত বড় কাজ, তা কি এক মুহূর্ত্তে হয়? স্থির হয়ে মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দাও, তাহলে সময়ে সব হয়ে যাবে।

*

তুমি যদি ভিতরে শান্ত ও সমর্পিত হয়ে থাক, তাহলে বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি তোমাকে বিচলিত করবেনা। অশান্তি চঞ্চলতা আর "কেন হচ্ছেনা, কবে হবে" এই ভাব ঢুকতে দিলে বাধা-বিঘ্ন জোর পায়। তুমি বাধা-বিঘ্নের দিকে অত নজর দাও কেন? মায়ের দিকে দাও। নিজের ভিতরে শান্ত সমর্পিত হয়ে থাক। নিম্নপ্রকৃতির ছোট ছোট defect সহজে যায় না। তা নিয়ে বিচলিত হওয়া বৃথা। মায়ের শক্তি যখন সমস্ত সত্তা অবচেতনা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ দখল করবে তখন যাবে। তাতে যতদিন লাগে তা হলেও ক্ষতি নাই। সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য সময়ের দরকার।

*

আমরা দূরেও যাইনি ত্যাগও করিনি। তোমার মন প্রাণ যখন অশান্ত হয় তখন এই সব ভুল কল্পনা তোমার মনে ওঠে। বাধা যদি ওঠে, অহংকার যদি আসে, মায়ের উপর ভরসা হারাতে নেই—স্থিরভাবে তাঁকে ডাকতে ডাকতে অচঞ্চল থাক, বাধা অহংকার সরে যাবে।

*

আসল কথা এই যে কাজের মধ্যে অহংকারের বা বহিঃপ্রকৃতির বশ হবে না, তা যদি হও কাজ ত আর সাধনার অংশ হয় না, তা হয়ে যায় সামান্য সাধারণ কাজের সমান। কাজকেও সমর্পিত ভাবে ভিতর থেকে করতে হয়।

*

বহিশ্চেতনা অজ্ঞানময়, যা আসে উপর থেকে তার যেন একটা ভুল transcription, যেন ভুল নকল বা ভুল অনুবাদ করতে চায়, নিজের মত গড়তে যায়, নিজের কল্পিত ভোগ বা বাহ্যিক স্বার্থে বা অহংভাবের তৃপ্তির দিকে ফিরাতে চেষ্টা করে। এই হচ্ছে মানব স্বভাবের দুর্ব্বলতা। ভগবানকে ভগবানের জন্যই চাহিতে হয়, নিজের চরিতার্থতার জন্য নয়। যখন psychic being ভিতরে সবল হয়, তখন এই সব বহিঃপ্রকৃতির দোষ কমে যেতে যেতে শেষে নির্ম্মল হয়ে যায়।

*

ইহা ত মানুষ মাত্রই করে—প্রশংসায় হৃষ্ট, নিন্দায় দুঃখিত হয়। কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। তবে সাধকের পক্ষে এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করাই নিতান্ত প্রয়োজন, স্তুতি-নিন্দায় মান-অপমানে অবিচলিত থাকবে। কিন্তু তাহা সহজে হয় না—সময়ে হবে।

*

ইহাই সত্য চেতনার অবস্থা ও দৃষ্টি, গভীরে থাকলে বা বাহিরের চৈতন্যে এলে ইহা যদি থাকে, তা হলে সব ঠিক এগিয়ে যাবে ভাগবত উদ্দেশ্যের দিকে।

*

এই যোগপথে মিথ্যাই হচ্ছে বড় অন্তরায়, কোন রকম মিথ্যাকে স্থান দিতে নেই—মনেও নয়, কথায়ও নয়, কার্য্যেও নয়।

*

তামসিক সমর্পণের সাথে তামসিক অহংকারের কোন সম্বন্ধ নাই। তামসিক অহংকার মানে "আমি পাপী, আমি দুর্ব্বল, আমার কোন উন্নতি হবে না, আমার সাধনা হতে পারে না, আমি দুঃখী, ভগবান আমাকে গ্রহণ করেন নি, মরণই আমার একমাত্র আশ্রয়, মা আমাকে ভালবাসেন না, আর সকলকে ভালবাসেন" ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবা। Vital nature এরকম নিজেকে হীন দেখিয়ে নিজেকে আঘাত করে। সকলের চেয়ে খারাপ দুঃখী দুষ্ট নিপীড়িত বলে দেখিয়ে অহংভাবকে চরিতার্থ করতে চায়—বিপরীত ভাবে। রাজসিক অহংকার ঠিক উলটো। আমি বড় ইত্যাদি বলে নিজেকে ফাঁপিয়ে দেখাতে চায়।

*

অজ্ঞান অহংকার ও বাসনাই হচ্ছে বাধা—মন প্রাণ দেহ যদি ঊর্ধ্বচৈতন্যের আধার হয় তাহলে এই ভাগবত জ্যোতি শরীরে নামতে পারবে।

*

মানুষের মনই অবিশ্বাস কল্পনা, ভুল চিন্তায়, অশ্রদ্ধায় ভরা, অজ্ঞানে ও দুঃখেও ভরা। সে অজ্ঞানই সে অশ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের বুদ্ধি অজ্ঞানের যন্ত্র; প্রায়ই ভুল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে আমারই চিন্তা সত্য। তার চিন্তায় ভুল আছে কি নাই আর ভুল কোথায় তা দেখে বিবেচনা করবার ইচ্ছাই তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকাবে লাগে, ক্রোধ হয় বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না। অথচ অপরের ভুল দোষ দেখাতে পারলে তার খুব তৃপ্তি হয়। পরের নিন্দা শুনলে সত্য বলে গ্রহণ করে অমনই, কতদূর সত্য তা বিবেচনাও করে না। এরূপ মনের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস সহজে হয় না। সেজন্য মানুষের কথা শুনতে নাই, তার প্রভাব নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে নাই। যদি শুনতে হয় আসল কথা, নিজের ভিতরে গিয়ে psychic being-কে জাগাতে হয়, তার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে সত্য বুদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও feeling হৃদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা প্রাণে উঠে, psychic-এর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নূতন দৃষ্টি পড়ে, মনের অজ্ঞান, ভুল দেখা, ভুল চিন্তা অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর আসে না।

*

হয়ত শরীরে ধ্যানের কিছু বাধা আছে, যাতে বসতে চায় না, তবে ইহাও অনেকের সাধনায় ঘটে যে সাধনা আপনা আপনি চলে। জোর করে বসে ধ্যান করা আর হয় না। কিন্তু বসতে হাঁটতে শুয়ে থাকতে ঘুমোতে পর্য্যন্ত সাধনা নামে।

*

বোধহয় বাহিরের স্পর্শ থেকে এইসব হয়েছে। এখন এই সব প্রাণের গোলমাল কয়েকজনের মধ্যে বার বার হচ্ছে। একজন থেকে গিয়ে আর এক-জনের মধ্যে যাচ্ছে একটা রোগের মত। বিশেষ এইভাব যে আমি মরব, আমি এই শরীর রাখব না, এই শরীরে আমার যোগ সাধনা হবে না, এটাই প্রবল। অথচ, এই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ হতে বিনা বাধায় যোগসিদ্ধ হব, এই ধারণা অত্যান্ত মিথ্যা। এই ভাবে দেহ ত্যাগ করলে পরজন্মে বরং আরো বাধা হবে, আর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবেই না। এই সব হচ্ছে বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ। তার উদ্দেশ্য সাধকের সাধনা ভেঙ্গে দিতে, মায়ের শরীরকে ভেঙ্গে দিতে, আশ্রমকে আর আমাদের কাজকে ভেঙ্গে দিতে। তুমি সাবধান হয়ে থাক। এই সব তোমার মধ্যে ঢুকতে দিও না।

বাইরের লোক আমাকে শাসন করে, আমার খুব লেগেছে, আমি মরে যাব,

এ হচ্ছে প্রাণের অহংকারের কথা, সাধকের কথা নয়। আমি তোমাকে সতর্ক করেছি, অহংকারকে স্থান দিও না। কেহ যদি কোন কথা বলে, অবিচলিত হয়ে শান্তমনে নিরহংকারভাবে থাক, মায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়ে।

*

মরে যাওয়ায় কোন মিটমাট হয় না। এই জন্মে যেসব বাধাকে নষ্ট না করলে, তুমি কি মনে কর আর জন্মে সেগুলো তোমাকে ছেড়ে দেবে? এই জন্মেই পরিষ্কার করতে হয়।

*

এই সব প্রাণের বৃথা বিলাপকে উঠতে দিলে কেমন করে অনুভূতি আসবে, এলেও কি করে টিঁকবে বা সফল হবে—এই প্রাণের কান্না শুধু অন্তরায় হয়ে যায়।

এই সব বিলাপ ও হাহুতাশের কথা যোগপন্থায় অগ্রসর হবার বাধা, আর কিছু নয়—শুধু প্রাণের একরকম তামসিক খেলা। এই সব ছেড়ে দিয়ে শান্ত-ভাবে সাধনা করলে শীঘ্র উন্নতি হয়।

*

যা দেখেছ তা সত্যই—তবে যাকে খারাপ শক্তি বল, সে সাধারণ প্রকৃতি মাত্র। সেই প্রকৃতিই মানুষকে প্রায় সব করায়—সাধনায় তার প্রভাব অতিক্রম করতে হয়—তবে সহজে হয় না,—দৃঢ় স্থির চেষ্টায় শেষে হয়ে যায় সম্পূর্ণ-রূপে।

*

যখন সাধক খাঁটি চেতনার মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করে তখনও অন্য অংশগুলি থাকে, তবে খাঁটি চেতনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলে।

*

খারাপ শক্তি ছাড়া কি এমন নীচে টানতে ও দুর্ব্বল ব্যতিব্যস্ত করে ফেলতে পারে? Atmosphere-এ এইরূপ শক্তি অনেক ঘুরছে সাধকরা আশ্রয় দেয় বলে। যদি আসে তোমার উপর, মাকে ডেকে প্রত্যাখ্যান করে দাও। কিছু করতে পারবে না, টিঁকতে পারবে না।

*

বাধা সহজে সম্পূর্ণ যায় না। খুলতে খুলতে, চেতনা বাড়তে বাড়তে শরীর-চেতনা পর্য্যন্ত যখন রূপান্তরিত হয় তখন বাধা সম্পূর্ণ চলে যায়। তার আগে কমে যাবে, বেরিয়ে যাবে, বাহিরে বাহিরে থাকবে,—তুমি বাধায় বিচলিত না হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখ। বাধাকে নিজের বলে আর স্বীকার করো না—তা হলে তার জোর কমে যাবে।

বাধা সকলের হয়—যারা কাজ করে না, তাদেরও বিশেষ জোরে বাধা আসে।

*

বহিঃপ্রকৃতি ছাড়ছে না বলে বাধা হচ্ছে, বহিঃপ্রকৃতির যখন নবজন্ম হবে তখন আর বাধা থাকবে না।

*

আমি এই সম্বন্ধে বারবার তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বাধা এক মুহূর্ত্তে যায় না—বাধা হচ্ছে সে-মানুষের বহিঃপ্রকৃতির স্বভাবের ফল—সে স্বভাব একদিনে বা অল্পদিনে বদলায় না—শ্রেষ্ঠ সাধকেরও নয়। তবে মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে শান্ত ধীরভাবে উৎকণ্ঠিত না হয়ে যদি মাকে সর্ব্বদা ডেকে এগিয়ে চল, বাধা এলেও কিছু করতে পারবে না—সময়ে তার জোর কমে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, আর থাকবে না।

*

এই বাধা সকলেরই আছে। প্রতি মুহূর্ত্তে যুক্ত হওয়া সহজে হয় না। ধীরভাবে সাধনা করতে করতে হয়ে যায়।

*

বাধা ত বিশেষ কিছু নয়, মানুষের বহিঃপ্রকৃতিতে যা থাকে তাই—সেগুলো মায়ের শক্তির working দ্বারা ক্রমে দূরীকৃত হবে। তার জন্য চিন্তিত বা দুঃখিত হবার কোন কারণ নাই।

*

মাকে সর্ব্বদা স্মরণ কর, মাকে ডাক তা হলে বাধা চলে যাবে। বাধাকে ভয় করো না বিচলিত হয়ো না—স্থির হয়ে মাকে ডাক।

*

বাধা অনন্ত appear করে বটে। সে appearance সত্য নয়, রাক্ষসী মায়া মাত্র—ঠিক পথে চলতে চলতে শেষে পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

*

কতকটা তাই, তবে বাধা কাউকে সহজে ছাড়ে না, খুব বড় যোগীকেও নয়। মনের বাধা অপেক্ষাকৃত সহজে ছাড়ান যায়, কিন্তু প্রাণের বাধা, শরীরের বাধা তত সহজে যায় না, সময় লাগে।

*

বড় বড় সাধককেও বাধা আক্রমণ করতে পারে, তাতে কি? Psychic অবস্থা থাকলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই সব আক্রমণের চেষ্টা বৃথা হয়ে যায়।

*

এই দুই বাধা সাধকের প্রায়ই থাকে। প্রথমটি প্রাণের, দ্বিতীয়টি শরীর-চেতনার—স্বতন্ত্র হয়ে থাকলে কমে গিয়ে শেষে আর থাকে না।

*

এই সব বাধা সকলেরই আসে, তা না হলে যোগসিদ্ধি অল্পদিনেই হয়ে যেত।

*

মানুষের প্রকৃতি ত সব সময় ভিতরে থাকতে পারে না—কিন্তু মাকে যখন ভিতরে বাহিরে সব অবস্থায় feel করতে পারা যায় তখন এই difficulty আর থাকে না। সেই অবস্থা আনবে।

*

অশুদ্ধ প্রকৃতিই সাধকের বাধার সৃষ্টি করে—কামভোগের ইচ্ছা, অজ্ঞানতা ইত্যাদি মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতিরই অন্তর্গত। ঐগুলি সকলেরই আছে- যখন আসে বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে নিজেকে পৃথক করে প্রত্যাখ্যান করতে হয়। যদি বল "আমি পাপী" ইত্যাদি তাতে দুর্ব্বলতাই বাড়ে। বলতে হয় "এই হচ্ছে মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতি। এইগুলি মানুষের সাধারণ জীবনে থাকে, থাকুক—আমি চাই না, আমি ভগবানকে চাই, ভগবতী মাকে চাই—এইগুলি আমার সত্য চেতনার জিনিষ নয়। যতদিন আসবে ততদিন স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করব—বিচলিত হব না, সায় দিব না।"

*

Sex force মানব মাত্রেরই আছে, সে impulse প্রকৃতির একটা প্রধান যন্ত্র যার দ্বারা সে মানুষকে চালায়। সংসার সমাজ পরিবার সৃষ্টি করে, প্রাণীর জীবন অনেকটা তার উপর নির্ভর করে। সে জন্যে সকলের মধ্যে sex impulse আছে। কেউ বাদ যায় না—সাধনা করলেও এই sex impulse ছাড়তে চায় না, সহজে ছাড়ে না, সে প্রাণ শরীরে প্রকৃতি রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে ফিরে আসে। তবে সাধক সাবধান হয়ে থাকে, সংযম করে, প্রত্যাখ্যান করে, যতবার আসে ততবার তাড়িয়ে দেয়—এই করে করে শেষে লুপ্ত হয়ে যায়।

*

স্থিরভাবে সাধনা করে চল—ক্রমে ক্রমে পুরাতন প্রকৃতির যা কিছু এখনও আছে আস্তে আস্তে চলে যাবে।

*

বাধা সকলের আছে, এমন সাধক নাই আশ্রমে যার বাধা নাই। ভিতরে স্থির হয়ে থাক, বাধার মধ্যেও সাহায্য পাবে, সত্য চৈতন্য সকল স্তরে ফুটবে।

*

প্রতিক্ষণ বাধার কথা, আমি খারাপ আমি খারাপ ইত্যাদি কথা চিন্তা করে চলা হচ্ছে তোমার প্রধান অন্তরায়।

শান্তভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে স্থিরভাবে সাধারণ প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে আস্তে আস্তে জয় করা—এইটি হচ্ছে একমাত্র পরিবর্ত্তনের উপায়।

*

সব বাধা ত বিরোধী শক্তির সৃষ্টি নয়—সাধারণ অশুদ্ধ প্রকৃতিরই সৃষ্টি, যা সকলের মধ্যেই আছে।

সত্তার অংশ

সত্তার কোন অংশ ত্যাগ করা যায় না, রূপান্তরিত করতে হয়। প্রকৃতির কোন বিশেষ গতি ত্যাগ করা যায়, সত্তার অংশগুলো স্থায়ী।

*

সাধনা করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে যেন স্বতন্ত্র দুটি সত্তা আছে, এক ভিতরের জিনিস নিয়ে থাকে, শান্ত বিশুদ্ধ ভাগবত সত্যের দৃষ্টি ও অনুভূতির মধ্যে থাকে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর একটি বাহিরের খুঁটি-নাটি নিয়ে ব্যস্ত। তারপরে দুটীর একটা ভাগবত ঐক্য স্থাপন করা হয়—ঊর্ধ্বজগৎ ও বহির্জগৎ এক হয়ে যায়।

*

সাধারণ মানুষের সামনের দিকই জাগ্রত—কিন্তু এই সামনের জাগ্রত চৈতন্য সত্যি-সত্যি জাগ্রত নয়, তা অবিদ্যাপূর্ণ, অজ্ঞ। তার পেছনে রয়েছে inner being-এর ক্ষেত্র—যে ভাবে রয়েছে, যেন ঘুমন্ত। কিন্তু এই আবরণটি খুললে এই পেছনের চৈতন্যই খোলা দেখা যায়, সেইখানেই আলো শক্তি শান্তি ইত্যাদি প্রথম নামে। যা বাহিরের জাগ্রত সত্তা করতে পারে না তা এই পেছনের ভেতরের সত্তা সহজে করতে পারে, ভগবানেব দিকে বিশ্বচৈতন্যের দিকে নিজেকে খুলে বিশাল মুক্তচৈতন্য হয়ে যেতে পারে।

*

এই সব আক্রমণ যদি ঢুকতে না পারে বা ঢুকেও টিকতে না পারে, বুঝতে হবে যে outer being-এর চেতনা জাগ্রত হয়েছে আর তার শুদ্ধি অনেকটা progress করেছে।

*

যখন অবচেতনা থেকে তমোভাব উঠে শরীরকে আক্রমণ করে, তখন এইরূপ অসুখের মতন করে—উপর থেকে মায়ের শক্তিকে শরীরের মধ্যে ডাক সব চলে যাবে।

*

অবচেতনার বাধা হতে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে প্রথম সেগুলোকে চিনে নেওয়া, তারপর সেগুলোকে reject করা, শেষে মায়ের ভিতরের বা উপরের আলো চেতনা শরীর চেতনার মধ্যে নামান। তা হলে অবচেতনায় ignorant movements কে তাড়িয়ে তার বদলে সে চেতনার movements স্থাপিত হবে। কিন্তু এ সহজে হয় না—ধৈর্য্যের সহিত করতে হবে—দৃঢ় patience চাই। মায়ের উপর ভরসাই সম্বল। তবে ভিতরে থাকতে

পারলে, ভিতরের দৃষ্টি ও চেতনা রাখতে পারলে তত কষ্ট ও পরিশ্রম হয় না—তা সব সময় পারা যায় না, তখন শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজন হয়।

*

যখন Physical consciousness প্রবল হয়ে আর সকলকে ঢেকে সমস্ত স্থান ছড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তখন এই রকম অবস্থা হয়—কারণ এই দেহ-চেতনার স্বতন্ত্র প্রকৃতি যখন প্রকাশ হয়, তখন সব বোধ হয় জড়-বন্ধ তমোময়, জ্ঞানের প্রকাশ রহিত, শক্তির প্রেরণা রহিত। এই অবস্থাতে সম্মতি দেবেনা—যদি আসে, মায়ের আলো ও শক্তিকে এই দেহ-চেতনার মধ্যে প্রবেশ করে আলোময় ও শক্তিময় করবার জন্য ডেকে আনবে।

*

Physical-এর কেন্দ্র মেরুদণ্ডের শেষভাগে, যাকে মূলাধার বলে, সেখানে—তবে প্রায়ই দেখা দেয়না, তার presence অনুভব করা যায়।

*

এ ত প্রাণময় পুরুষ, emotional vital-এ অধিষ্ঠিত। প্রাণময় পুরুষের তিনটি স্তর আছে—হৃদয়ে, নাভিতে, নাভির নীচে। হৃদয়ে সে হয় emotional being, নাভিতে বাসনাময়, নাভির নীচে sensational অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের টান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের ভাব নিয়ে ব্যস্ত।

*

আত্মাই এইরূপ অসীম বিরাট ইত্যাদি। ভিতরের মন প্রাণ physical consciousness যখন সম্পূর্ণরূপে খোলে তারাও তাই হয়—বাহিরের মন প্রাণ দেহ শুধু যন্ত্র, এই জগতের বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ও খেলার জন্য। বাহিরের মন প্রাণ দেহও যখন আলোময় চৈতন্যময় হয় তখন তারা আর সংকীর্ণ আবদ্ধ বলে বোধ হয় না। তারাও অন্তরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

*

মনের অনেক রকম গতি হয়, যাদের কোন সামঞ্জস্য নাই—সাধকেরও হয়, সাধারণ মানুষেরও হয়, সকলেরই হয়; তবে সাধক দেখে ও জানে, সাধারণ মানুষ নিজের ভিতর কি হচ্ছে তা বোঝে না। ভগবানের দিকে সব ফিরাতে ফিরাতে এক-মন হয়ে যায়।

*

সাধারণ মনের তিনটি স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা বুদ্ধির, ইচ্ছাশক্তির স্তর (বুদ্ধি-প্রেরিত will) আর বহির্গামী বুদ্ধি। উপরের মনেরও তিনটি স্তর আছে—higher mind, illumined mind, intuition,

মাথার মধ্যে যখন দেখছ, ওই সাধারণ মনের তিনটি স্তর হবে—উপরের দিকে খোলা, প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিশেষ ভাগবতী শক্তি কাজ করতে নামছে।

*

এই বিরাট অবস্থা মাথায় যখন হয়, ওর অর্থ মন বিশাল হয়ে বিশ্বমনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গলা ইত্যাদির বিরাট হওয়ার অর্থ—সেই সেই কেন্দ্রের যে চেতনা তাদেরও সেই অবস্থা আরম্ভ হচ্ছে।

*

Higher mind-এ বাস করা তত কঠিন নয়—চেতনা মাথার একটু উপরে যখন ওঠে তখন তাহা আরম্ভ হয়—কিন্তু Overmind-এ উঠতে অনেক সময় লাগে, খুব বড় সাধক না হলে হয় না। এই সব স্তরে বাস করলে মনের বাঁধন ভেঙ্গে যায়, চেতনা বিশাল হয়ে যায়, ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান কমে যায়, সবই এক, সকলই ভগবানের মধ্যে ইত্যাদি ভাগবত বা অধ্যাত্ম জ্ঞান সহজ হয়ে যায়।

*

সাধনা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারে। আগে ছিল ভিতরের সাধনায় সহজ ধ্যানের অবস্থা—এখন প্রয়োজন অন্তর বাহিরকে এক করা—দেহ-চেতনা পর্য্যন্ত।

*

জ্ঞান অনেক রকম আছে--চেতনা যেমন, জ্ঞানও তেমন। ঊর্ধ্বচেতনার জ্ঞান সত্য ও পরিষ্কার—নিম্ন-চেতনার জ্ঞান সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত, অপরিষ্কার। বুদ্ধির জ্ঞান একরকম, supramental চেতনার জ্ঞান আর একরকম, বুদ্ধির অতীত। শান্ত জ্ঞান ঊর্ধ্বচেতনার।

*

এই হচ্ছে ঊর্ধ্বচেতনার সোপান—এই চেতনার অনেক স্তর বা সমতল ভূমি, এই সোপানে ভূমির পর ভূমিতে উঠে শেষে অতিমানসে উঠে—ভগবানেব সীমাহীন আলোময় আনন্দময় অনন্তে।

*

উপরের এই জগৎ হচ্ছে ঊর্ধ্বচৈতন্যের ভূমি (plane), আমাদের যোগ-সাধনার দ্বারা নামছে। পার্থিব জগৎ আজকাল বিরোধী প্রাণজগতের তাণ্ডব-নৃত্যে পূর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ।

*

Psychic being ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান, আর সে-টান বাসনাশূন্য, দাবী নাই, নীচ কামনা নাই। Psychic emotion পবিত্র নির্ম্মল। Emotional vital-এর অংশ—বাসনা, দাবী, অহংকার,

অভিমান ইত্যাদি যথেষ্ট আছে, ভগবানকে চায় নিজের অহংকার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে—তবে Psychic-এর স্পর্শে শুদ্ধ পবিত্র হতে পারে।

*

Psychic সত্তা মন প্রাণ দেহের পিছনে আর এই তিনটিকেই স্পর্শ করে থাকে। মনের ওই ধারে অধ্যাত্ম সত্তা ও ঊর্ধ্বচেতনা।

*

পিছন দিকে psychic being-এর স্থান, আর সেখানে যত কেন্দ্র,—যেমন হৃদ্‌কেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্র, শরীরকেন্দ্র, সেখানে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেখানে তাদের প্রতিষ্ঠার স্থান। এই জন্য এই পিছনের দিকটার চেতনার অবস্থা বড় important.

*

সবই নির্ভর করে psychic-এর প্রাধান্যের উপর—বহিঃপ্রকৃতি ক্ষুদ্র অহংকার আর বাসনা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্যস্ত; মানস পুরুষ আত্মা নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু ক্ষুদ্র অহমের তাতে কোন তৃপ্তি নাই, ক্ষুদ্রত্বকেই চায়। Psychic ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত, সমর্পণ তারই কাজ—এক Psychic-ই বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করতে পারে।

*

হয় psychic আধারের নিয়ামক (ruler, চালক, পথপ্রদর্শক) হয়ে বুদ্ধি মন প্রাণ শরীর-চেতনাকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করবে, নয় ঊর্ধ্ব-চৈতন্য শরীর-চেতনা পর্যন্ত নেমে সমস্ত আধারকে দখল করবে, তাহলে স্থূল চেতনায় শক্ত ভিত্তি হয়ে যাবে।

*

যা খুলেছে তা psychic আর heart-এর consciousness—উপর হতে আসছে higher mind-এর ও ভাগবত চেতনার আলো ও শান্তি। যা চাঁদের মত উঠছে, তা psychic থেকে আধ্যাত্মিক aspiration-এর স্রোত।

*

তাহাই চাই—হৃদয়পদ্ম খোলা, সমস্ত nature হৃদয়স্থ psychic being-এর বশ হওয়া, এতেই নবজন্ম হয়।

যোগের ভিত্তি

সংযম—প্রকৃতির শুদ্ধি—শান্তি ও সমর্পণ

নিজেকে সংযত করে রাখা—কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়া, কারও vital টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নিজেও তার উপর কিছু ফেলবেনা vital মোহ বা আকর্ষণ—ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা।

*

পাপের কথা কেন—পাপ নয়, মানুষের দুর্ব্বলতা। আত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধ (চৈত্যপুরুষও) শুদ্ধ. সাধনা দ্বারা অন্তরতাও (inner mind, vital, psychic being) শুদ্ধ হতে পারে, অথচ external being, বহিঃসত্তা বহিঃপ্রকৃতিতে সেই চরিত্রের পুরাতন দুর্ব্বলতা অনেকদিন লেগে থাকতে পারে, সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা কঠিন। চাই complete sincerity, চাই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য, চাই সদাজাগ্রত ভাব। Psychic being যদি সামনে থাকে, সর্ব্বদা জেগে থাকে, প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে ভয় নাই, কিন্তু তা সব সময়ে হয়না। রাক্ষসী মায়া সেই পুরাণো weak point-দের ধরে মনকে ভুলিয়ে প্রবেশ করবার পথ পায়। প্রত্যেকবার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পথ রোধ করতে হয়।

*

প্রাণকে ধ্বংস করতে নাই, প্রাণ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না, জীবনও থাকে না, প্রাণকে রূপান্তর দিতে হয়, ভগবানের যন্ত্র করতে হয়।

*

নিজের ভিতরে শান্তি, মায়ের শক্তি ও আলো রেখে শান্তভাবে সব কর—তাহলে আর কিছুর দরকার নাই—সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

*

দুই বিপরীত প্রভাবের দ্বন্দ্ব—সত্যশক্তির প্রভাব যখন দেহকে স্পর্শ করে তখন সব সুস্থ হয়ে যায়—অবিদ্যার প্রভাবে রোগ ব্যথা স্নায়বিক বিকার ফিরে আসে।

*

অবিদ্যার মধ্যে যা থাকে সে-সব এক বিশ্ব-চৈতন্যের মধ্যেই থাকে আলো অন্ধকারের মত, তাই বলে আলো অন্ধকার সবই যে সমান তা নয়। অন্ধকারকে বর্জ্জন করবে, আলোকে বরণ করতে হবে।

*

কোন নিয়ম পালন করে হয়না। স্থির শান্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে প্রত্যাখ্যান করলে অল্পে অল্পে অবিদ্যার প্রভাব চলে যায়। উতলা হলে (বিব্রত হয়ে অন্ধ হয়ে হতাশ হয়ে) অবিদ্যাশক্তি আরও জোর পেয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায়।

*

বাধা সহজে যায় না। খুব বড় সাধকেরও "আজই" এক মুহূর্ত্তে সব বাধা সরে যায় না। আমি ইহাও অনেকবার বলেছি যে শান্ত অচঞ্চল হয়ে মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে এগুতে হয়—এক মুহূর্ত্তে হয় না। আজই সব চাই এইরূপ দাবি করলে আরও বাধা হয়। ধীর স্থির হয়ে থাকতে হয়।

*

Psychic-এর পিছনে, psychic অবস্থার পিছনে অহংকার থাকতে পারে না। তবে প্রাণ থেকে অহংকার এসে তার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করতে পারে। যদি ওই রকম কিছু দেখ তা হলে তা গ্রহণ না করে মায়ের কাছে সমর্পণ করবে ত্যাগ করবার জন্য।

*

সোজা রাস্তা psychic-এর পথ, সমর্পণের বলে ও সত্য দৃষ্টির আলোতে বিনা বাঁকে উপরে চলে যায়—যা একটু সোজা একটু ঘুরানো তা হচ্ছে মানসিক তপস্যার পথ, আর একেবারে ঘুরানো যা তা হচ্ছে প্রাণেব পথ, আকাঙ্ক্ষা বাসনায় পূর্ণ, জ্ঞানও নাই, তবে প্রাণের সত্য চাওয়া আছে বলে কোন রকমে যাওয়া যায়।

*

প্রথম, চেতনা শূন্য ও বিশাল চাই, তার মধ্যে উপরের আলো শক্তি ইত্যাদি স্থায়ীভাবে স্থান পেতে পারে—খালি না হলে পুরাণো movements-ই খেলে, উপরের জিনিস সুবিধার মত স্থান পায়না।

*

এইরূপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন ঊর্দ্ধ্বের চেতনা নেমে মন প্রাণকে অধিকার করবার জন্য তৈয়ারী করছে, আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার প্রথম স্পর্শে একটি বিশাল শান্ত শূন্যতাই হয়, তারপর সে-শূন্যতার মধ্যে একটি বিশাল গাঢ় শান্তি নীরবতা, স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে।

*

শুধু ঊর্দ্ধ্বে যাওয়ায় এ-যোগের সিদ্ধি হয় না—ঊর্দ্ধ্বের সত্য শান্তি আলো ইত্যাদি নেমে মন প্রাণ দেহে প্রতিষ্ঠিত হলেই সিদ্ধি হয়।

যদি ঊর্দ্ধ্বচৈতন্য নামে আর তুমি মন প্রাণ দেহের সব মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠা হবে।

*

একেবারে নীরব হওয়া চলে না, ভালও নয়। তবে প্রথম অবস্থায় যত-দূর সম্ভব নীরব গম্ভীর হওয়া সাধনার অনুকূল অবস্থা—যখন বাঁহিরের

প্রকৃতি মাতৃময় হয়ে যাবে, তখন কথা বলা হাসি ইত্যাদিতেও সত্য চেতনা থাকবে।

*

উপরের চৈতন্যের স্পর্শ—সেই উপরের চৈতন্যের ভাব, শান্তি, জ্ঞান. গভীরতার অবতরণই যোগসিদ্ধির উপায়। প্রাণকে সংযত করে সেই শক্তিকেই মন প্রাণ দেহকে অধিকার করতে দিতে হবে।

*

এ ঘুমের অবস্থা বড়ই ভাল। ঘুম এইরূপ সচেতন হওয়া চাই।

*

যখন ঘুম সচেতন হয় তখন এইরূপই হয়—যেমন জাগ্রতে তেমনই ঘুমে সাধনা অনবরত চলে।

*

জাগ্রত অবস্থাতেই সব নামান, সব ভাগবত অনুভূতি পাওয়া এ যোগেব নিয়ম। অবশ্য প্রথম অবস্থায় ধ্যানই বেশী হয় আর শেষ পর্য্যন্ত উপকারী হতে পারে—কিন্তু শুধু ধ্যানে অনুভূতি হলে সমস্ত সত্তার রূপান্তর হয়না। জাগ্রতে হওয়া সেজন্য খুব ভাল লক্ষণ।

*

প্রথম শান্তি আসে, সমস্ত আধার শান্ত না হলে জ্ঞান আসা কঠিন, শান্তি স্থাপিত হলে মায়ের বিশাল অনন্ত চৈতন্য আসে, তার মধ্যে ডুবে আমিত্ব মগ্ন হয়ে যায়, লুপ্ত হয়—শেষে আর চিহ্ন থাকে না। থাকে কেবল মা ও মায়ের সনাতন অংশ ভাগবত অনন্তের মধ্যে।

*

ইহা খুব ভাল। এইটি হচ্ছে আসল অনুভূতি। এই শান্তি যখন সমস্ত আধারে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, আর দৃঢ় নিরেট স্থায়ী হয় তখনই ভাগবত চেতনার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়।

*

শরীরের স্নায়বিক ভাগে (nervous system-এ) শান্তি ও শক্তি নামান, এই ছাড়া উপায় নাই nerves-কে সবল করবার।

*

ভিতর থেকে যা বলা হয়েছে তা সত্যই। বহিশ্চেতনার অজ্ঞানে থেকে কেবল ভুল-ভ্রান্তি মিথ্যা কষ্ট হয়, সেখানে সব ক্ষুদ্র অহমের খেলা! ভিতরেই থাকতে হয়—আসল সত্য চেতনা সত্য ভাব সত্যদৃষ্টি যার মধ্যে,

অহংকার অভিমান বাসনার দাবীর লেশ মাত্র থাকবে না, তাহাই grow করতে দাও, তখন মায়ের চৈতন্য তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব প্রকৃতির অহংকার বিরোধ বিভ্রাট আর থাকবে না।

*

বাধার কথা লোকে যত বেশী ভাবে, বাধা বেশী জোর করে তাদের উপর। ভগবানের কথা বেশী ভাবতে হয় মায়ের কাছে নিজেকে খুলে,--আলো শান্তি আনন্দের কথা।

*

এই অসীম শান্তি যতই বাড়ে ততই ভাল। শান্তিই যোগের প্রতিষ্ঠা।

*

যখন শূন্য অবস্থা হয়, তখন শান্ত হয়ে মাকে ডাক। শূন্য অবস্থা সকলেরই হয় তবে শান্ত শূন্য অবস্থা হলে সাধনার উপকারী হয়—অশান্ত হলে তার ফল হয় না।

অভিজ্ঞতা; অনুভূতি ও উপলব্ধি

অভিজ্ঞতা বাজে নয়—তাদের স্থান আছে, অর্থাৎ অনুভূতি prepare (তৈরী) করে, আধারকে খুলে দেবার সাহায্য করে, অন্য জগতের, নানা স্তরের জ্ঞান দেয়। আসল অনুভূতি ভাগবত শান্তি, সমতা, আলো, জ্ঞান, পবিত্রতা, বিশালতা, ভাগবত সান্নিধ্য, আত্মার উপলব্ধি, ভাগবত-আনন্দ, বিশ্ব-চৈতন্যের উপলব্ধি (যাতে অহংকার নষ্ট হয়), নির্ম্মল বাসনাশূন্য ভাগবত প্রেম, সর্ব্বত্র ভাগবত দর্শন, ইত্যাদির সম্যক অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা। এই সকল অনুভূতির প্রথম সোপান হচ্ছে উপরের শান্তির অবতরণ আর সমস্ত আধারে ও আধারের চারিদিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

*

এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য আছে, সত্য আছে—তাতে সাধনার উন্নতি হয়। তবে এগুলো যথেষ্ট নয়—চাই অনুভূতি, ভাগবত শান্তি, সমতা, পবিত্রতা, ঊর্দ্ধের চৈতন্য জ্ঞান শক্তি আনন্দের অবতরণ, প্রতিষ্ঠা—এটাই আসল।

*

গাছের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে—গাছগুলির সঙ্গে ভাবের বিনিময় সহজে হয়।

*

এই অনুভূতি খুব ভাল। প্রণামে মা ভিতর থেকে দিচ্ছেন, তাই feel করতে হয়—শুধু বাহিরের appearance দেখে লোকে কত ভুল বুঝে ভিতরের দান নিতে ভুলে যায় বা নিতে পারে না।

*

হীরার আলো ত মায়েরই আলো, at its strongest, এইরূপ মায়ের শরীর হতে বেরিয়ে সাধকের উপর পড়া খুব স্বাভাবিক, সাধক যদি ভাল অবস্থায় থাকে।

*

না, এ কল্পনা বা মিথ্যা নয়—উপরের মন্দির ঊর্দ্ধ-চেতনার, নীচের মন্দির এই মন প্রাণ শরীরের রূপান্তরিত চেতনা—মা নীচে নেমে এই মন্দির সৃষ্টি করেছেন আর সেখান থেকে সত্যের প্রভাব সর্ব্বত্র তোমার মধ্যে বিস্তার কচ্ছেন।

*

ভাল, এইরূপ করে ঊর্দ্ধচেতনা নামান চাই, শান্ত বিশ্বময় ভাব নিয়ে প্রথম মাথায়, (মানসক্ষেত্রে তার পর হৃদয়ে emotional vital ও psychic-এ)

তারপরে নাভিতে ও নাভির নীচে (vital-এ), শেষে সমস্ত physical-কে ব্যাপ্ত করে।

*

এই change (পিছনের দিকে) খুব ভাল, অনেকবার পিছন থেকে এই ধরণের আক্রমণ আসে, কিন্তু মায়ের শক্তি ও চৈতন্য সেখানে থাকলে আর প্রবেশ করতে পারে না। সাদা পদ্মের অর্থ এই যে সেখানে মায়ের চৈতন্য প্রকাশ হচ্ছে।

*

মাথায় এইরূপ হওয়ার অর্থ এই যে মন সম্পূর্ণ খুলেছে ও উপরের চেতনা গ্রহণ করেছে।

*

ইহাই চাই—বাহিরের জিনিষ ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে এক হওয়া, ভিতরের ভাবকে গ্রহণ করা।

*

দেহকে এইরূপ দেখা ভাল। তবে দেহের মধ্যে চৈতন্য আবন্ধ না থাকলে ও চৈতন্য বিশাল অসীম হয়ে গেলেও দেহকে চৈতন্যের অংশ ও মায়ের যন্ত্র বলে স্বীকার করতে হয়, শারীর চৈতন্যও রূপান্তর করতে হয়।

*

ইহা খুব ভাল লক্ষণ, এ নিম্নচেতনাই উঠে যাচ্ছে ঊর্ধ্বচেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। উপরের চেতনাও নামছে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

*

ইহা তোমার আজ্ঞাচক্র অর্থাৎ ভিতরের বুদ্ধি চিন্তা দৃষ্টি ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্র—সে এখন pressure-এর দরুন এমন খুলে গেছে জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে যে ঊর্ধ্ব-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় আর ঊর্ধ্ব-চেতনার প্রভাব সমস্ত আধারের উপর বিস্তার করে।

*

মাথার উপরেই আছে ঊর্ধ্বচেতনার স্থান, ঠিক মাথার উপরে সে আরম্ভ হয় আর সেখান থেকে উঠে আরও উপরে অনন্তে। সেখানে যে বিশাল শান্তি ও নীরবতা আছে তারই Presence তুমি অনুভব কর। সে শান্তি ও চেতনা সমস্ত আধারে নামা চাই।

*

বড় স্তরটী অধ্যাত্ম চেতনা হবে, তার মধ্যে সত্যের মন্দির, তোমার vital-

এর সঙ্গে এই স্তরের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, ঊর্দ্ধের শক্তি vital-এ ওঠা-নামা করছে যেন সেতু দিয়ে।

*

অনেকের কুণ্ডলিনীর জাগরণের অনুভূতি হয় না, কয়েকজনের হয়—এই জাগরণের উদ্দেশ্য সকল স্তর খুলে দেওয়া আর ঊর্দ্ধ-চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করা, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও হয়।

*

মায়ের মধ্যে থেকেই একটী emanation অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও চেতনার অংশ, প্রতিকৃতি ও প্রতিনিধি হয়ে প্রত্যেক সাধকের কাছে একজন বেরিয়ে আসেন বা থাকেন তাকে সাহায্য করবার জন্যে—প্রকৃত পক্ষে মা-ই সেই রূপ ধরে আসেন।

*

যে বিশালতা অনুভব করছ তার মধ্যে ঊর্দ্ধে বাস করতে হবে, ভিতরে গভীরেই তারই মধ্যে বাস করতে হবে—কিন্তু ইহা ছাড়া সর্ব্বত্র প্রকৃতির মধ্যে, এমন কি নিম্নপ্রকৃতির মধ্যেও সে বিশালতা নামা চাই। তখন নিম্নপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কারণ এই বিশালতা মায়ের চৈতন্যের বিশালতা—সংকীর্ণ নিম্নপ্রকৃতি যখন মায়ের চৈতন্যের মধ্যে বিশাল মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে মূল পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হতে পারবে।

*

অনুভূতিকে যদি ব্যক্ত করি কথায় বা লেখায় তখন সে কমে যায় বা থেমে যায়, এইত অনেকের হয়। যোগীরা প্রায়ই সে জন্য কারুকে নিজের অনুভূতি কখন বলে না, অথবা সব দৃঢ় হয়ে গেলে তার পর বলে। তবে গুরুর কাছে, মায়ের কাছে বল্লে কমবে না, বাড়বে। বলার এই অভ্যাস স্থাপন করা উচিত।

*

বালকটি হৃদয়স্থ ভগবান আর শক্তি ত মা-ই হবেন।

*

চক্র ঘুরছে, মানে outer being-এর মধ্যে মায়ের শক্তির কাজ চলছে—তার রূপান্তর হবে।

*

অনুভূতি যখন হয় তখন অবিশ্বাস না করে গ্রহণ করা ভাল। ইহা ছিল সত্য অনুভূতি—উপযুক্ত অনুপযুক্তের কথা হচ্ছে না, সাধনায় এই সব কথার বিশেষ কোন অর্থ নাই, মায়ের কাছে খুলতে পারলেই সব হয়।

মাথায় যা অনুভব কর তা বাহিরের মন (physical mind) আর নাভির নীচ থেকে যা অনুভব কর তাহা (lower vital) নিম্ন প্রাণ।

*

এইরূপ মায়ের মধ্যে মিশে যাওয়া প্রকৃত মুক্তির লক্ষণ।

*

এইরূপ শরীরে মায়ের আলো ভরে গেলে physical চেতনার রূপান্তর সম্ভব হয়।

*

এই অনুভূতিটি খুব সুন্দর ও সত্য—প্রত্যেক আধার এমনই মন্দির হওয়া চাই। যা শুনেছ যে মা-ই সব করবেন, শুধু তাঁর মধ্যে ডুবে থাকা চাই, ইহাও খুব বড় সত্য।

*

যে বালিকাদের কথা লিখেছ তারা মায়ের শক্তি নানা স্তরে। তোমার অভিজ্ঞতাগুলি বেশ ভাল—অবস্থাও ভাল—সাধনা ভাল চলছে—বাধাগুলো আসে বহিঃপ্রকৃতি থেকে অবস্থা disturb করবার জন্য—গ্রহণ করো না।

*

কল্পনা নয়। মায়ের অনেক personality আছে, সেগুলো প্রত্যেকের different রূপ, সে-সব সময়ে সময়ে মায়ের শরীরে ব্যক্ত হয়। শাড়ীর রং যেমন, মা সে রঙের আলো বা শক্তি নিয়ে আসেন। কারণ প্রত্যেক রং এক একটা শক্তির (force-এর) দ্যোতক।

*

যা দেখেছ তা সম্পূর্ণ সত্য। এই গলার মধ্যে সত্তার একটা কেন্দ্র আছে। সে হচ্ছে externalising mind or physical mental-এর কেন্দ্র, অর্থাৎ যে মন বুদ্ধির সব খেলাকে বাহিরে আকৃতি দেয়, যে মন speech-এর অধিষ্ঠাতা, যে মন physical সব দেখে, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মাথার নিম্নভাগ আর মুখ তার অধিকারে রয়েছে। এই মন যদি উপরের চেতনা বা ভিতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, এগুলোকে ব্যক্ত করে, তবে ভাল। কিন্তু তার আরো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—নিম্ন অংশের সঙ্গে, lower vital ও physical consciousness (যার কেন্দ্র মূলাধার) যে তার সঙ্গে। এইজন্য এরকম হয়। সেই জন্যে বাক্যকে সংযত করা সাধনার বড় প্রয়োজন, যাতে সে উপরের ও ভিতরের চেতনাকে ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হয়, নিম্নের বা বাহিরের চেতনাকে নয়।

*

এই নীচে নামা শারীরিক চেতনার সকল সাধকেরই হয়—না নামলে সে চেতনার রূপান্তর হওয়া কঠিন।

*

এটা খুব বড় opening সূর্য্যের জ্যোতি যে নামছে—সে সত্যের জ্যোতি —সে সত্য ঊর্দ্ধ্ব মনেরও অনেক উপরে।

*

চেতনা ঊর্দ্ধ্বের সত্যের দিকে খুলছে। স্বর্ণময়ূর—সত্যের জয়। মায়ের শক্তি physical পর্য্যন্ত নামছে—তার ফলে সত্যের আলো (সোনালী আলো) নামছে আর তুমি মায়ের দিকে শীঘ্র এগিয়ে চলছ।

*

শরীরের পেছনে অংশ সব চেয়ে অচেতন—প্রায়ই সবশেষে আলোকিত হয়। তুমি যা দেখেছ, তা সত্য।

*

হাঁ, তুমি নির্ভুল দেখেছ—মাথার উপর সাতটি পদ্ম বা চক্র আছে তবে ঊর্দ্ধ্ব মন না খুললে এগুলো দেখা যায় না।

*

উপরে খুব বড় একটি যে আছে সে ঊর্দ্ধ্ব চেতনার অসীম বিশালতা। তুমি যে অনুভব করছ যে মাথা যে ঘুরে ঘুরে নেমে আসে সে ত স্থূল মাথা অবশ্য নয় কিন্তু মন-বুদ্ধি। সে ওই বিশালতার মধ্যে উঠে সেইভাবে নামে।

*

দুরকম শূন্য অবস্থা হয়—physical তামসিক জড় নিশ্চেষ্টতা ভিতরে আর একটা শূন্যতা নিশ্চেষ্টতা হয় ঊর্দ্ধ্ব চেতনার বিরাট শান্তি ও আত্মবোধ নামবার আগে। এই দুটোর মধ্যে কোনটি এসেছে তা দেখতে হবে, কারণ দুটোতেই সব থেমে যায়, ভিতরের চেতনা শূন্য হয়ে পড়ে থাকে।

*

মহেশ্বরীর দান শান্তি সমতা মুক্তির বিশালতা—তোমার এই সব বিশেষ দরকার আছে বলে তিনি তোমার আহ্বানে দেখা দেন।

*

এ হচ্ছে তোমার ভিতরের মন আর মায়ের ভিতরের মনের যোগ—কপালে এই মনের centre—সে যোগ যখন হয় তখন সেই ভিতরের মনে ভগবৎ সত্যের দিকে একটা আকর্ষণ হয় আর উঠতে আরম্ভ করে।

*

সব সময় ভাল অবস্থা, সব সময় ভিতরে মায়ের দর্শন শ্রেষ্ঠ সাধকদেরও হয় না—সে হবে সাধনার পাকা অবস্থায়, সিদ্ধির অবস্থায়। সকলের হয় মাঝে মাঝে ভরা অবস্থা মাঝে মাঝে শূন্য অবস্থা। শূন্য অবস্থায়ও শান্ত হয়ে থাকা উচিত।

মায়ের উপর নির্ভর

কতদূরে এসেছি, আর কতদূরে এই সব প্রশ্নের বিশেষ কোনও লাভ নাই। মাকে কাণ্ডারী করে স্রোতে এগিয়ে চল, তিনি তোমাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন।

*

মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে—তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপনিই ফুটে যায়।

*

মায়ের ভাব ত বদলায় না—একই থাকে। তবে সাধকের নিজের মনের ভাবের মত দেখে যে বদলে গেছে—কিন্তু তা সত্য নয়।

*

ধ্বংস হলে পরিবর্ত্তন কিসে হবে? প্রাণের শরীরের পুরাতন প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে হবে, প্রাণকে শরীরকে নয়।

*

এ কথা সত্য যে সকলের মধ্যে মা আছেন ও তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকা চাই, তবে সে সম্বন্ধে personal নয় সে লোকের সঙ্গে, কিন্তু মারই সঙ্গে একটা বিশাল ঐক্যের সম্বন্ধ।

*

একদিকে শান্তি ও সত্য চেতনার বৃদ্ধি, আর দিকে সমর্পণ, ইহাই হচ্ছে সত্য পথ।

*

প্রাণকে ধ্বংস করবার ইচ্ছা ভুল ইচ্ছা—প্রাণকে ধ্বংস করলে শরীর বাঁচবে না, শরীর না বাঁচলে সাধনা করা যায় না।

তুমি বোধ হয় বড় বেশী শক্তি টেনেছ—সে জন্য শরীর ঠিক ধারণ করতে পাচ্ছে না। একটু শান্ত হয়ে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

*

মা ভগবান ছাড়া তুমি নও—মা ত তোমার সঙ্গেই আছেন—সাধক পাতালে নামে সেখানে উপরের আলো ও চেতনা আনবার জন্য—এই বিশ্বাস রেখে ধীরচিত্তে চল, সে আলো সে চেতনা নামবেই।

*

মা ত আছেন তোমার ভিতরে। যে পর্দ্দা পড়েছে physical প্রকৃতির, তারই উপর শক্তির কাজ করা হচ্ছে, সে মায়ের আলোকে শেষে transparent হয়ে যাবে।

*

মায়ের জয় হবেই এই বিশ্বাস সব সময় রেখে শান্ত ধীর, ভয়শূন্য হয়ে সাধনা করতে হয়।

*

পুরুষ কিছুই করেন না, প্রকৃতি বা শক্তিই সব করেন। তবে পুরুষের ইচ্ছা না হলে কিছুই হতে পারে না।

*

শরীরে মা ত আছেনই—গূঢ় চেতনায়—কিন্তু যতদিন বাহির-চেতনায় অবিদ্যার ছাপ থাকে, অবিদ্যার ফলগুলো এক মুহূর্তে দূরীভূত হয় না।

*

মা তোমাকে চান আর তুমি মাকে চাও। মাকে তুমি পাচ্ছ এবং আরও পাবে। তবে হয়ত তোমার physical consciousness-এ একটা আকাঙ্ক্ষা আসতে পারে মাঝে মাঝে যে মায়ের বাহিরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শারীরিক সান্নিধ্য ইত্যাদি থাকা চাই। মা ওসব দিচ্ছেন না কেন, মা হয়ত আমাকে চান না। কিন্তু জীবনের ও সাধনার এই অবস্থায় তাহা হতে পারে না; এমন কি তাহা দিলে সাধক তাতে মজবে আর ভিতরের আসল সাধনা ও রূপান্তর হবে না। চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সান্নিধ্য এবং চাই রূপান্তর—বাহিরের মন প্রাণ দেহ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি করবে ও রূপান্তর হবে। ইহাই মনে রেখে চল।

*

যদি মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি থাকে নির্ভর থাকে, তা হলে মাকে পাওয়া যায়। না থাকলে তীব্র চেষ্টা দ্বারাও পাওয়া যায় না।

*

এ সব হচ্ছে বাহিরের প্রকৃতি যা সাধকের চারিদিকে ঘোরে (ঘুরে বেড়ায়) প্রবেশ করবার জন্য। নিজের মন প্রাণ দেহ এই বাহিরের প্রকৃতির কবলে থাকলে সেই রূপ পর্দ্দা হয় বটে, কিন্তু মায়ের উপর নির্ভর করলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে, মায়ের শক্তি সে পর্দ্দা সরিয়ে মন প্রাণ দেহ-চেতনাকে মায়ের যন্ত্রে পরিণত করবে।

*

এই সময় physical consciousness-এর উপর শক্তি কাজ করছে, সেই জন্য অনেকের এই physical consciousness-এর বাধা প্রবলভাবে উঠেছিল —তোমার চঞ্চলতার কারণ এই যে এই বাহিরের physical consciousness-এর সঙ্গে নিজেকে identify করেছিলে, যেন সে চেতনাই তুমি। কিন্তু আসল সত্তা ভিতরে যেখানে মায়ের সঙ্গে সংযোগ থাকে। সেইজন্য physical consciousness-এর অজ্ঞান তামসিকতা ভুল-বোঝা ইত্যাদি নিজের বলে

গ্রহণ করতে নেই, যেন বাহিরের যন্ত্র; সেই যন্ত্রের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব মায়ের শক্তি সারিয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে সাক্ষীর মত অবিচলিত হয়ে দেখতে হয়—মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রেখে।

*

মায়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যার আছে, সে সব সময় মায়ের কোলে, মায়ের মধ্যে থাকে। বাধা উঠতে পারে, কিন্তু হাজার বাধা তাকে বিচলিত করতে পারে না। সে বিশ্বাস সে শ্রদ্ধা সব সময়, সব অবস্থায়, সব ঘটনায় অটুট রাখা, এ হল যোগের মূল কথা, আর সব গৌণ, এটাই হচ্ছে আসল।

*

এসব বিলাপ ও আক্রোশ তামসিক অহংকারের লক্ষণ—আমি পারি না, আমি মরব, আমি চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘনিয়ে এসে তামসিক অহংকারকে বাড়িয়ে দেয়, এতে সাধনার কোন উন্নতির সাহায্য হয় না। আমি একথা তোমাকে বার বার লিখেছিলাম, আসল কথা আর একবার লিখি। তোমার সাধনা নষ্ট হয়নি, যা পেয়েছিলে তাও চলে যায়নি, পর্দ্দার পিছনে পড়েছে শুধু। সাধনার পথে একটা সময় আসে যখন চেতনা একেবারে physical plane-এ নেমে যায়। তখন ভিতরের সত্তার উপর, ভিতরের অনুভূতির উপর একটা অপ্রবৃত্তির ও অপ্রকাশের পর্দ্দা পড়ে, এমন বোধ হয় যে সাধনা আর কিছুই নাই, aspiration নাই, অনুভূতি নাই, মায়ের সান্নিধ্য নাই, একেবারে সাধারণ মানুষের মত হয়েছি। এই অবস্থা যে শুধু তোমারই হয়েছে তা নয়, সকলের হয় বা হয়েছে, বা হবে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাধকেরও হয়। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে এই যে এটা সাধন পথের একটা passage মাত্র, যদিও বড় দীর্ঘ passage। এ অবস্থায় না নামলে পুরো রূপান্তর হয় না। এই ভূমিতে নেমে সেখানে স্থির হয়ে মায়ের শক্তির খেলা, রূপান্তরের কাজ ডেকে আনতে হয়, আস্তে আস্তে সব cleared হয়ে যায়, অপ্রকাশের বদলে দিব্য প্রকাশ হয়, অপ্রবৃত্তির বদলে দিব্য লীলা ও অনুভূতির প্রকাশ হয়, শুধু ভিতরে নয়, বাহিরে, শুধু উচ্চ ভূমিতে নয়, নিম্ন ভূমিতে, শরীর চেতনায়, অবচেতনায়ও হয়। আর যে সব অনুভূতির উপর পর্দ্দা পড়েছিল, সেগুলো বেরিয়ে আসে, এই সব ভূমিকেও অধিকার করে। কিন্তু সহজে শীঘ্র হয় না, আস্তে আস্তে হয়—ধৈর্য্য চাই, মায়ের উপর বিশ্বাস চাই, দীর্ঘকালব্যাপী সহিষ্ণুতা চাই। যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যে সাধনা চায়, তাকে সাধনার পথের কষ্ট বাধা বিপরীত-অবস্থাকে সহ্য করতে হয়। শুধু সাধনায় সুখ ও বিলাস চাইলে চলবে না, বাধা আছে বলে, বিপরীত অবস্থা আসে বলে কেবল কান্নাকাটি ও নিরাশা পোষণ করলে চলবে

না। তাতে পথ আরও দীর্ঘ হয়। ধৈর্য্য চাই, শ্রদ্ধা চাই, মায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর চাই।

*

এই কথা, মাকে প্রথম পেতে হবে ভিতর থেকে, বাহির থেকে নয়—বাহির থেকে পেতে গেলে, তাও হয়, ভিতরটাও কখনও তার সান্নিধ্য দ্বারা আলোকিত হয় না। ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে পেলে তার পরে বাহিরটাতে যা আবশ্যক তা realised হতে পারে। এই সত্য দু'একজন ছাড়া কেহ এখনও ভাল করে বুঝতে পারেনি।

*

মায়ের সঙ্গেই যখন ভিতরে সংযোগ হয়েছে তখন আর ভয় নাই। যা পরিবর্ত্তন করতে হয়, তা মায়ের শক্তিই করে দেবে। ওসব পরিবর্ত্তন করতে সময় লাগে কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। কেবল মায়ের সঙ্গে সংযুক্ত, মায়ের নিকট সমর্পিত হয়ে থাক। আর সব নিশ্চয় হবে।

*

যখন এই শূন্য অবস্থা আসে, তখন মনকে খুব শান্ত কর, মায়ের শক্তি আলোককে ডাক বাহির প্রকৃতিতে নামবার জন্য।

*

এই attitude-ই ভাল। যখনই বাধা হয়, চেতনার উপর পর্দ্দা পড়ে, তখন বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে মাকে ডাকতে হয় যতক্ষণ পর্দ্দা খসে না যায়। পর্দ্দা পড়ে বটে কিন্তু পিছনে সবই আছে।

*

এ মনে রাখ যে মা দূরে যাননা। সর্ব্বদা নিকটে ভিতরে আছেন—যখন বাহিঃপ্রকৃতির কোনও রকম চঞ্চলতা হয়, তখন সে ভিতরের সত্য ঢেকে ফেলে ঢেউএর মত, তাই ওরূপ বোধ হয়। ভিতরে থাক, ভিতর থেকে সব দেখ, কর।

*

ভিতরে মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় আর সেখান থেকে বাহিরের প্রকৃতির বাধা দোষ ত্রুটি দেখতে হয়, দেখে বিচলিত বা বিষণ্ণ বা নিরাশ হতে নাই। স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করে মায়ের আলো ও শক্তির জোরে শুধরিয়ে নিতে হয়।

*

ভিতরে সবই আছে ও মায়ের কাজ ভিতরে হচ্ছে। তবে বাহিরের মনের সঙ্গে যুক্ত হলে সে সব টের পাওয়া যায় না, যতদিন সে মন পূর্ণ আলোকিত না হয়, ভিতরের সঙ্গে এক না হয়।

*

মায়ের ভালবাসা ও সাহায্য সব সময়ই আছে, তাহার অভাব কখনও হয় না।

কেহ যদি সচেতন হয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে, মায়ের শক্তির জোরে ধীর-ভাবে ঠেলে দেয় যতবার আসে, শেষে সে বাধামুক্ত হবেই হবে।

*

চলে যাবে কারা? যাদের আন্তরিক ভাব নাই, যাদের মায়ের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই, যারা মায়ের ইচ্ছার চেয়ে নিজের কল্পনাকে বড় বলে দেখে, তারা যেতে পারে, কিন্তু যে সত্যকে চায়, যার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, যে মাকে চায়, তার কোন ভয় নাই, তার যদি হাজার বাধা হয়, সেগুলো সে অতি-ক্রম করবে, যদি স্বভাবের অনেক দোষ হয় সেগুলো সে শুধরে নেবে, যদি পতনও হয় সে আবার উঠবে, সে শেষে একদিন সাধনার গন্তব্য স্থানে পৌঁছবেই।

*

ইহা right attitude নয়, তোমার সাধনা ধ্বংস হয়নি, মা তোমাকে ত্যাগ করেন নি, দূরে যান নি, তোমার উপর বিরক্ত হননি—এই সব হচ্ছে প্রাণের কল্পনা, এই সব কল্পনাকে স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর শান্ত সরল ভাবে নির্ভর কর, বাধাকে ভয় না করে মায়ের শক্তিকে তোমার ভিতরে ডাক—যা পেয়েছ সে সব তোমার ভিতরে আছে, নূতন উন্নতিও হবে।

*

শান্ত ও সচেতন থাক, মাকে ডাক, ভাল অবস্থা ফিরে আসবে। সমর্পণ সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে—যেখানে দেখছ হয়নি, সেখানটাও সমর্পণ কর—এইরূপ করতে করতে শেষে সম্পূর্ণ হবে।

*

সর্ব্বদা স্থির হয়ে মায়ের ঊর্ধ্ব-চেতনা নামতে দাও—তাতেই বহিশ্চেতনা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

*

শান্তভাবে সমর্পণ করতে করতে চল, পুরাতন সবের যে রূপান্তর দর-কার তা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাবে।

*

ভগবানের সন্তান হলেও এমন কোনও সাধক নাই যার মধ্যে প্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দোষ নাই। এই সব যখন টের পাওয়া যায়, তখন reject করতে হয়, মায়ের শক্তির আশ্রয় আরও দৃঢ়ভাবে চাইতে হয় যাতে আস্তে আস্তে এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির দোষ সকল বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বাস ও মায়ের

উপর নির্ভর সমর্পণ সব সময় অটুট রাখতে হয়। এসব দোষ সম্পূর্ণভাবে বের করা সময়সাপেক্ষ; আছে বলে বিচলিত হতে নাই।

*

এতে বিচলিত হয়ো না। যোগপথে এইরূপ অবস্থা আসেই—যখন নিম্নতম শরীর-চেতনায় ও অবচেতনায় নামবার সময় আসে—সে সময় অনেক দিন টিকতে পারে। কিন্তু এ পর্দার পিছনে মা আছেন, পরে দেখা দেবেন, এই নিম্নরাজ্য উপরের আলোকের রাজ্যে পরিণত হবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সব সমর্পণ করতে করতে এই বাধাপূর্ণ অবস্থার শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে চল।

*

বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত থাকা চাই, কিন্তু সে সব উপরি-উপরি (outer surface) থাকা উচিত—তুমি নিজে ভিতরে মায়ের নিকট থাকবে, আর সেখান থেকে ওই সব দেখবে—ইহাই চাই,—ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম সোপান—তার পর ভিতর থেকে মায়ের শক্তি দ্বারা সব বাহিরের কর্ম্ম ইত্যাদি চালিয়ে নেবে, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা। ইহা করতে পারলে আর কোন গোলমাল থাকে না।

*

ভিতরের দিক দিয়ে প্রথমে মাকে পেতে হয়। পরে বাহিরটী যখন সম্পূর্ণ বশে আসে, বাহিরে সর্ব্বদা অনুভব করা যায়।

*

এইটী সব সময় মনে রাখতে হয় যে, যেই অবস্থা হোক, যতই বাধা আসুক, যতই সময় লাগুক কিন্তু মায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে চলতে হয়, তাহলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাওয়া অনিবার্য্য—কোনও বাধা, কোনও বিলম্ব, কোনও মন্দ অবস্থা শেষ সফলতাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

*

যেমন এই সাধনায় চঞ্চলতা দূর করতে হয়, দুঃখকেও স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর নির্ভর করে স্থির চিত্তে শান্ত প্রসন্ন মনে এগুতে হয়। যদি মায়ের উপর নির্ভর থাকে তাহলে দুঃখের স্থান কোথায়। মা দূরে নন, সর্ব্বদা কাছেই থাকেন। সে জ্ঞান সে বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়।

*

প্রণামে বা দর্শনে মায়ের বাহিরের appearance (চেহারা) দেখে তিনি সুখী বা দুঃখিত ইহা অনুমান করা উচিত নয়। লোকে তাই ক'রে কেবলই ভুল করে, মিথ্যা অনুমান করে মা অসন্তুষ্ট মা কঠোর মা আমাকে চায় না দূরে রাখছে ইত্যাদি কত মিথ্যা কল্পনা আর তাতে নিরাশ হয়ে নিজের পথের নিজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সব না করে নিজের ভিতরে মায়ের উপর মায়ের

love (ভালবাসা) ও help (সাহায্য)-এর উপর অটল বিশ্বাস রেখে প্রফুল্ল শান্ত মনে সাধনায় এগুতে হয়। যারা তাই করে, তারা নিরাপদ থাকে—বাধা এলে, অহংকার এলে তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা বলে মা-ই আছেন, তিনি যা করেন তাই ভাল, তাঁকে আমি এমুহূর্ত্ত না দেখতে পেলেও আমার কাছে রয়েছেন, আমাকে ঘিরে রয়েছেন, আমার কোন ভয় নাই। ইহাই করতে হয়। এই ভরসা রেখেই সাধনা করতে হয়।

*

এমন অবস্থা হওয়া চাই যে চেতনা ভিতরে থাকবে মায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আর মায়ের শক্তি কাজ করবে; বাহিরের চেতনা সে শক্তির যন্ত্র হয়ে কাজ করবে—কিন্তু এই অবস্থা পুরোপুরি রূপে সহজে আসে না। সাধনা করতে করতে আসে, আর আস্তে আস্তে complete (সম্পূর্ণ) হয়ে যায়।

সূক্ষ্মদর্শন - প্রতীক - বর্ণ

যেমন ধ্যানে নানা রকম দৃশ্য দেখা যায়, সেই রকম ধ্যানে লেখাও দেখা যায়। এই সব লেখাকে আমরা লিপি বা আকাশলিপি নাম দি, এই লেখাগুলো বন্ধ চোখেও দেখা যায়, খোলা চোখেও দেখা যায়।

*

এই সকল হচ্ছে symbols—যেমন সাদা ফুল চেতনার প্রতীক, সূর্য্য জ্ঞানের বা সত্যের, চন্দ্র অধ্যাত্ম-জ্যোতির, তারা সৃষ্টির, অগ্নি তপস্যার বা aspiration-এর।

সোনার গোলাপ = সত্যচেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ।

সাদা পদ্ম = মায়ের চেতনা (Divine Consciousness)।

*

গাভী চেতনা ও আলোকের প্রতীক। সাদা গাভীর অর্থ উপরের শুদ্ধ চেতনা।

*

শিশুটী তোমার psychic being, তোমার ভিতরে সত্যের জিনিষ বার করে আনছে—রাস্তাটী হচ্ছে higher mind-এর রাস্তা, সত্যের দিকে উঠছে।

*

বেদযজ্ঞে পাঁচটী অগ্নি থাকে, পাঁচটী না থাকলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। আমরা বলতে পারি psychic-এ, মনে, প্রাণে, দেহে ও অবচেতনায়, এই পাঁচটী অগ্নির দরকার।

*

গাছটী ভিতরের spiritual life, তার উপরে বসেছে সত্যের বিজয়-স্বরূপ স্বর্ণময়ূর, প্রত্যেক ভাগে; চন্দ্র অধ্যাত্ম শক্তির আলো।

*

মাথার উপরে একটী পদ্ম আছে, সে হচ্ছে ওই ঊর্দ্ধ্বচেতনার কেন্দ্র। সে পদ্মই হয়ত ফুটতে চায়।

*

প্রাণে যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছিল, সেটাই অর্দ্ধচন্দ্র। চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। সবুজ রঙের অর্থ খাঁটি প্রাণশক্তি। সূর্য্যের উদয়= সত্যচেতনার প্রকাশ প্রাণভূমিতে।

*

চন্দ্র=অধ্যাত্মের আলোক।
হস্তি=বলের প্রতীক।
সোনার হস্তি=সত্যচেতনার বল।
সবুজ ত emotion-এর আলোর রং।

*

সূর্য্যের অনেক রূপ আছে, অনেক বর্ণের আলোর; সূর্য্য যেমন লাল, তেমনই হিরণ্ময়, নীল, সবুজ, ইত্যাদি।

*

নীল=Higher mind,
সূর্য্যের আলো=Light of Divine Truth,
উজ্জ্বল লাল=Divine Love, নয় ঊর্দ্ধ্বচেতনার Force.

*

প্রাণের ঊর্দ্ধ্বগামী অবস্থা ভগবানের দিকে সত্যের দিকে। সত্যের (সোনার রং) ও higher mind-এর (নীল আলোর) প্রভাব মূর্ত্ত হয়ে উঠে নেমে ঘুরছে, সেই ঊর্দ্ধ্বগামী প্রাণচেতনায়।

*

নীল আলো আমার, সাদা আলো মায়ের—যখন ঊর্দ্ধ্বচেতনা (higher consciousness) বিশ্বময় ভাব নিয়ে আধারে প্রথম নামতে সুরু করে, তখন নীল আলো দেখা খুব স্বাভাবিক।

*

ইহা হচ্ছে মনের উপর ঊর্দ্ধ্বচৈতন্য, যেখান থেকে আসে শান্তি শক্তি আলো ইত্যাদি—সাদাপদ্ম মায়ের চৈতন্য, লালপদ্ম আমার চৈতন্য—সেখানে জ্ঞান ও সত্যের আলো সর্ব্বদা আছে।

*

নীল ত higher mind-এর বর্ণ—নীল পদ্ম—সেই ঊর্দ্ধ্ব মনের উন্মীলন তোমার চেতনায়।

*

সাদা আলো Divine Consciousness-এর আলো—নীল আলো higher consciousness-এর—রৌপ্যের মত আলো আধ্যাত্মিকতার আলো।

*

সাপ হচ্ছে Energy (শক্তি)-র প্রতীক। ঊর্দ্ধ্বের একটি Energy মাথার উপরে higher consciousness-এ দাঁড়িয়ে আছে।

*

জল চেতনার প্রতীক—যা ওঠে তা চেতনার আকাঙ্ক্ষা বা তপস্যা।

যদি সাদাটে নীল আলো (white blue) হয় সে আমার আলো—যদি সাধারণ আলো হয়, সে উপরের জ্ঞানের আলো।

*

কমলালেবুর রংয়ের অর্থ Divine-এর সঙ্গে মিলন ও অপার্থিব চেতনার স্পর্শ।

*

মূলাধার physical-এর inner centre—পুকুরটি চেতনার একটি opening বা formation. সে চেতনার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের presence লাল পদ্ম, আর inner physical-এ প্রেমের গোলাপী আলো নামছে।

*

সাপ হচ্ছে প্রকৃতির শক্তি—মূলাধার (physical centre) তার একটি প্রধান স্থান—সেখানে কুণ্ডলিত অবস্থায় সুপ্ত হয়ে থাকে। যখন সাধনার দ্বারা জাগ্রত হয়, তখন উপরের দিকে ওঠে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। মায়ের শক্তির অবতরণে সে এর মধ্যে স্বর্ণময় হয়েছে, অর্থাৎ ভাগবত সত্যের আলোয় ভরা।

*

এই সব অভিজ্ঞতায় পার্থিব মাতা হচ্ছে পার্থিব প্রকৃতি, সাধারণ বহিঃ-প্রকৃতির প্রতীক মাত্র।

*

(Red Lotus)—The Divine Harmony.
(Blue Light)—The Higher Consciousness.
(Golden Temple)—The Temple of the Divine Truth.

ধীর স্থির হয়ে থাক, তবে তোমার বাহিরেও, তোমার বহিঃপ্রকৃতিতে, তোমার জীবনে আস্তে আস্তে এই সকল ফলবে।

*

সাদা গোলাপ মায়ের কাছের প্রেমময় আত্মসমর্পণ, তার ফল সত্যের আলো-কের বিস্তার আধারের মধ্যে। সাদা পদ্ম মায়ের চেতনা প্রস্ফুটিত তোমার মানস স্তরে। কমলালেবুর রংয়ের মত আলো (red-gold) দেহের মধ্যে পরম সত্যের দীপ্তি (Supramental in physical).

শ্রদ্ধা—বিশ্বাস—নির্ভরতা

শান্তভাবে বসে মাকে স্মরণ করে মায়ের কাছে নিজেকে খুলে রাখ—ধ্যানের নিয়ম এই।

*

উভয় রকম করা শ্রেষ্ঠ। যদি দূরে থেকে শুধু সাধনা করা সম্ভব হত, তা হলে তাই শ্রেষ্ঠ হত, কিন্তু তা সব সময় করা যায় না। কিন্তু আসল কথা এই যে, psychic-এর মধ্যে তোমার দৃঢ় স্থান বা নিরাপদ দুর্গ করে সাধনা করতে হয়—অর্থাৎ স্থির ধীরভাবে মায়ের উপর নির্ভর করা। অধীর না হয়ে প্রসন্ন চিত্তে বলা, "তুমি যা বলছ, তা সত্য—এই ছোট ছোট অসম্পূর্ণতা ইত্যাদিই এখন আসল অন্তরায় বড় বাধার চেয়ে।" কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে বার করতে হয়, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তরিত করতে হয়, হঠাৎ করা যায় না। অতএব সেগুলো দেখে দুঃখিত বা অধীর হতে নাই, মায়ের শক্তিই আস্তে আস্তে সে কাজ করে ফেলবে।

*

সত্যের সোজা পথ খোলা অন্তরে। যা সমর্পণ করা হয় সেই অবস্থায় সহজ সরলভাবে উপরে মায়ের কাছে গিয়ে সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়, সত্যময় হয়ে যায়।

*

ভীত বা বিচলিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, অন্ধকারের অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়, অন্ধকারেও শান্ত হয়ে থাক।

*

তপস্যা শুধু এই, স্থির থাকা, মাকে ডাকা, খুব শান্ত দৃঢ়ভাবে অশান্তিকে, নিরাশাকে, কামনা-বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা।

*

শান্তি সত্য ইত্যাদি আগে ভিতরে স্থাপিত হয়, তারপরে বাহিরে কার্য্যে পরিণত হয়।

*

শূন্য অবস্থাকে ভয় করতে নেই। শূন্য অবস্থার মধ্যেই ভগবৎ শান্তি নেমে আসে। মা তোমার মধ্যে সর্ব্বদাই আছেন—তবে শান্তি শক্তি আলো নিজের মধ্যে স্থাপিত না হলে তা সব সময় বোঝা যায়না।

*

এটা কি মস্ত বড় অহংকার নয় যে তোমারই জন্যে এত কাণ্ড হয়েছে?

আমি খুব ভালো, খুব শক্তিমান, আমার দ্বারাই সব হচ্ছে, আমা ছাড়া মায়ের কাজ চলতে পারে না, এ ত এক রকম অহংকার। আমি খারাপের চেয়ে খারাপ, আমারই বাধার জন্য সব বন্ধ হয়েছে, ভগবান তাঁর কাজ চালাতে পারেন না, এই আর এক উল্টো অহংকার।

*

সব সময়ে স্থির হয়ে থাক—মায়ের শক্তিকে শান্তভাবে ডেকে, সব উদ্বেগ ছেড়ে দিয়ে।

*

এই feeling, এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সব সময় রাখতে হয়; সাধকের এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস faith, conviction, মায়ের শক্তির প্রধান সহায়।

*

সাধনা করতে হয় দৃঢ় শান্ত মনে, মায়ের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা রেখে। Depression-কে কখনও স্থান দিতে নাই। যদি আসে ত প্রত্যাখ্যান করে দূর করে দিতে হয়। আমি নীচ, অধম, আমার দ্বারা হবে না, মা আমাকে দূর করেছেন, আমি চলে যাব, আমি মরব, এ সব চিন্তা যদি আসে তবে জানতে হবে যে এইসব নিম্ন প্রকৃতির suggestions, সত্যের ও সাধনার বিরোধী। এই সব ভাবকে কখন আশ্রয় দিতে নাই।

*

দুঃখ কেন পাচ্ছ? মায়ের উপর নির্ভর করে সমতা রাখলে দুঃখ পাবার কথা নাই। মানুষের কাছে সুখ ও শান্তি ও আনন্দ পাবার আশা বৃথা।

*

এই চিন্তা ও ভয়ের বদলে এই নিশ্চয়তা ও শ্রদ্ধা রাখতে হয় যে যখন একবার মায়ের সঙ্গে ভিতরে যোগ হয়েছে,—তখন হাজার বাধা হলেও বহিঃপ্রকৃতির যতই না দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকুক মায়ের জয় আমার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা হতেই পারে না।

*

সব সময় মায়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হয় যে তাঁরই হাতে আছি, তাঁর শক্তিতে সব হবে, তাহলে বাধার জন্য দুঃখ বা নিরাশা আসতে পারবে না।

*

তাতে ব্যস্ত হয়ো না। সব সময়ে চেষ্টা করে মনে রাখা সহজ নয়—যখন মায়ের presence-এ সমস্ত আধার ভরে যাবে তখন সেই স্মরণ আপনিই থাকবে, ভুলে যাবার যো থাকবে না।

*

শান্তভাবে সাধনা করতে করতে অগ্রসর হও—দুঃখ বা নিরাশাকে স্থান দিও না—শেষে সব অন্ধকার সরে যাবে।

*

ইহা ত সকলেরই হয়—ভাল অবস্থায় সর্ব্বদা থাকা বড় কঠিন, অনেক সময় লাগে—স্থির হয়ে সাধনা করো, বিচলিত হয়ো না। সময়ে হয়ে যাবে।

*

সাধনা ত মাকে feel করা কাছে ও ভিতরে, মা সব করছেন বলে অনুভব করা, মায়ের সব জিনিস ভিতরে receive করা। এই অবস্থা থাকলে পড়াতে মন দিলে কোন ক্ষতি হতে পারে না।

*

হ্যাঁ, ওই রকম কাঁদলে দুর্ব্বলতা আসে। সব সময়, সব অবস্থায় ধীর শান্ত হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে মাকে ডাক। তাহলে ভাল অবস্থা শীঘ্র ফিরে আসে।

*

আমার কথা—যা অনেকবার বলেছি—তা ভুলে যেয়ো না। উতলা না হয়ে স্থির শান্তভাবে সাধনা কর, তাহলেই সব আস্তে আস্তে ঠিক পথে আসবে। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ভাল নয়—শান্তভাবে মাকে ডাক, তাঁর কাছে সমর্পণ কর। প্রাণ যতই শান্ত হয়, ততই সাধনা steadily এক পথে চলে।

চৈত্য পুরুষ

শিশুটি তোমার psychic being যা বুক থেকে উঠে ও নামে তা বহিঃপ্রকৃতির বাধা, ভিতরের সত্যকে স্বীকার করতে চায় না, ঢেকে রাখতে চায়।

*

সে স্থান পিছনে মেরুদণ্ডের psychic being-এর স্থান। যা বর্ণনা করছ সে সবই psychic being-এর লক্ষণ।

*

হ্যাঁ, মানুষের চেতনার কেন্দ্র বুকে যেখানে psychic being-এর স্থান।

*

ওই সোজা আলোকময় পথই আসল পথ, তবে তার মধ্যে পেঁছাতে সময় লাগে। ছকবার ঐ পথে পেঁছালে আর বিশেষ কোনও কষ্ট বাধা স্খলন হয় না।

*

যদি গভীর হৃদয়ের (psychic-এর) পথ ধর, মার কোলে শিশুর মত থাক, তা হলে এই সব sex impulse ইত্যাদি আক্রমণ করেও কিছু করতে পারবে না, শেষে আর আসতেও পারবে না।

*

এই কথার উত্তর আগেই দিয়েছি। ভিতরে থাক, ভিতরে থেকে সব দেখ, বাহিরের চক্ষুতে নয়। বহিশ্চৈতন্যে থাকলে চিন্তার আবরণে অনেক ভুল হবার কথা, ভিতরে থাকলে psychic being ক্রমশ প্রবল হয়, psychic being-ই সত্য দেখে, সব সত্যময় করে দেয়।

*

অভিজ্ঞতাগুলি ভাল—এই অগ্নি psychic fire আর যে অবস্থার বর্ণনা করেছে সে অবস্থা psychic condition, যার মধ্যে অশুদ্ধ কিছু আসতে পারে না।

*

সত্য দেখা।—psychic consciousness-এর রাস্তা উপরের সত্য চেতনায়, সেই psychic-কে কেন্দ্র করে সব স্তর একভাবে ভগবানের দিকে ফিরতে আরম্ভ করেছে। সে রাস্তা উপরের দিকে উঠেছে—ছোট শিশু তোমার psychic being.

*

তাহাই চাই—হৃদয়-পদ্ম সর্ব্বদা খোলা, সমস্ত nature হৃদয়স্থ psychic being-এর বশ হওয়া, এতেই নবজন্ম হয়।

*

Yes, this is the true psychic attitude. যে এই ভাবটি রাখতে পারে, সব সময়ে সব ঘটনার মধ্যে, সে গন্তব্যপথে সোজা চলে যায়।

অহঙ্কার—অশুদ্ধতা—ক্ষোভ—নিরাশা

যখন চেতনা বিশাল ও বিশ্বময় হয় আর সমস্ত বিশ্বেই মাকে দেখা যায় তখন অহং আর থাকে না, থাকে শুধু মায়ের কোলে তোমার আসল সত্তা, মায়ের সন্তান মায়ের অংশ।

*

আমরা ত তোমাকে ছেড়ে দিইনি। যখন depression হয় তখন তুমি এ সব কথা ভাব। মাঝে মাঝে তুমি বাহিরের চেতনায় এসে আর মাকে feel কর না, তাই বলে ভাবা উচিত নয় যে মা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আবার ভিতরে যাও, সেখানে তাঁকে feel করবে।

*

অর্থ এই—যে ভাল সাধক ভাল সাধনা করে, সে ভাল সাধনার মধ্যেও অহংকার, অজ্ঞান, বাসনার ছাপ অনেকদিন বয়ে থাকে—কিন্তু চেতনা যখন আরও খুলে খুলে খাঁটি হয়—যেমন তোমার হতে আরম্ভ হয়েছে—তখন ওসব অজ্ঞানের মিশ্রণ খসে যেতে আরম্ভ করে।

*

এই সব হচ্ছে প্রাণের নিরর্থক disturbance, শান্ত হয়ে যোগ পথে চলতে হয়, ক্ষোভ ও নিরাশাকে স্থান দিতে নাই।

*

অবশ্য এইরূপ কথার মধ্যে প্রাণের অনেক অশুদ্ধ গতি ঢুকতে পারে, ক্ষোভ, মায়ের উপর অসন্তোষ, অপরের উপর হিংসা, বিসাদ, দুঃখ এই সব নিয়ে না থাকা ভাল।

*

এই অবস্থা, এই বুদ্ধিই সত্য, সব সময় রাখা উচিত। অহংকারের বুদ্ধিতে আর লোককে ও ঘটনাকে না দেখে এই অধ্যাত্মবুদ্ধিতে আর ভিতরের psychic-এর দৃষ্টিতে দেখতে হয়।

*

চেতনার স্তরাবলি

মূলাধার থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত physical-স্তর বলা যায়, পায়ের নীচে অবচেতনার রাজ্য।

*

অনেক স্তর আছে উপরে ও নিম্নে, তবে মুখ্যত আছে ওই নীচে চারটি স্তর, মনের স্তর, psychic স্তর, vital স্তর, শরীর স্তর—আর উপরের আছে ঊর্ধ্ব মনের অনেক স্তর, তারপর বিজ্ঞান-স্তর ও সচ্চিদানন্দ।

*

যদি নেমেই যাও, সেখানেও শান্ত হয়ে মার আলো শক্তি ডেকে নামিয়ে দাও। নিম্নে যেমন উপরে নিজের মধ্যে মায়ের রাজ্য সংস্থাপন করে দাও।

*

যখন চেতনা physical-এ নামে তখন এই রকম অবস্থা হয়। তার অর্থ এই নয় যে সব সাধনার ফল বৃথা হয়েছে বা উপরে চলে গেছে—সব আছে, কিন্তু আবরণের মধ্যে পিছনে রয়েছে। এই obscure physical-এ মায়ের চেতনা আলো ও শক্তি নামাতে হয়—সেটা যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর এ অবস্থা ফিরে আসবে না। কিন্তু যদি বিচলিত হও, depressed হও বা এই সব চিন্তা প্রবেশ করে যে আমার আর এ জীবনে হবে না, মরা ভাল ইত্যাদি, তা হলে একটা বাধা হয় সে চেতনা, শক্তি আলো নামবার পথে। সে জন্য এগুলোকে reject করে মায়ের উপর নির্ভর রাখা আর শান্তভাবে aspire করা ও তাঁকে ডাকা উচিত।

কারাকাহিনী

১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আমি "বন্দেমাতরম্" আফিসে বসিয়াছিলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি টেলিগ্রাম দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়াছে, দুটি য়ুরোপীয়ান স্ত্রীলোক হত। সেদিনের "এম্পায়ার" কাগজে আরও পড়িলাম, পুলিস কমিশনার বলিয়াছেন আমরা জানি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং তাহারা শীঘ্র গেপ্তার হইবে। জানিতাম না তখন যে আমি এই সন্দেহের মুখ্য লক্ষ্যস্থল, আমিই পুলিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারী, রাষ্ট্রবিপ্লবপ্রয়াসী যুবকদলের মন্ত্রদাতা ও গুপ্ত নেতা। জানিতাম না যে এই দিনই আমার জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বৎসরের কারাবাস, এই সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই ছিন্ন হইবে, এক বৎসর কাল মানবসমাজের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। আবার যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, তথায় সেই পুরাতন পরিচিত অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ, নূতন চরিত্র, নূতন বুদ্ধি, নূতন প্রাণ, নূতন মন লইয়া নূতন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে। বলিয়াছি এক বৎসর কারাবাস, বলা উচিত ছিল এক বৎসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হৃদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা করিয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ করিয়াছিলাম জগদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভুভাবে লাভ করি। কিন্তু সহস্র সাংসারিক বাসনার টান, নানা কর্ম্মে আসক্তি, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা পারি নাই। শেষে পরম দয়ালু সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীহরি সেই সকল শত্রুকে এক কোপে নিহত করিয়া তাহার সুবিধা করিলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গুরুরূপে, সখারূপে সেই ক্ষুদ্র সাধন কুটীরে অবস্থান করিলেন। সেই আশ্রম ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য্য বৈপরীত্য বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে আমার হিতৈষী বন্ধুগণ আমার যতই না উপকার করুন, অনিষ্টকারীগণ—শত্রু কাহাকে বলিব, শত্রু আমার আর নাই—শত্রুই অধিক উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা অনিষ্ট করিতে গেলেন, ইষ্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের কোপ-দৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহবাসে আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটী বাহ্যিক ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারাবাসের মুখ্য ভাব তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা করিলাম। নতুবা পাঠকগণ মনে করিবেন যে, কষ্টই কারাবাসের সার। কষ্ট যে ছিল না তাহা বলা যায় না, কিন্তু অধিকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে।

শুক্রবার রাত্রিতে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় ৫ টার সময় আমার ভগিনী সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিল, জাগিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ঘরটী সশস্ত্র পুলিসে ভরিয়া উঠিল; সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপরিচিত শ্রীমান বিনোদ কুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্ত্তি, আর কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টার, লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী। হাতে পিস্তল লইয়া তাহারা বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরক্ষিত কেল্লা দখল করিতে আসিল। শুনিলাম, একটী শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বসিয়া আছি, তখনও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরবিন্দ ঘোষ কে, আপনিই কি?" আমি বলিলাম, "আমিই অরবিন্দ ঘোষ"। অমনি একজন পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি অতিশয় অভদ্র কথায় দুজনের অল্পক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা হইল। আমি খানাতল্লাসীর ওয়ারেণ্ট চাহিলাম, পড়িয়া তাহাতে সহি করিলাম। ওয়ারেণ্টে বোমার কথা দেখিয়া বুঝিলাম, এই পুলিস সৈন্যের আবির্ভাব মজঃফরপুরের খুনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কেবল বুঝিলাম না আমার বাড়ীতে বোমা বা অন্য কোন স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বডি ওয়ারেণ্ট-এর অভাবে কেন আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে বৃথা আপত্তি করিলাম না। তাহার পরেই ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি দেওয়া হইল। একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল সেই দড়ি ধরিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসুকে পুলিস উপরে আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টার পর কাহার কথায় জানি না, তাহারা হাতকড়ি ও দড়ি খুলিয়া লয়। ক্রেগানের কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন হিংস্র পশুর গর্ত্তে ঢুকিয়াছেন, যেন আমরা অশিক্ষিত হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট আইন-ভঙ্গকারী, আমাদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব একটু নরম হইয়া পড়িলেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি নাকি বি-এ পাশ করিয়াছেন? এইরূপ বাসায় এমন সজ্জাবিহীন কামরায় মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় থাকা কি আপনার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?" আমি বলিলাম, "আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই থাকি।" সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, "তবে কি আপনি ধনী লোক হইবেন বলিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন?" দেশ-হিতৈষিতা, স্বার্থত্যাগ

বা দারিদ্র্য ব্রতের মাহাত্ম্য এই স্থূলবুদ্ধি ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া আমি সে চেষ্টা করিলাম না।

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চলিতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কবিতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্ব্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ; পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে কিছু না বলিয়া হঠাৎ ধরিয়া লইয়া আসে, তিনি আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। রক্ষিত মহাশয় অতি করুণ ভাবে এই হরণকান্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্যরূপ, তিনি বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, যেন to the manner born. খানাতল্লাসীতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সন্দিগ্ধচিত্তে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন ভয়ঙ্কর তেজবিশিষ্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ ভিত্তিহীন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। আমি খানাতল্লাসীতে বাক্স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্য্যে যোগদান করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পড়িয়া শুনান হয় নাই, মাত্র অলকধারীর একখানা চিঠি ক্রেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্বরে পড়েন। বন্ধুবর বিনোদ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ললিত পদবিন্যাসে ঘর কম্পিত করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শেল্ফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে “অতি প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয়” বলিয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পন করেন। এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি কি তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সেই বিষয়ে কৌতূহলও ছিল না, কারণ আমি জানিতাম যে, আমার বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব।

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মাত্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আবির্ভাব। একতলায় বসিয়া ক্রেগান চা পান করেন, আমি এক পেয়ালা কোকো ও রুটী

থাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনৈতিক মতগুলি যুক্তি-তর্ক দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—আমি অবিচলিতচিত্তে এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিলাম। তবে জিজ্ঞাসা করি, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষিক অত্যাচার করা কি unwritten law-এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে? আশা করি আমাদের পরম মান্য দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন।

নীচের ঘরগুলি ও "নবশক্তি" আফিসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস "নবশক্তি"র একটি লোহার সিন্দুক খুলিতে আবার দোতালায় যায়। আধ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটী দ্বিচক্রযান আবিষ্কার করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্ঠিয়ার নাম ছিল। অমনি কুষ্ঠিয়ায় সাহেবকে যে গুলি করে তাহারই বাহন বলিয়া এই গুরুতর প্রমাণ সানন্দে লইয়া যান।

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাটী হইতে যাত্রা করিলাম। ফটকের বাহিরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে?" আমি বলিলাম, "আমি কিছুই জানি না, ইহারা ঘরে প্রবেশ করিয়াই গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকড়ি দেন, বডি ওয়ারেণ্ট দেখান নাই।" মেসো মহাশয় হাতকড়ি হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ বাবু বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আমিই সাহেবকে বলিয়া হাতকড়ি খুলাইয়া দিলাম।" ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা করায় গুপ্ত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু স্তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। পরে শুনিলাম, আমার সলিসিটর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে ষ্ট্রীটে আসিয়া খানাতল্লাসীতে আমার পক্ষে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুলিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেয়।

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় তিনি আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। সেইখানেই স্নান ও আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া রয়ড ষ্ট্রীটে লইয়া যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড ষ্ট্রীটে ডিটেক্‌টিভ পুঙ্গব মৌলবী শাম্‌স-উল-আলমের সহিত আমার প্রথম আলাপ ও প্রীতি স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও উৎসাহোদ্যম হয় নাই, বোমার মামলার প্রধান অন্বেষণকারী কিম্বা নর্টন

সাহেবের prompter বা জীবন্ত স্মরণশক্তিরূপে তিনি তখন বিরাজ করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী সাহেব আমাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙ্কারে ত্রিমাত্রা অ উ ম, কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্ত্বের নিয়মে 'ল'-এর বদলে 'উ' ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মন্ত্র। তথাপি নিজের ধর্ম্মের পার্থক্য অক্ষুন্ন রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা হিন্দুর পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। সাহেবেরা বলেন অরবিন্দ ঘোষ হত্যাকারী দলের নেতা, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাদিতা রক্ষা করিতে পারিলে situation saved হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের ন্যায় উচ্চচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব নিজের মত ছাড়িলেন না। তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রবল ধর্ম্মভাব দেখিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইলাম। নিজে বেশী কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র বিবেচনা করিয়া নম্রভাবে তাঁহার অমূল্য উপদেশ শুনিয়া লইলাম এবং তাহা সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলাম। এত ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মৌলবী সাহেব ডিটেক্‌টিভগিরি ছাড়েন নাই। একবার বলিলেন, "আপনি যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা তৈয়ার করিবার জন্য বাগানটি ছাড়িয়া দিলেন, বড় ভুল করিলেন, ইহা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই।" তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আমি একটু হাসিলাম; বলিলাম, "মহাশয় বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য ছাড়িলাম, এ খবর কোথায় পাইলেন?" মৌলবী সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না না, আমি বলিতেছি যদি তাহা করিয়া থাকেন।" এই মহাত্মা নিজের জীবন চরিতের একটী পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমার বাপের একটী অতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন, সম্মুখের অন্ন কখনও ছাড়িতে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মূলমন্ত্র, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়াছি বলিয়া আমার এই উন্নতি।" ইহা বলিবার সময় মৌলবী সাহেব যে তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইল যেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন। সন্ধ্যাবেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যন্ত দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্ন

করিতে বলিলেন। পর মুহূর্ত্তে কয়েকজন আসিয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে লইয়া ঝড়বৃষ্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সহিত এই একবার মাত্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারিলাম লোকটি বুদ্ধিমান ও উদ্যমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী, স্বর, চলন সবই কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, সর্ব্বদা যেন তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন। এইরূপ এক একজন আছে যাহাদের শরীর, বাক্য, চেষ্টা যেন অনৃতের অবতার। তাহারা কাঁচা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ বা অনেক দিন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধরা পড়ে।

লালবাজারে দোতালায় একটী বড় ঘরে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে রাখা হইল। আহার হইল অল্পমাত্র জলখাবার। অল্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিস কমিশনার হ্যালিডে সাহেব। দুইজন এক সঙ্গে আছি দেখিয়া হ্যালিডে সার্জ্জেণ্টের উপর চটিয়া উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, খবরদার এই লোকটির সঙ্গে যেন কেহই না থাকে বা কথা বলে। সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়া বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হ্যালিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া আপনার কি লজ্জা করে না?" "আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধরিয়া লইবার আপনার কি অধিকার?" উহার উত্তরে হ্যালিডে বলিলেন, "আমি ধরিয়া লই নাই, আমি সবই জানি।" আমি বলিলাম, "কি জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি।" হ্যালিডে আর কোন কথা বলিলেন না।

সেই রাত্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও পুলিস। ইহাদের আসার মধ্যে এক রহস্য নিহিত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত তলাইতে পারি নাই। গ্রেপ্তারের দেড় মাস আগে একটী অপরিচিত ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, "মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, তবে আপনার উপর ভক্তি আছে বলিয়া আপনাকে সতর্ক করিতে আসিলাম, আর জানিতে চাই আপনার কোন্নগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ আছে, সেখানে কখন কি গিয়াছিলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?" আমি বলিলাম, "বাড়ী নাই, কোন্নগরে একবার গিয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও আছে।" তিনি বলিলেন, "আর কিছু বলিব না তবে ইহার পর কোন্নগরের কাহারও সহিত দেখা করিবেন না, আপনার ও আপনার ভাই বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, শীঘ্রই আপনাদিগকে তাহারা বিপদে ফেলিবে। আর আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।" আমি

বলিলাম, "মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আমি বুঝিতে পারিলাম না, তবে উপকার করিতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ। আমি আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তিনিই সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেষ্টা করা বা সতর্ক হওয়া নিষ্প্রয়োজন।" তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। এই আমার অপরিচিত হিতৈষী যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রাত্রে তাহার প্রমাণ পাইলাম। একজন ইন্‌স্পেক্টর আর কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া কোন্‌নগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বলিলেন, "কোন্‌নগরে কি আপনার আদি স্থান? সেখানে বাড়ী আছে কি? সেই-খানে কখনও গিয়াছিলেন? কবে গিয়াছিলেন? কেন গিয়াছিলেন? বারী-ন্দ্রের কোন্‌নগরে সম্পত্তি আছে কি?"—এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি-লেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আমি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এই চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইলাম না, তবে প্রশ্নগুলির ও পুলিসের কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে কি খবর পাইয়াছে তাহা সত্য কি মিথ্যা এই অনুসন্ধান চলিতেছে। অনুমান করিলাম যেমন তাই-মহারাজের মোক-দ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেন্ট যোগদান করিয়া প্রজার অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন,—তেমনই এস্থলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রবিবার সমস্তদিন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। সকালে দেখিলাম কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক সিঁড়িতে নামিতেছে। মুখ চিনি না কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্দমায় ধৃত, পরে জানিতে পারিলাম ইহারা মাণিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস পরে জেলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অল্পক্ষণ পরে হাত-মুখ ধুইতে আমাকেও নীচে লইয়া যায়—স্নানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্নান করিলাম না। সেই দিন সকালে আহারের মধ্যে ডাল, ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর করিয়া উদরস্থ করিলাম, তাহার পর তাহা ত্যাগ করিতে হইল। বিকাল বেলা মুড়ি। তিন দিন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বলিতে হয় যে সোমবারে সার্জ্জেন্ট আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চা ও রুটী খাইতে দিলেন।

পরে শুনিলাম আমার উকিল কমিশনারের নিকট বাড়ী হইতে আহার দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, হ্যালিডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাও শুনিলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটর্ণীর দেখা করা নিষিদ্ধ। জানি না এই নিষেধ আইন-সঙ্গত কিনা? উকিলের পরামর্শ পাইলে আমার যদিও সুবিধা হইত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে

অনেকের মোকদ্দমার ক্ষতি হইয়াছে। সোমবারে কমিশনারদের নিকট আমাদের হাজির করে। আমার সঙ্গে অবিনাশ ও শৈলেন ছিল। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম বলিয়া তিনজনই কমিশনারের নিকট কোনও কথা বলিতে অস্বীকৃত হই। পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেট থর্ণহিলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, ম্যানুয়েল সাহেব আর আমার একজন আত্মীয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ চিঠি বা কাগজ কি ছিল?" আমি বলিলাম, "নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্র ('sweets letter') বা 'scribbling'এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে বলিলাম, "বাড়ীতে ব'ল কোন ভয় যেন না করে, আমার নির্দ্দোষিতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে।" আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা হইবেই। প্রথম নির্জ্জন কারাবাসে মন একটু বিচলিত হয় কিন্তু তিন দিন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস পুনঃ প্রাণকে অভিভূত করে।

থর্ণহিল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চিনিতাম, একবার মেদিনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সহিত দেখা হইবে। আলিপুরে আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকিতে হইল, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আমাদের হাজির করা হয় নাই, কেবল ভিতর হইতে তাহার হুকুম লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাড়িতে উঠিলাম; তখন একটি ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "শুনিতেছি ইহারা আপনার নির্জ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুকুম লেখা হইতেছে। হয়ত কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে দিবে না। এইবার যদি বাড়ীর লোককে কিছু বলিতে চান, আমি সংবাদ পেঁছাইয়া দিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু যাহা বলিবার ছিল, তাহা আমার আত্মীয়ের দ্বারা জানান হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না। আমার উপর দেশের লোকের সহানুভূতি ও অযাচিত অনুগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের কর্ম্মচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢুকিবার আগে আমাদের স্নান করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পিরাণ, ধুতি, জামা সংশোধিত করিবার জন্য

লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিলাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়, আমিও আমার নির্জ্জন কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ হইল। ৫ই মে আলিপুরে কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর ৬ই মে নিষ্কৃতি পাই।

আমার নির্জ্জন কারাগৃহটি নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই পিঞ্জরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জমি, ইটের উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরিভাগে মানুষের চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রন্ধ্র, দরজা বন্ধ হইলে শান্ত্রী এই রন্ধ্রে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী কি করিতেছে। কিন্তু আমার উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাকিত। এইরূপ ছয়টি ঘর পাশাপাশি, সেইগুলিকে ছয় ডিক্রী বলে। ডিক্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুম যাহাদের নির্জ্জন কারাবাসের দণ্ড নির্দ্ধারিত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকিতে হয়। এই নির্জ্জন কারাবাসেরও কম-বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের দরজা বন্ধ থাকে; মনুষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়া শান্ত্রীর চক্ষু ও পরিবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই. ডি.-র আতঙ্কস্থল বলিয়া তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,—হাতে-পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পরিয়া নির্জ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামারির জন্য নয়, বার বার খাটুনীতে ত্রুটী হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জ্জন কারাবাসের মোকদ্দমার আসামীকে শাস্তি-স্বরূপ এইরূপ কষ্ট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা 'বন্দেমাতরম্'-কয়েদী নিয়মের বাহিরে, পুলিসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সুবন্দোবস্ত হয়।

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের সহৃদয় কর্ত্তৃপক্ষ আতিথ্য সৎকারের ত্রুটী করেন নাই। একখানা থালা ও একটি বাটী উঠানকে সুশোভিত করিত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্ব্বস্ব থালা-বাটির এমন রূপার ন্যায় চাক্‌চিক্য হইত যে, প্রাণ জুড়াইয়া যাইত এবং সেই নির্দ্দোষ কিরণময় উজ্জ্বলতার মধ্যে 'স্বর্গজগতে' নিখুঁত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের উপমা পাইয়া রাজভক্তির নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতাম। দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একটু

জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যন্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটিটাই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল। ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান। সিভিলিয়ানের যেমন সর্ব্বকার্য্যে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, শাসনকর্ত্তা, পুলিস, শুল্ক-বিভাগের কর্ত্তা, মিউনিসিপ্যালিটির অধ্যক্ষ, শিক্ষক, ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বলিবামাত্র হইতে পারে,—যেমন তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, অভিযোগ-কর্ত্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় সময় বাদীর পক্ষের কৌন্‌সিলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রীতি-সম্মিলন হওয়া সুখসাধ্য, আমার আদরের বাটিরও তদ্রূপ। বাটির জাত নাই, বিচার নাই, কারাগৃহে যাইয়া এই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্ব্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাটি আমার এই সকল সাংসারিক উপকার করিয়া যোগ সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পরিত্যাগের এমন সহায় ও উপদেষ্টা কোথায় পাইব? নির্জ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার সিভিলিয়ানের অধিকার পৃথকীকরণ হয়,—কর্ত্তৃপক্ষেরা শৌচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ত্র উপকরণের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু একমাসকাল এতদ্দ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ হইল। শৌচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত। বলা হইয়াছে, নির্জ্জন কারাবাস বিশেষ শাস্তির মধ্যে গণ্য এবং সেই শাস্তির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা বর্জ্জন। বাহিরে শৌচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ত্ব ভঙ্গ হয় বলিয়া ঘরের ভিতরেই দুইখানা আল্‌কাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও বিকাল বেলায় মেথর আসিয়া তাহা পরিষ্কার করিত, তীব্র আন্দোলন ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলে অন্য সময়েও পরিষ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়খানায় যাইলে প্রায়ই প্রায়শ্চিত্তরূপে কয়েক ঘণ্টা দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত। নির্জ্জন কারাবাসের দ্বিতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা রিফরম্‌ হয়, কিন্তু ইংরাজের রিফর্‌ম হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া শাসন-প্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় সর্ব্বদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রাত্রিতে বিশেষ অশোয়াস্তি ভোগ

করিতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পার্শ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে বিলাতী সভ্যতার অঙ্গবিশেষ, কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ও পায়খানা—ইহাকে too much of a good thing বলে। আমরা কু-অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে কষ্টকর।

গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটী স্নানের বাল্‌তী, জল রাখিবার একটী টিনের নলাকার বাল্‌তী এবং দুটী জেলের কম্বল। স্নানের বাল্‌তী উঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্নান করিতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জল-কষ্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ পার্শ্বের গোয়াল ঘরের কয়েদী স্নানের সময় আমার ইচ্ছামত বাল্‌তীতে জল ভরিয়া দিত, সেইজন্য স্নানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখ-প্রিয়তাকে তৃপ্ত করিবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, এক বাল্‌তীর জলেই তাহাদিগকে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন করিতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বলিয়া এই অতিমাত্র বিলাস করিতে দেওয়া হইত, কয়েদীদের দুই-চারি বাটি জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুর্লভ সদ্‌গুণ, তাহাদের জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা অতিরিক্ত স্নানসুখে কয়েদীর অনিচ্ছাজনিত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্ত্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বলিয়া তাচ্ছিল্য করিত। মানুষমাত্রই অসন্তোষ-প্রিয়। স্নানের ব্যবস্থা হইতে পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রীষ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটি উত্তপ্ত উনুনের মত হইয়া উঠিত। এই উনুনে সিদ্ধ হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ওই টিনের বাল্‌তীর অর্দ্ধ-উষ্ণ জল। বার বার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণাতো যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত। তবে এক একজনের উঠানে মাটির কলসী রাখা ছিল, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যা স্মরণ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিতেন। ইহাতে ঘোর পুরুষার্থবাদীকেও অদৃষ্ট মানিতে বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠাণ্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা লাগিয়াই থাকিত, সব কপালের জোর। কর্ত্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাত শূন্য হইয়া কলসী বা টিন বিতরণ করিতেন। এই যদৃচ্ছা লাভে আমি সন্তুষ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকষ্ট জেলের সহৃদয় ডাক্তার বাবুর অসহ্য হয়। তিনি কলসী যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব বন্দোবস্তে তাঁহার হাত নাই বলিয়া তিনি অনেক দিন তাহাতে কৃতকার্য্য হন

নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসী আবিষ্কার করিল। তাহার আগেই আমি তৃষ্ণার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে পিপাসা-মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটী মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটি কম্বল পাতিয়া আর একটি কম্বল পাট করিয়া বালিস বানাইয়া শুইতাম। যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটীতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম। মাতা বসুন্ধরার শীতল উৎসঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বুঝিতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ বড় কোমল নয়, তদ্দ্বারা নিদ্রার আগমন বাধা-প্রাপ্ত হইত বলিয়া কম্বলের শরণ লইতে হইত। যে দিন বৃষ্টি হইত সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটি এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়বৃষ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তান্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট খাট একটি জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রাত্রিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকৃতির এই লীলা বিশেষ সাঙ্গ হইলেও জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদ্রার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেননা শৌচক্রিয়ার সামগ্রীর নিকটই একমাত্র শুষ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও ঝড়ের দিনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসিত এবং ঘরের সেই তপ্ত উনুন তাত-বিদূরিত হইত বলিয়া ঝড়বৃষ্টিকে সাদরে স্বাগত করিতাম।

আলিপুর গবর্ণমেণ্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভবিষ্যতে আরও করিব, তাহা নিজের কষ্টভোগ জ্ঞাপন করিবার জন্য নয়;—সুসভ্য বৃটিশ রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, নির্দ্দোষীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী কি যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব কষ্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃঢ় ছিল বলিয়া কয়েকদিন মাত্র এই কষ্ট অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার পরে—কি উপায়ে তাহা পরে বলিব—মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কষ্ট অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মৃতি মনে উদয় হইলে ক্রোধ বা দুঃখ না হইয়া হাসিই পায়। যখন সর্ব্বপ্রথম জেলের বিচিত্র পোষাক পরিয়া আমার পিঞ্জরে ঢুকিয়া থাকিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম তখন এই ভাবই মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। আমি ইংরাজ জাতির ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ও রহস্যময় চরিত্র অনেকদিন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেইজন্য আমার প্রতি তাহাদের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম

না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে অতিশয় অনুদার ও নিন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে জমিদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলন্ডের শীর্ষ-স্থানীয় লোকের সমকক্ষ। আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন, চুরি, ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-চেষ্টা করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যন্ত্র। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পুলিসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতদের মত রাখা—চোর-ডাকাত কেন, পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকষ্ট, ক্ষুৎ-পিপাসা, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে বৃটিশ রাজপুরুষদের ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চরিত্র-গত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ থাকিলেও শত্রু বা বিরুদ্ধা-চারণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল-আনা বেণে। আমার কিন্তু তখন বিরক্তি ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দেখিয়া একটু আনন্দিত হইয়াছিলাম, অধিকন্তু এই ব্যবস্থা মাতৃভক্তির প্রেমভাবে আহুতি দান করিল। একে বুঝিলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্দ্বজয়ে অপূর্ব্ব উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি চরমপন্থী দলের একজন, যাহাদের মতে প্রজাতন্ত্র এবং ধনী-দরিদ্রে সাম্য জাতীয় ভাবের একটি প্রধান অঙ্গ। মনে পড়িল সেই মতকে কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য বলিয়া সুরাট যাত্রার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হইয়াছিলাম, ক্যাম্পে নেতারা নিজেদের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না করিয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক ঘরে শুইতাম। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, গুজরাটি দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকিতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে শয্যা, ডাল-ভাত দহিই আহার, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী ধরণের পরাকাষ্ঠা হইয়া-ছিল। কলিকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক কাটা ব্রাহ্মণ-সন্তান এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। এই আলিপুর জেলে বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম-বাগ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্য্যাদা লাভ করিয়া বুঝিলাম সর্ব্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপী ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জীবনব্রতে স্বাক্ষর দিয়াছেন। যেদিন জন্মভূমিরূপিণী জগজ্জননীর পবিত্র মণ্ডপে দেশের সর্ব্ব শ্রেণী ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ হইয়া জগতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামী ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপুরুষদের এই সাম্যভাবে এই

কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভ দিনের পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়া কতবার হর্ষান্বিত ও পুলকিত হইতাম। সেদিন দেখিলাম পুনার "Indian Social Reformer" আমার একটি সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, "জেলে ভগবৎসান্নিধ্যের বড় ছড়াছড়ি হইল দেখিতেছি!" হায়, মানসম্ভ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গুণে গর্ব্বিত মানুষের অহংকার ও অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবৎপ্রকাশ না হইয়া বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেষী স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শয্যায় তাহা সম্ভব? ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তিনি দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ প্রকাশ করেন। যিনি মানবমাত্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী-গরীব পতিত পাপীতে নারায়ণকে দেখিয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উত্থানোদ্যত পতিত জাতির মধ্যে দেশ-সেবকের নির্জ্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব।

জেলর আসিয়া কম্বল ও থালা-বাটির বন্দোবস্ত করিয়া চলিয়া গেলে পর আমি কম্বলের উপরে বসিয়া জেলের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। এই নির্জ্জন কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই প্রকাণ্ড ঘরের নির্জ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও নির্জ্জনতা বৃদ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পক্ষী বাড়ী-ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকটে বসিলে বাহিরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদীদের যাতায়াত দেখা যায়। উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে শান্ত্রী ঘুরিয়া থাকে, তাহার মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পরিচিত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে অপূর্ব্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসিবার আগে মানুষের মধ্যেও আমার ব্যক্তিগত ভালবাসা অতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং পশু-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেম-স্রোত প্রায় বহিত না। মনে আছে রবিবাবুর একটি কবিতায় মহিষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে, সেই কবিতা প্রথম পড়িয়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ভাবের বর্ণনায় অতিশয়োক্তি ও অস্বাভাবিকতা দোষ দেখিয়াছিলাম।

এখন পড়িলে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আলিপুরে বসিয়া বুঝিতে পারিলাম, সর্ব্বপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান পাইতে পারে, গরু, পাখী, পিপীলিকা পর্য্যন্ত দেখিয়া কি তীব্র আনন্দ স্ফুরণে মানুষের প্রাণ অস্থির হইতে পারে।

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই নূতন, তাহাতে মনে স্ফূর্ত্তি হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা করিয়া এই অবস্থাতেই প্রীতিলাভ করিলাম এবং ভগবানের উপর নির্ভর ছিল বলিয়া এখানে নির্জ্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অদ্ভুত চেহারা দেখিয়াও এই ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া,—স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জ্জন করিলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ভাত। জিনিষটা বদলান দূরের কথা চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহার ঐ নিত্য সনাতন অনাদ্যনন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে এই নশ্বর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও অন্য আসামী হইতে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাহাও ডাক্তারবাবুর দয়ায়। তিনি আমার জন্য হাস্পাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কয়েকদিন শাক দর্শন হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।

সেই রাত্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রাভোগ করা নির্জ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখপ্রিয়তা জাগিতে পারে। সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই। যাঁহারা যাঁহারা ছয় ডিক্রীতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ ছিলেন,—সিপাহীদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানুভূতির ভাব অধিক ছিল, বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদের স্বভাব এইরূপ। কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাদিগকে এইরূপ উঠাইয়া এই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত, "বাবু ভাল আছেন ত?" এই অসময় রহস্য সব সময় প্রীতিকর হইত না, তবে বুঝিলাম যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা সরলভাবে নিয়ম বলিয়া আমাদিগকে উঠাইতেছে। কয়েক দিন বিরক্ত হইয়াও

ইহা সহ্য করিলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চারি-বার ধমক দিবার পরে দেখিলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপনিই উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে চারিটা বাজিয়া পনের মিনিটে জেলের ঘণ্টা বাজিল। কয়েদী-দের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘণ্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘণ্টা বাজে, তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাহিরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফ্‌সী খাইয়া খাটুনি আরম্ভ করে। এত ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া আমিও উঠিলাম। ৫টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত-মুখ ধুইয়া আবার ঘরে বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাজির হইল কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হইল। ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফ্‌সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্‌সীর ত্রিমূর্ত্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্‌সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্ত্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্‌সীর হিরণ্যগর্ভ, ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ি নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্ম্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিনে লফ্‌সীর বিরাট মূর্ত্তি অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ, কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যের ব্যব-হার যোগ্য। আমি প্রাজ্ঞ ও হিরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্ত্ত্য মনুষ্যের অতীত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, এক একবার বিরাটের দুগ্রাস উদরস্থ করিয়া বৃটিশ রাজত্বের নানা সদ্‌গুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের humanita-rianism ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে মগ্ন হইতাম। বলা উচিত লফ্‌সীই বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর আহার, আর সবই সারশূন্য। তাহা হইলেও বা কি হইবে? তাহার যেরূপ স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়।

সেদিন সাড়ে এগারটার সময় স্নান করিলাম। প্রথম চারি পাঁচ দিন বাড়ী হইতে যাহা পরিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের বৃদ্ধ কয়েদী ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি একটি এণ্ডির দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় করিয়াছিলেন, আমার একমাত্র বস্ত্র শুকান পর্য্যন্ত ইহা পরিয়া বসিয়া থাকি-তাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাজিতে হইত না, গোয়ালঘরে একজন কয়েদী ইহা করিত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরে চুপড়ির সান্নিধ্য বর্জ্জন করিবার জন্য গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য করিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শান্ত্রীও ইহাতে বাধা দিতেন না। সন্ধ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। তাহার পর আর গারদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘণ্টা বাজে। মুখ্য জমাদার কয়েদী ওয়ার্ডারদের একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম

পড়িয়া যান, তাহার পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যায়। শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ লইয়া জেলের সেই একমাত্র সুখ অনুভব করে। এই সময় দুর্ব্বলচেতা নিজের দুর্ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ ভাবিয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত, নীরব রাত্রিতে ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধ্যানে আনন্দ ভোগ করেন। রাত্রিতে এই দুর্ভাগ্য পতিত সমাজ-পীড়িত তিন সহস্র ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীর সেই আলিপুর জেল স্বরূপ প্রকান্ড যন্ত্রণাগৃহ বিশাল নীরবতায় মগ্ন হয়।

যাঁহারা আমার সঙ্গে এক অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁহাদের সঙ্গে জেলে প্রায়ই দেখা হইত না। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে রক্ষিত ছিলেন। ছয় ডিক্রীর পশ্চাদ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের দুটী লাইন ছিল, এই দুটি লাইনে সব শুদ্ধ চুয়াল্লিশটি ঘর, সেই জন্য ইহাকে চুয়াল্লিশ ডিক্রী বলে। এই ডিক্রীর একটী লাইনে অধিকাংশ আসামীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা cell-এ আবদ্ধ হইয়াও নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করেন নাই, কেন না এক ঘরে তিনজন করিয়া থাকিতেন। জেলের অন্য দিকে আর একটী ডিক্রী ছিল, তাহাতে কয়েকটি বড় ঘর ছিল; এক একটী ঘরে বারজন পর্য্যন্ত থাকিতে পারিত। যাঁহাদের ভাগ্যে এই ডিক্রী পড়িত, তাঁহারা অধিক সুখে থাকিতেন। এ ডিক্রীতে অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রাত দিন গল্প করিবার অবসর ও মনুষ্যসংসর্গ লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সুখে বঞ্চিত ছিলেন। ইনি হেমচন্দ্র দাস। জানি না কেন ইঁহার উপর কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভয় অথবা ক্রোধ ছিল, এত লোকের মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকেই স্বতন্ত্র করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের নিজের ধারণা ছিল যে, পুলিস অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার উপর এই ক্রোধ। তাঁহাকে এই ডিক্রীর একটী অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ করিয়া বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বলিয়াছি, ইহাই এই বিশেষ সাজার চরম অবস্থা। মাঝে মাঝে পুলিস নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির সাক্ষী আনাইয়া identification প্রহসন অভিনয় করাইত। তখন আমাদের সকলকে আফিসের সম্মুখে এক দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইত। জেলের কর্তৃপক্ষেরা আমাদের সঙ্গে জেলের অন্য অন্য মোকদ্দমার আসামী মিশাইয়া তাহাদিগকে দেখাইতেন। ইহা কিন্তু নামের জন্য। এই আসামীদের মধ্যে শিক্ষিত বা ভদ্রলোক একজনও ছিল না, যখন তাহাদের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতাম, তখন এই দুই প্রকার আসামীবর্গের এত

অমিল থাকিত যে, এক দিকে বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বালকদের তেজস্বী তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশক মুখের ভাব ও গঠন এবং অন্যদিকে সাধারণ আসামীর মলিন পোষাক ও নিস্তেজ মুখের চেহারা দেখিয়া কে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা যিনি নির্ণয় করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ কেন, নিকৃষ্ট মনুষ্যবুদ্ধিরহিত বলিতে হয়। এই identification প্যারেড আসামীদের অপ্রিয় ছিল না। এতদ্দ্বারা জেলের একঘেয়ে জীবনের একটি বৈচিত্র্য হইত, এবং পরস্পরকে দুটী কথাও বলিবার অবকাশ পাওয়া যাইত। গ্রেপ্তারের পর এইরূপ একটী প্যারেডে আমার ভাই বারীন্দ্রকে প্রথম দেখিতে পাইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন কথা হয় নাই। প্রায়ই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে তখন এই সময়ে আলাপ একটু অধিক হইয়াছিল। গোঁসাই অতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায় কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুবৃত্তি প্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই। এই বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ প্রভেদ ছিল। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পবিত্র ভাব অধিক এবং কথায় প্রখর বুদ্ধি, জ্ঞানলিপ্সা ও মহৎ স্বার্থহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। গোঁসাইয়ের কথা নির্ব্বোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালাস পাইবেন। তিনি বলিতেন, "আমার বাবা মোকদ্দমার কীট, তাঁহার সঙ্গে পুলিস কখনও পারিবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, প্রমাণিত হইবে পুলিস আমাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি পুলিসের হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায় ?" গোঁসাই অম্লানবদনে বলিলেন, "আমার বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, ও সব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।" এইরূপ লোকই Approver হয়।

ইতিপূর্ব্বে আসামীর অনর্থক অসুবিধা ও নানা কষ্টের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে এই সকলই জেলের প্রণালীর দোষ: এই সকল কষ্ট জেলের কাহারও ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে হয় নাই। বরং আলিপুর জেলে যাঁহাদের উপর কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা সকলেই অতিশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যদি কোনও জেলে কয়েদীর যন্ত্রণার কম হয়, য়ুরোপীয় জেল প্রণালীর অমানুষিক বর্ব্বরতা, দয়ায় ও ন্যায়পরায়ণতায় লঘুকৃত হয়, তবে আলিপুর জেলে ও এমারসন সাহেবের রাজত্বে সেই মন্দের ভাল ঘটিয়াছে। এই ভাল হইবার দুটী প্রধান কারণ জেলের ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এমারসন সাহেব ও বাঙ্গালী হাসপাতাল আসিষ্টাণ্ট ডাক্তার বৈদ্যনাথ চাটার্জির অসাধারণ গুণ। ইঁহাদের মধ্যে একজন

য়ুরোপের লুপ্তপ্রায় খৃষ্টান আদর্শের অবতার, অপরটী হিন্দুধর্ম্মের সার-মর্ম্ম দয়া ও পরোপকারের জীবন্ত মূর্ত্তি। এমারসন সাহেবের মত ইংরাজ আর এই দেশে বড় আসে না, বিলাতেও আর বড় জন্মায় না। তাঁহার শরীরে খৃষ্টান gentleman-এর যে সকল গুণ হওয়া উচিত, সকলই এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি শান্তিপ্রিয়, বিচারশীল, দয়াদাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, ন্যায়বান; ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন অধমের প্রতিও অভদ্রতা প্রকাশ করিতে স্বভাবতঃ অক্ষম, সরল, অকপট, সংযমী। দোষের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও উদ্যম কম ছিল, জেলরের উপর সমুদয় কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিতেন। ইহাতে যে বড় বেশী ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। জেলর যোগেন্দ্রবাবু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন, বহুমূত্র রোগে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াও স্বয়ং কার্য্য দেখিতেন এবং সাহেবের স্বভাব চিনিতেন বলিয়া জেলে ন্যায়নিষ্ঠা ও ক্রূরতার অভাব রক্ষা করিতেন। তবে তিনি এমারসনের মত মহাত্মা লোক ছিলেন না, সামান্য বাঙ্গালী সরকারী ভৃত্য মাত্র, সাহেবের মন রাখিতে জানিতেন, দক্ষতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত কর্ম্ম করিতেন, স্বাভাবিক ভদ্রতা ও শান্তভাবের সহিত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইহা ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোন বিশেষ গুণ লক্ষ্য করি নাই। চাকরীর উপর তাঁহার প্রবল মায়া ছিল। বিশেষতঃ তখন মে মাস, পেন্সন নিবার সময় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, জানুয়ারীতে পেন্সন নিয়া দীর্ঘ পরিশ্রমোপার্জ্জিত বিশ্রাম ভোগ করিবার আশা তখন বর্ত্তমান ছিল। আলিপুরের বোমার মোকদ্দমার আসামীর আবির্ভাব দেখিয়া আমাদের জেলর মহাশয় নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সব উগ্রস্বভাব তেজস্বী বাঙ্গালী বালক কোন্ দিনে কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন, এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া থাকিতেন। তিনি বলিতেন, তালগাছে চড়িতে আর দেড়ইঞ্চি বাকী। কিন্তু সেই দেড়-ইঞ্চির অর্দ্ধেকটা মাত্র তিনি চড়িতে পারিয়াছিলেন। আগষ্ট মাসের শেষেই বোকানন সাহেব জেলে পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। জেলর মহাশয় আনন্দে বলিলেন, “আমার কর্ম্মকালে এই সাহেবের শেষ আসা, আর পেন্সনের ভয় নাই।” হায়. মানুষ মাত্রের অন্ধতা! কবি যথার্থই বলিয়াছেন, বিধি দুঃখী মনুষ্যের দুটী পরম উপকার করিয়াছেন। প্রথম, ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়, তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনাস্থল স্বরূপ অন্ধ আশা তাহাকে দিয়াছেন। এই উক্তির চার পাঁচদিন পরেই নরেন গোঁসাই কানাইয়ের হস্তে হত হইলেন, বোকাননের জেলে ঘন ঘন আসা আরম্ভ হইল। তাহার ফলে যোগেন্দ্র বাবুর অকালে কর্ম্ম গেল এবং শোক ও রোগের মিলিত আক্রমণে তাঁহার দেহত্যাগও ঘটিল। এইরূপ কর্ম্মচারীর উপর সম্পূর্ণ ভার না দিয়া এমারসন সাহেব যদি স্বয়ং

সব কার্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকালে আলিপুর জেলের অধিক সংস্কার ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি যতটুকু দেখিতেন, তাহা সুসম্পন্নও করিতেন, তাঁহার চরিত্রগত গুণেও জেলটী নরক না হইয়া মানুষের কঠোর শাস্তির স্থানই হইয়া রহিয়াছিল। তিনি অন্যত্র গেলেও তাঁহার সাধুতার ফল সম্পূর্ণ ঘুচে নাই, এখনও পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীগণ তাঁহার সাধুতা দশ আনা বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

যেমন জেলের অন্যান্য বিভাগে বাঙ্গালী যোগেন বাবু হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন, তেমনই হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবু সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার উপরিস্তন কর্ম্মচারী ডাক্তার ডেলী, এমারসন সাহেবের ন্যায় দয়াবান না হইয়াও অতিশয় ভদ্রলোক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বালকদের শান্ত আচরণ, প্রফুল্লতা ও বাধ্যতা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা করিতেন এবং অল্পবয়স্কদের সহিত হাসিতামাসা ও অপর আসামীদের সহিত রাজনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শনবিষয়ক চর্চ্চা করিতেন। ডাক্তার সাহেব আইরিশ বংশজাত, সেই উদার ও ভাবপ্রবণ জাতির অনেক গুণ তাঁহার শরীরে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তাঁহার লেশমাত্র ক্রূরতা ছিল না, এক একবার ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রূঢ় কথা বা কঠোর আচরণ করিতেন কিন্তু প্রায়ই উপকার করাই তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি জেলের কয়েদীদের চাতুরী ও কৃত্রিম রোগ দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এমনও হইত যে প্রকৃত রোগীকেও এই কৃত্রিমতার ভয়ে উপেক্ষা করিতেন, তবে প্রকৃত রোগ বুঝিতে পারিলে অতি যত্ন ও দয়ার সহিত রোগীর ব্যবস্থা করিতেন। আমার একবার সামান্য জ্বর হয়। তখন বর্ষাকাল, অনেক বাতায়নযুক্ত প্রকাণ্ড দালানে জলসিক্ত মুক্ত বায়ু খেলা করিত, তথাপি আমি হাসপাতালে যাইতে বা ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং ঔষধ সেবনে আমার আর বড় আস্থা ছিল না, রোগ কঠোর না হইলে প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়াতেই স্বাস্থ্যলাভ হইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বর্ষার বাতাস স্পর্শে যাহা অনিষ্ট হওয়া সম্ভব, তাহা যোগবলে দমন করিয়া নিজের তর্কবুদ্ধির নিকট আমার যোগশিক্ষাগত ক্রিয়া সকলের যাথার্থ্য ও সফলতা প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা ছিল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু আমার জন্য মহা চিন্তিত ছিলেন, বড় আগ্রহের সহিত তিনি হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজনীয়তা আমাকে বুঝাইলেন। সেই-স্থানে গমন করিলে যতদূর সম্ভব নিজের বাড়ীর মত থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে সাদরে রাখিলেন। পাছে ওয়ার্ডে থাকিলে বর্ষার জন্য আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে অনেকদিন এই সুখে

রাখেন। কিন্তু আমি জোর করিয়া ওয়ার্ডে ফিরিয়া গেলাম, আর হাসপাতালে থাকিতে অসম্মত হইলাম। তাঁহার সকলের উপর সমান অনুগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ যাঁহারা পুষ্টশরীর ও বলবান ছিলেন, তাঁহাদের রোগ হইলেও হাসপাতালে রাখিতে ভয় করিতেন। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যদি জেলে কোনও কান্ড হয় তাহা সবল ও চঞ্চল বালকদের দ্বারা হইবে। শেষে ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইল, হাসপাতালে যে কান্ড ঘটিল, তাহা ব্যাধিগ্রস্ত, বিশীর্ণ, শুষ্ককায় সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং রোগক্লিষ্ট ধীরপ্রকৃতি অল্পভাষী কানাইলাল ঘটাইলেন। ডাক্তার ডেলীর এই সকল গুণ থাকিলেও বৈদ্যনাথ বাবুই তাঁহার অধিকাংশ সৎকার্য্যের প্রবর্ত্তক ও প্রেরণাদায়ক ছিলেন। বাস্তবিক বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক আমি আগেও দেখি নাই, পরেও দেখিবার আশা করি না, তিনি যেন দয়া ও উপকার করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কোনও দুঃখ কাহিনী অবগত হওয়া এবং তাহা লাঘব করিবার জন্য ধাবিত হওয়া তাঁহার চরিত্রে যেন স্বাভাবিক কারণ ও অবশ্যম্ভাবী কার্য্য হইয়াছিল। তিনি এই যন্ত্রণাপূর্ণ দুঃখালয়ে যেন নরকের প্রাণী সকলকে স্বর্গের সযত্ন সঞ্চিত নন্দনবারি বিতরণ করিতেন। কোনও অভাব, অন্যায় বা অনর্থক কষ্ট অপনোদন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহা ডাক্তার বাবুর কর্ণে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাহা অপনোদন করা তাঁহার ক্ষমতার ভিতরে থাকিলে তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে ছাড়িতেন না। বৈদ্যনাথ বাবু হৃদয়ে গভীর দেশভক্তি পোষণ করিতেন কিন্তু সরকারী চাকর বলিয়া প্রাণের সেই ভাবকে চরিতার্থ করিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁহার একমাত্র দোষ অতিরিক্ত সহানুভূতি। কিন্তু সেই ভাব জেলের কর্ম্মচারীর পক্ষে দোষ হইলেও উচ্চ নীতির অনুসারে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং ভগবানের প্রিয়তম গুণ বলা যায়। সাধারণ কয়েদী ও "বন্দেমাতরং" কয়েদীতে তাঁহার পক্ষে কোনও ভেদ ছিল না; পীড়িত দেখিলে সকলকেই যত্ন করিয়া হাসপাতালে রাখিতেন এবং সম্পূর্ণ শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেন না। এই দোষই তাঁহার পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। গোঁসাইয়ের হত্যার পরে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই আচরণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে কর্ম্মচ্যুত করেন।

এই সকল কর্ম্মচারীদের দয়া ও মনুষ্যোচিত ব্যবহার বর্ণনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। জেলে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহার পরেও বৃটিশ জেলপ্রণালীর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। পাছে কোনও পাঠক এই নিষ্ঠুরতা কর্ম্মচারীদের চরিত্রের কুফল বলিয়া মনে করেন, সেইজন্য মুখ্য কর্ম্মচারীদের গুণ বর্ণনা করিলাম। কারাবাসের প্রথম অবস্থার বিবরণে তাঁহাদের এই সকল গুণের আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

নির্জ্জন কারাবাসে প্রথম দিনের মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছি। এই নির্জ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায় স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু ব্যতীত কয়েকদিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া আমাকে বাড়ী হইতে ধুতি জামা ও পড়িবার বই আনাইবার অনুমতি দিয়া যান। আমি কর্ম্মচারীদের নিকট কালি কলম ও জেলের ছাপান চিঠির কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসোমহাশয় সঞ্জীবনীর সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদককে ধুতি জামা এবং পড়িবার বইর মধ্যে গীতা ও উপনিষদ পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পৌঁছিতে দুই চারি দিন লাগে। তাহার পূর্ব্বে নির্জ্জন কারাবাসের মহত্ত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিরও ধ্বংস হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বুঝিতে পারিলাম এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসীম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার কি দুর্লভ সুবিধা হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইল। কারাবাসের পূর্ব্বে আমার সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই নির্জ্জন কারাবাসে আর কোনও কার্য্য না থাকায় অধিককাল ধ্যানে থাকিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মানুষের সহস্র-পথ-ধাবিত চঞ্চল মনকে ধ্যানার্থে অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখিতে পারিতাম, শেষে মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িত। প্রথম নানা চিন্তা লইয়া থাকিতাম। তাহার পরে সেই মানুষের আলাপ-রহিত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহনীয় অকর্ম্মণ্যতায় মন ধীরে ধীরে চিন্তা শক্তি রহিত হইতে লাগিল। এমন অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহস্র অস্পষ্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারিদিকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াও সেই নিস্তব্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিতেছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম। প্রকৃতির শোভায় চিত্তবৃত্তি স্নিগ্ধ হইবার এবং তপ্ত মন সান্ত্বনা পাইবার আশায় বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু সেই একমাত্র বৃক্ষ, নীল আকাশের পরিমিত খণ্ডটুকু এবং সেই জেলের নিরানন্দ দৃশ্যে কতক্ষণ মানুষের এই অবস্থাপ্রাপ্ত মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া মস্তিষ্ক পিঞ্জরে ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্ম্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শেষে মাটিতে কয়েকটি বড় বড় কাল

পিপীলিকা গর্ত্তের নিকট বেড়াইতেছে দেখিলাম, তাহাদের গতিবিধি ও চেষ্টা চরিত্র নিরীক্ষণ করিতে সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালেতে বড় ঝগড়া, কালগুলি লালকে পাইয়া দংশন করিতে করিতে প্রাণবধ করিতে লাগিল। অত্যাচার পীড়িত লাল পিপীলিকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আমি কালগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগিলাম। ইহাতে একটি কার্য্য জুটিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকাগুলির সাহায্যে এই কয়েক-দিন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ দিনার্দ্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতে-ছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম, কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল। কাল যেন তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পীড়ন করিতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে হাঁপ ছাড়িবার শক্তিও পাইতেছে না, যেন স্বপ্নে শত্রুস্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গলাপীড়নে মরিয়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাকিয়াও নড়িবার শক্তি রহিত। আমি এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম! সত্য বটে, আমি কখন অকর্ম্মণ্য নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে ভালবাসি নাই, তবে কতবার একাকী থাকিয়া চিন্তায় কালযাপন করিয়াছি, এক্ষণে এতই কি মনের দুর্ব্বলতা হইয়াছে যে অল্প-দিনের নির্জ্জনতায় এত আকুল হইয়া পড়িতেছি? ভাবিতে লাগিলাম, হয়ত সেই স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাপ্ত নির্জ্জনতায় অনেক প্রভেদ আছে। বাড়ীতে বসিয়া একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারা-গৃহে এই নির্জ্জনবাস স্বতন্ত্র কথা। সেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় লইতে পারি, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষা লালিত্যে, বন্ধু-বান্ধবের প্রিয় সম্ভা-ষণে, রাস্তার কোলাহলে, জগতের বিবিধ দৃশ্যে মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রাণকে শীতল করিতে পারি। কিন্তু এখানে কঠিন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া পরের ইচ্ছায় সর্ব্বসংস্রব রহিত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে নির্জ্জ-নতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতাম না, এখন বুঝিলাম সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। ইতালীর রাজহত্যাকারী ব্রেশীর ভীষণ পরিণাম মনে পড়িল। তাঁহার নিষ্ঠুর বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বৎসরের নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। এক বৎসরও অতিবাহিত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এতদিন সহ্য করিলেন ত! আমার মনের দৃঢ়তা কি এতই কম? তখন বুঝিতে পারি নাই যে ভগবান আমার সহিত খেলা করিতেছেন, ক্রীড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। প্রথমতঃ, কি রূপে মনের গতিতে নির্জ্জন কারাবাসের কয়েদী উন্মত্ততার দিকে

ধাবিত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইরূপ কারাবাসের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বুঝাইয়া আমাকে য়ুরোপীয় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী করিলেন, এবং যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগৎকে এই বর্ব্বরতা হইতে ফিরাইয়া দয়ানুমোদিত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতী করিবার চেষ্টা করি তিনি সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় কংগ্রেসের নিবেদন-নীতির তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধগুলির ফল হইতেছে দেখিয়া তাহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবামাত্র আমাকে আধঘণ্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তিনি আমার উপর জেলপ্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাণাডের এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে ইহা সুদূর ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস মাত্র এবং একদিন স্বয়ং ভগবান আমাকে জেলে এক-বৎসর কাল রাখিয়া সেই প্রণালীর ক্রূরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবেন। এক্ষণে বুঝিলাম অদ্যকার রাজনৈতিক অবস্থায় এই জেলপ্রণালীর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তবে স্ব-অধিকার প্রাপ্ত ভারতে যাহাতে বিদেশী সভ্যতার এই নারকীয় অংশ গৃহীত না হয়, তাহা প্রচার করিতে ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে জেলে বসিয়া আমার অন্তরাত্মার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবানের দ্বিতীয় অভিসন্ধি বুঝিলাম, আমার মনের এই দুর্ব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে যোগাবস্থা-প্রার্থী তাহার পক্ষে জনতা ও নির্জ্জনতা সমান হওয়া উচিত। বাস্তবিক অতি অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্ব্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ হয় বিশ বৎসর একাকী থাকিলেও মন টলিবে না। মঙ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও পরম মঙ্গল ঘটান। তৃতীয় অভিসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছু হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধিলাভের পন্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শক্তি সিদ্ধি বা আনন্দ দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্য্যে লাগান আমার যোগলিপ্সার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে-দিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘীভূত হইতে লাগিল, সে-দিন হইতে আমি জগতের ঘটনাসকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে মঙ্গলময় শ্রীহরির আশ্চর্য্য অনন্ত মঙ্গল স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এমন ঘটনা নাই,—সেই ঘটনা মহান্ হোক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হোক,—যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য্য দ্বারা দুই চারি

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বুদ্ধির দোষ দিই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশী শক্তি কখনও অন্ধ ভাবে কার্য্য করেন না, তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হইতে পারে না, বরং তিনি এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।

এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেষ্টতায় পীড়িত হইয়া কয়েক দিন কষ্টে কাল-যাপন করিলাম। একদিন অপরাহ্নে আমি চিন্তা করিতেছিলাম, চিন্তা আসিতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে লাগিল যে বুঝিতে পারিলাম চিন্তার উপর বুদ্ধির নিগ্রহশক্তি লুপ্ত হইতে চলিল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পড়িল যে বুদ্ধির নিগ্রহ শক্তি লুপ্ত হইলেও বুদ্ধি স্বয়ংলুপ্ত বা এক মুহূর্ত্ত ভ্রষ্ট হয় নাই, বরং শান্তভাবে মনের এই অপূর্ব্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু তখন আমি উন্মত্ততা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিলাম, আমার বুদ্ধিভ্রংশ নিবারণ করিতে বলিলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শীতলতা ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখী হইল যে পূর্ব্বে এই জীবনে এমন সুখময় অবস্থা অনুভব করিতে পারি নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশ্বস্ত ও নির্ভীক হইয়া শুইয়া থাকে আমিও যেন বিশ্বজননীর ক্রোড়ে সেইরূপ শুইয়া রহিলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কষ্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, নির্জ্জন কারাবাস ও কর্ম্মহীনতায় মনের অশোয়াস্তি, শারীরিক ক্লেশ বা ব্যাধি, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু সে দিনে ভগবান এক মুহূর্ত্তে অন্তরাত্মায় এমন শক্তি দিলেন যে এই সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চিহ্ন রাখিতে পারিত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বুদ্ধি মনের দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপত্রে জলবিন্দুবৎ বোধ হইত। তাহার পরে যখন পুস্তক আসিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। বই না আসিলেও আমি থাকিতে পারিতাম। যদিও আমার আন্তরিক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য নয়, তথাপি এই ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পরে দীর্ঘ-কাল নির্জ্জন করাবাসে কেমন করিয়া অনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা হইতেই বোঝা যাইবে। এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। তিনি উন্মত্ততা না ঘটাইয়া নির্জ্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমবিকাশের প্রণালী আমার মনের মধ্যে অভিনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচলিত দর্শক-

রূপে বসাইয়া রাখিলেন। তাহাতে আমি শক্তি পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় অত্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাড়িল এবং প্রার্থনার অসাধারণ শক্তি ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম।

আমার নির্জ্জন কারাবাসের সময় ডাক্তার ডেলী ও সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দুই চারিটি গল্প করিয়া যাইতেন। জানি না কেন, আমি প্রথম হইতে তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহ ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আমি উহাদের সহিত বিশেষ কোন কথা কহিতাম না, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার উত্তর দিতাম। যে বিষয় উত্থাপন করিতেন, তাহা হয় নীরবে শুনিতাম, না হয় দু' একটী সামান্য কথা মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতাম। তথাপি তাঁহারা আমার নিকট আসিতে ছাড়িতেন না। একদিন ডেলী সাহেব আমাকে বলিলেন, আমি সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া বড় সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি প্রত্যহ সকালে ও বিকালে ডিক্রীর সামনে বেড়াইতে পারিবে। তুমি যে সমস্ত দিন এক ক্ষুদ্র কুঠ্‌রীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না, ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয়। সেই দিন হইতে আমি সকালে বিকালে ডিক্রীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম। বিকালে দশ মিনিট, পনর মিনিট, কুড়ি মিনিট বেড়াইতাম, কিন্তু সকালে এক ঘণ্টা, এক একদিন দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিতাম, সময়ের কোনও নিয়ম ছিল না। এই সময় বড় ভাল লাগিত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরদিকে গোয়াল ঘর—আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়াল ঘর, গোয়াল ঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে হয় উপনিষদের গভীর ভাবোদ্দীপক অক্ষয় শক্তিদায়ক মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিতাম, না হয় কয়েদীদের কার্য্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বঘটে নারায়ণ এই মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতাম। বৃক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, পশুতে, পক্ষীতে, ধাতুতে, মৃত্তিকায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মনে মনে এই মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বভূতে সেই উপলব্ধি আরোপ করিতাম। এইরূপ করিতে করিতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই সূর্য্যরশ্মিদীপ্ত নীলপত্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্র যেন আর অচেতন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। মনুষ্য, গাভী, পিপীলিকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বলিতেছে,

অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান্ নির্ম্মল নির্লিপ্ত আত্মা শান্তি-ময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এক একবার এমন বোধ হইত যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় টানিয়া বাহির করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে লাগিল, যেন কে আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে আমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছে। এই ভাববিকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করিয়া কি এক নির্ম্মল মহতী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণ খুলিয়া গেল এবং সর্ব্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত বহিতে থাকিল। প্রেমের সহিত দয়া, করুণা, অহিংসা ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব আমার রজঃপ্রধান স্বভাবকে অভিভূত করিয়া বিশেষ বিকাশ লাভ করিতে লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং নির্ম্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আনিয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্তি ও অভিযোগখন্ডন হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। ইহার পরে অনেক দিন আমার জেলের কোনও কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েক দিন লাগিল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। নির্জ্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ বহির্জ্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় বিচলিত হইল, সাধনার ধৈর্য্যভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টাকাল মোকদ্দমার নীরস ও বিরক্তির কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বসিয়া সাধনা করিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশ্যের দিকে আকৃষ্ট হইত; গোলের মধ্যে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সমীপবর্ত্তী শব্দ দৃশ্য মনের বহির্ভূত করিয়া সমস্ত চিন্তাশক্তি অন্তর্মুখী করিবার শক্তি জন্মাইয়াছিল, কিন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতাম, অন্য চিন্তা করিতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণ-যোগ্য কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখিতাম নির্জ্জন কারাগৃহে যেমন সময় কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর মোকদ্দমার জীবন মরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। অভিযুক্ত বালকদের হাসি তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ শুনিতে ও দেখিতে বড় ভাল লাগিত, নচেৎ আদালতের সময় কেবলই বিরক্তিকর বোধ হইত।

সাড়ে চারটা বাজিলে সানন্দে কয়েদীদের গাড়ীতে উঠিয়া জেলে যাইতাম।

পনর ষোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনুষ্য-জীবনের সংসর্গ ও পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাসি ও কথার ফোয়ারা খুলিয়া যাইত এবং যে দশ মিনিটকাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মুহূর্ত্তও সেই স্রোত থামিত না। প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সহিত আদালতে লইয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই য়ুরোপীয়ান সার্জ্জেণ্টের ক্ষুদ্র পল্টন এবং তাহাদের নিকট আবার গুলিভরা পিস্তল ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় এক-দল সশস্ত্র পুলিশ আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিত এবং গাড়ীর পশ্চাতে কুচ-কাওয়াজ করিত, নামিবার সময়ও তদ্রূপ আয়োজন ছিল। এই সাজসজ্জা দেখিয়া কোন কোন অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন যে, এই হাস্যপ্রিয় অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহসিক বিখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খালি হাতে শত পুলিস ও গোরার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন করিতেও সক্ষম। সেইজন্য বোধ হয় অতি সম্মানের সহিত তাহাদিগকে এইরূপে লইয়া গেল। কয়েক দিন এইরূপ ঠাট চলিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল, শেষে দুই চারিজন সার্জ্জেণ্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসিত। নামিবার সময় তাহারা বড় দেখিত না, আমরা কি ভাবে জেলে ঢুকি; আমরা যেন স্বাধীন ভাবে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, সেইরূপে জেলে ঢুকিতাম। এই-রূপ অযত্ন ও শিথিলতা দেখিয়া পুলিস কমিশনার সাহেব ও কয়েকজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চটিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রথম দিন পঁচিশ ত্রিশজন সার্জ্জেণ্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আজকাল দেখিতেছি, চার পাঁচজনও আসে না।" তাঁহারা সার্জ্জেণ্টদের তিরস্কার করিতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর ব্যবস্থা করিতেন, তাহার পর দুদিন হয় ত আর দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিত, তাহার পর পূর্ব্বেকার শিথিলতা আবার আরম্ভ হইত! সার্জ্জেণ্টগণ দেখি-লেন যে, এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ শান্ত লোক, তাহাদের পলায়নের কোন উদ্যোগ নাই, কাহাকেও আক্রমণ করিবার বা হত্যা করিবার মৎলবও নাই, তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা কেন অমূল্য সময় এই বিরক্তিকর কার্য্যে নষ্ট করি। প্রথমে আদালতে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় আমাদিগকে তল্লাস করিত, তাহাতে সার্জ্জেণ্টদের কোমল করস্পর্শ সুখ অনুভব করিতাম, ইহা ভিন্ন এই তল্লাসে কাহারও লাভ বা ক্ষতির সম্ভবনা ছিল না। বেশ বোঝা গেল যে, এই তল্লাসের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল। দুই চারিদিন পরে ইহাও বন্ধ হইল। আমরা নির্ব্বিঘ্নে বই, রুটি, চিনি যাহা

ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম। প্রথম লুকাইয়া, তাহার পরে প্রকাশ্য ভাবে লইয়া যাইতাম। আমরা বোমা বা পিস্তল ছুঁড়িতে যাইব না, সেই বিশ্বাস তাঁহাদের শীঘ্র দূর হইল। কিন্তু দেখিলাম একমাত্র ভয় সার্জ্জেণ্টদের মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। কে জানে কাহার মনে কবে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ করিবার বদ মৎলব ঢুকিবে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। সেই জন্য জুতা লইয়া ভিতরে যাইবার সবিশেষে নিষেধ ছিল এবং সেই বিষয়ে সার্জ্জেণ্টগণ সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন। আর কোনরূপ সাবধানতার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য দেখি নাই।

মোকদ্দমার স্বরূপ একটু বিচিত্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট, কৌন্সিলী, সাক্ষী, সাক্ষ্য, Exhibits, আসামী, সকলই বিচিত্র। দিন দিন সেই সাক্ষী ও Exhibits-এর অবিরাম স্রোত, সেই কৌন্সিলীর নাটকোচিত অভিনয়, সেই বালক-স্বভাব ম্যাজিষ্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘুতা, সেই অপূর্ব্বভাব দেখিতে দেখিতে অনেকবার এই কল্পনা মনে উদয় হইত যে আমরা বৃটিশ বিচারালয়ে না বসিয়া কোন নাটগৃহের রঙ্গমঞ্চে বা কোনো কল্পনাপূর্ণ ঔপন্যাসিক রাজ্যে বসিয়া আছি। এক্ষণে সেই রাজ্যের বিচিত্র জীবসকলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব ছিলেন। তিনি প্রধান অভিনেতা কেন, এই নাটকের রচয়িতা, সূত্রধর (Stage manager) এবং সাক্ষীর স্মারক (prompter) ছিলেন,—এমন বৈচিত্র্যময় প্রতিভা জগতে বিরল। কৌন্সিলী নর্টন মাদ্রাজী সাহেব, সেইজন্য বোধ হয় বঙ্গদেশীয় ব্যারিষ্টার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রতায় অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিবাদ সহ্য করিতে অক্ষম এবং বিরুদ্ধাচারীকে শাসন করিতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্রস্বভাব বলে। নর্টন সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না, বলিতে পারি না, তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন অভিজ্ঞতার গভীরতায় মুগ্ধ হওয়া কঠিন—সে যেন গ্রীষ্মকালের শীত। কিন্তু বক্তৃতার অনর্গল স্রোতে, কথার পারিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভুত ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো করিবার মনোমোহিনী শক্তিতে নর্টন সাহেবের অতুলনীয় প্রতিভা দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হইত। শ্রেষ্ঠ কৌন্সিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে,—যাঁহারা আইন-পাণ্ডিত্যে এবং যথার্থ

ব্যাখ্যায় ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, যাঁহারা চতুর ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মোকদ্দমার বিষয়ীভূত ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সহিত প্রদর্শন করিয়া জজ বা জুরির মন নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাঁহারা কথার জোরে, বিভীষিকা প্রদর্শনে, বক্তৃতার স্রোতে সাক্ষীকে হতবুদ্ধি করিয়া, মোকদ্দমার বিষয়ের দিব্য গোলমাল করিয়া, গলার জোরে জজ বা জুরীর বুদ্ধি স্থানচ্যুত করিয়া মোকদ্দমায় জিতিতে পারেন। নর্টন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। ইহা দোষের কথা নহে। কৌন্সিলী ব্যবসায়ী মানুষ, টাকা নেন, যে টাকা দেয় তাহার অভিপ্সীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বৃটিশ আইন প্রণালী দ্বারা সত্য কথা বাহির করা বাদী প্রতিবাদীর আসল উদ্দেশ্য নহে, কোনও উপায়ে মোকদ্দমায় জয় লাভ করাই উদ্দেশ্য। অতএব কৌন্সিলী সেই চেষ্টা করিবেন, নচেৎ তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। ভগবান অন্য গুণ না দিয়া থাকিলে যে গুণ আছে, তাহার জোরেই মোকদ্দমায় জিতিতে হইবে, সুতরাং নর্টন সাহেব স্বধর্ম্ম পালনই করিতেছিলেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা দিতেন। এই অর্থব্যয় বৃথা হইলে সরকার বাহাদুরের ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিয়াছেন। তবে যে মোকদ্দমা রাজনীতি সংক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ উদার ভাবে আসামীকে সুবিধা দেওয়া এবং সন্দেহজনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর জোর না করা বৃটিশ আইন পদ্ধতির নিয়ম। নর্টন সাহেব যদি এই নিয়ম সর্ব্বদা স্মরণ করিতেন তবে আমার বোধ হয় না তাঁহার কেসের কোন হানি হইত। অপর দিকে কয়েকজন নির্দ্দোষী লোককে নির্জ্জন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচিতেও পারিতেন। কৌন্সিলী সাহেবের সিংহপ্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল। হলিংশেদ হল ও প্লুটার্ক যেমন সেক্সপিয়রের জন্য ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুলিস তেমনি এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সপিয়র ছিলেন, নর্টন সাহেব। তবে সেক্সপিয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দেখিয়াছিলাম। সেক্সপিয়র, সংগৃহীত উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাড়িয়াও দিতেন, নর্টন সাহেব ভাল মন্দ সত্য মিথ্যা সংলগ্ন অসংলগ্ন অনো অনীয়ান্, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন একটিও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কল্পনাসৃষ্ট প্রচুর suggestion, inference, hypothesis যোগাড় করিয়া এমন সুন্দর plot রচনা করিয়াছিলেন যে সেক্সপিয়র, ডেফো ইত্যাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বলিতে পারেন যে যেমন ফলষ্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ

ছিল, তেমনই নর্টনের plot-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশমন অনুমান ও suggestion ছিল। কিন্তু নিন্দুকও plot-এর পারিপাট্য ও রচনা-কৌশল প্রশংসা করিতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ করিয়াছিলেন দেখিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। যেমন মিল্টনের Paradise Lost-এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের plot-এর কল্পনাপ্রসূত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী bold bad man। আমিই জাতীয় আন্দোলনের আদি ও অন্ত, স্রষ্টা, পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী ইংরাজী লেখা দেখিবামাত্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন, অরবিন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সুশৃংখলিত অঙ্গ বা অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরবিন্দ ঘোষের সৃষ্টি, এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নিহিত। তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস ছিল যে আমি ধরা না পড়িলে বোধ হয় দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পাইলে নর্টন মহা খুসি হইতেন, এবং সাদরে এই পরম মূল্যবান প্রমাণ ম্যাজিষ্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ করিতেন। দুঃখের কথা, আমি অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, নচেৎ আমার প্রতি সেই সময়ের এত ভক্তি ও অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব নিশ্চয় তখনই মুক্তিলাভ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত হইত। সেশন্‌স্ আদালতে আমি নির্দ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন কৃত plot-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরসিক বীচক্রফ্‌ট হ্যামলেট নাটক হইতে হ্যামলেটকে বাদ দিয়া বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্যকে হতশ্রী করিয়া গেলেন। সমালোচককে যদি কাব্য পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে না কেন? নর্টন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে, কয়েক জন সাক্ষীও এইরূপ বেরসিক ছিল যে, তাঁহার রচিত plot-এর অনুযায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিল। নর্টন সাহেব ইহাতে চটিয়া লাল হইতেন, সিংহ গর্জ্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে শাসাইয়া দিতেন। স্বরচিত কথার অন্যথা প্রকাশে কবির এবং স্বদত্ত শিক্ষা-বিরুদ্ধে অভিনেতার আবৃত্তি, স্বর বা অঙ্গভঙ্গীতে নাটকের সূত্রধরের যে ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয়, নর্টন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত। ব্যারিষ্টার ভুবন চাটার্জীর সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সাত্ত্বিক ক্রোধই তাহার কারণ। চাটার্জী মহাশয়ের ন্যায় এরূপ রসানভিজ্ঞ লোক ত দেখি নাই। তাঁহার সময় অসময় জ্ঞান আদবে ছিল না। নর্টন সাহেব যখন সংলগ্ন অসংলগ্নের বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ

ঢুকাইয়া দিতেছিলেন, তখন চাটার্জী মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা inadmissible বলিয়া আপত্তি করিতেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সংলগ্ন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বলিয়া নয়, নর্টন কৃত নাটকের উপযোগী হইতে পারে বলিয়া সেই সাক্ষ্যগুলি রুজু হইতেছে। এই অসঙ্গত ব্যবহারে নর্টন কেন, বার্লি সাহেব পর্য্যন্ত চটিয়া উঠিতেন। একবার বার্লি সাহেব চাটার্জী মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন, "Mr. Chatterji, we were getting on very nicely before you came" "আপনি যখন আসেন নাই, আমরা নির্ব্বিঘ্নে মোকদ্দমা চালাইতেছিলাম।" তাহা বটে, নাটকের রচনার সময়ে কথায় কথায় আপত্তি তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকবৃন্দেরও রসভঙ্গ হয়।

নর্টন সাহেব যদি নাটকের রচয়িতা, প্রধান অভিনেতা ও সূত্রধর হন, ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লিকে নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক বা Patron বলিয়া অভিহিত করা যায়। বার্লি সাহেব বোধ হয়, স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কটলণ্ডের স্মারক-চিহ্ন। অতি সাদা, অতি লম্বা, অতি রোগা, দীর্ঘ, দেহযষ্টির উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদী অক্টারলোনী মনুমেণ্টের উপর ক্ষুদ্র অক্টারলোনী বসিয়া আছেন, বা ক্লিয়পাত্রার obelisk এর চূড়ায় একটি পাকা নারিকেল বসান রহিয়াছে। তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (sandy haired) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হিম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জমিয়া রহিয়াছে। যাঁহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বুদ্ধিও তদ্রূপ হওয়া চাই, নচেৎ প্রকৃতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি-সৃষ্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। ইংরাজ কবি মারলো এই মিতব্যয়িতা infinite riches in a little room (ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে অসীম ধন) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বার্লি দর্শনে কবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, infinite rooms in little riches। বাস্তবিক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অল্পসংখ্যক শাসনকর্ত্তা দ্বারা ত্রিশ কোটি ভারতবাসী শাসিত হইয়া রহিয়াছে স্মরণ করিয়া ইংরাজের মহিমা ও ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বার্লি সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর জেরার সময় প্রকাশ হইয়াছিল। স্বয়ং কবে মোকদ্দমা স্বীয় করকমলে গ্রহণ করিয়াছিলেন বা কি করিয়া মোকদ্দমা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, এত বৎসরের ম্যাজিষ্ট্রেটগিরির পরে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বার্লির মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্যার মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চক্রবর্ত্তী সাহেবের উপর সেই ভার দিয়া সাহেব নিষ্কৃতি পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও বার্লি কবে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্ন মোকদ্দমার অতি জটিল সমস্যার

মধ্যে গণ্য। চাটার্জী মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম, তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায়। প্রথম হইতে তিনি নর্টন সাহেবের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার বশ হইয়াছিলেন। এমন বিনীতভাবে নর্টনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিতেন, নর্টনের মতে মত দিতেন, নর্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব মনে আবির্ভূত হইত। বার্লি নিতান্ত বালকস্বভাব। কখন তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া ভাবিতে পারি নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছাত্র হঠাৎ স্কুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ মঞ্চে আসীন হইয়াছেন। সেই ভাবে তিনি কোর্টের কার্য্য চালাইতেন। কেহ তাঁহার প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করিলে স্কুলের শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন। আমাদের মধ্যে যদি কেহ কেহ মোকদ্দমা প্রহসনে বিরক্ত হইয়া পরস্পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেন, বার্লি সাহেব স্কুলমাষ্টারী ধরণে বকিয়া উঠিতেন, না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হুকুম করিতেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বলিতেন। আমরা এই স্কুলমাষ্টারী ধরণ প্রতীক্ষা করিতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে যখন বার্লিতে ও চাটার্জী মহাশয়ে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছিল, আমরা তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারিষ্টার মহাশয়ের উপর এবার দাঁড়াইবার শাস্তি প্রচারিত হইবে। বার্লি সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধরিলেন, চীৎকার করিয়া "Sit down Mr. Chatterji" বলিয়া আলিপুর স্কুলের এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন। যেমন এক একজন মাষ্টার, ছাত্র কোন প্রশ্ন করিলে বা পড়ার সময় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাহিলে, বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইয়া দেন, বার্লিও আসামীর উকিল আপত্তি করিলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাসাইতেন। কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যতিব্যস্ত করিত। নর্টন বাহির করিতে চাহিতেন যে অমুক লেখা অমুক আসামীর হস্তাক্ষর, সাক্ষী যদি বলিতেন, না, এ ত ঠিক সেই লেখার মত লেখা নয়, তবে হইতে পারে, বলা যায় না,—অনেক সাক্ষী এইরূপ উত্তর দিতেন, নর্টন ইহাতে অধীর হইতেন। বকিয়া ঝকিয়া, চেঁচাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপ্সিত উত্তর বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন এই হইত, "What is your belief?" তুমি কি মনে কর, হাঁ কি না। সাক্ষী হাঁ-ও বলিতে পারিতেন না, না-ও বলিতে পারিতেন না, বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই উত্তরই করিতেন। নর্টনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে তাঁহার কোনও belief নাই, তিনি সন্দেহে দোলায়মান। কিন্তু নর্টন সেই উত্তর চাহিতেন না, বারবার মেঘ-গর্জ্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িত. "Come, sir, what is your belief?" নর্টনের রাগে বার্লি রাগিয়া

উপর হইতে গর্জ্জন করিতেন, "টোমার বিস্ওয়াস কি আছে?" বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পড়িতেন। তাঁহার কোন বিস্ওয়াস নাই, অথচ একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট, অপর দিকে নর্টন ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার নাড়ী ভুঁড়ি ছিঁড়িয়া অমূল্য অপ্রাপ্য বিস্ওয়াস বাহির করিতে কৃতোদ্যম হইয়া দুইদিক হইতে ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন। প্রায়ই বিস্ওয়াস বাহির হইত না, সাক্ষী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘূর্ণ্যমান বুদ্ধিতে তাঁহার যন্ত্রণাস্থান হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যাইতেন। এক একজন বিস্ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় জিনিস বলিয়া কৃত্রিম বিস্ওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার দিয়া বাঁচিতেন, নর্টনও অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাকী জেরা স্নেহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপ কৌন্সিলীর সঙ্গে এইরূপ ম্যাজিষ্ট্রেট জুটিয়াছিলেন বলিয়া মোকদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ করিয়াছিল।

কয়েকজন সাক্ষী এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিলেও অধিকাংশই নর্টন সাহেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দিতেন। ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ অতি অল্পই ছিল। এক একজন কিন্তু পরিচিত ছিলেন। দেবদাস করণ মহাশয় আমাদের বিরক্তি দূর করিয়া খুব হাসাইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। এই সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, যখন মেদিনীপুর সম্মিলনীর সময় সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার ছাত্রের নিকট গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অরবিন্দবাবু তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন "দ্রোণ কি করিলেন?" ইহা শুনিয়া নর্টন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের সীমা ছিল না, তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভক্ত বা রাজনৈতিক হত্যাকারী, অথবা মাণিকতলা বাগান বা ছাত্র ভাণ্ডারের সঙ্গে সংযুক্ত। নর্টন মনে করিয়াছিলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরবিন্দ ঘোষ সুরেন্দ্রবাবুকে গুরুভক্তির বদলে বোমারূপ পুরস্কার দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে মোকদ্দমার অনেক সুবিধা হইতে পারে। অতএব তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দ্রোণ কি করিলেন?" প্রথমতঃ সাক্ষী কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ মিনিট টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ করিয়া নর্টনকে জানাইলেন, "দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন"। ইহাতে নর্টন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন কেন? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেক কাণ্ড আবার কি? বিশেষ কি করিলেন বলুন?" সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর করিলেন, একটিতেও দ্রোণাচার্য্যের জীবনময় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই। নর্টন সাহেব চটিলেন, গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীও চীৎকার আরম্ভ করিলেন। একজন উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ করিলেন যে, সাক্ষী বোধ হয় জানেন না,

দ্রোণ কি করিলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্রোধে অভিমানে আগুন হইলেন। চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি? আমি? আমি জানি না দ্রোণ কি করিলেন? বাঃ, আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত বৃথা পড়িয়াছি?" আধ ঘণ্টা দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নর্টনে মহাযুদ্ধ চলিল। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর নর্টন আলিপুর বিচারালয় কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রশ্ন ঘোষণা করিতে লাগিলেন, "Out with it, Mr. Editor! What did Dron do?" সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রামকাহিনী আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। সমস্ত আদালত হাসির মহা রোলে প্রতিধ্বনিত হইল। শেষে টিফিনের সময়ে করণ মহাশয় মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে, বেচারা দ্রোণ কিছুই করেন নাই, বৃথাই আধ ঘণ্টাকাল তাঁহার পরলোকগত আত্মা লইয়া টানাটানি হইয়াছে, অর্জ্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের এই মিথ্যা অপবাদে দ্রোণাচার্য্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদাশিবকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন যে, করণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইল না। সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আশুতোষ সদাশিব তাঁহাকে রক্ষা

যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও ভদ্রলোক এবং স্বদোষে পুলিসের প্রেম বঞ্চিত, অনিচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। প্রত্যেক শ্রেণীর সাক্ষ্য দিবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। পুলিস মহোদয়গণ প্রফুল্লভাবে অম্লানবদনে তাঁহাদের পূর্ব্বজ্ঞাত বক্তব্য মনের মত বলিয়া যাইতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, চিনিয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, ভুলচুক নাই। পুলিসের বন্ধুসকল অতিশয় আগ্রহের সহিত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে চিনিতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও অনেকবার অতিমাত্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। অনিচ্ছায় আগত যাঁহারা, তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা বলিতেন, কিন্তু তাহা অতি অল্প হইত; নর্টন সাহেব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক প্রমাণ আছে ভাবিয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর চেষ্টা করিতেন। ইহাতে সাক্ষীগণ মহা বিপদে পড়িতেন। এক দিকে নর্টন সাহেবের গর্জ্জন ও বার্লি সাহেবের আরক্ত চক্ষু, অপর দিকে মিথ্যা সাক্ষ্যে

দেশবাসীকে দ্বীপান্তরে পাঠাইবার মহাপাপ। নর্টন ও বার্লিকে সন্তুষ্ট করিবেন, না ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবেন, সাক্ষীর পক্ষে এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠিত। এক দিকে মানুষের ক্রোধে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, অপর দিকে পাপের শাস্তি নরক ও পরজন্মে দুঃখ। কিন্তু তিনি ভাবিতেন, নরক ও পরজন্ম এখনও দূরবর্ত্তী অথচ মনুষ্যকৃত বিপদ পরমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে পারে। কবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে ধৃত হইবেন, সেই ভয় অনেকের মনে বিদ্যমান থাকিবার কথা, কারণ এইরূপ স্থলে পরিণামের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব এই শ্রেণীর সাক্ষীর পক্ষে তাঁহারা যতক্ষণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় অতিবাহিত করিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ ভীতি ও যন্ত্রণার সময় হইত। জেরা শেষ হইলে অর্দ্ধ-নির্গত প্রাণ আবার ধড়ে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে যন্ত্রণামুক্ত করিত। কয়েকজন সাহসের সহিত সাক্ষ্য দিয়া নর্টনের গর্জ্জনে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলীও তাহা দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্ব্বক নরম হইয়া পড়িতেন। এইরূপ কত সাক্ষী আসিয়া কত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, কিন্তু একজনও পুলিসের উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা করেন নাই। একজন স্পষ্ট বলিলেন, আমি কিছুই জানি না, কেন পুলিস আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বুঝি না! এইরূপ মোকদ্দমা করিবার প্রথা বোধ হয়, ভারতেই হইতে পারে. অন্য দেশ হইলে জজ ইহাতে চটিয়া উঠিতেন ও পুলিসকে তীব্র গঞ্জনার সহিত শিক্ষা দিতেন। বিনা অনুসন্ধানে দোষী ও নির্দ্দোষী নির্ব্বিচারে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া আন্দাজে শত শত সাক্ষী আনিয়া দেশের টাকা নষ্ট করা এবং নিরর্থক আসামীদিগকে কারা-যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল রাখা, এই দেশেরই পুলিসের পক্ষে শোভা পায়। কিন্তু বেচারা পুলিস কি করিবে? তাঁহারা নামে গোয়েন্দা কিন্তু সেইরূপ ক্ষমতা যখন তাঁহাদের নাই, তখন এইরূপে সাক্ষীর জন্য বিশাল জাল ফেলিয়া উত্তম মধ্যম অধম সাক্ষী যোগাড় করিয়া আন্দাজে কাঠগড়ায় উপস্থিত করাই একমাত্র উপায়। কে জানে, তাহারা কিছু জানিতে পারে, কিছু প্রমাণ দিতেও পারে।

আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও অতি রহস্যময় ছিল। প্রথমতঃ, সাক্ষীকে বলা হইত, তুমি কি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিবে ? সাক্ষী যদি বলিতেন, হাঁ, চিনিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নর্টন সাহেব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া কাঠগড়ায় identification parade এর ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে তাঁহার স্মরণশক্তি চরিতার্থ করিবার আদেশ দিতেন। যদি তিনি বলিতেন, জানি না, হয়ত চিনিতেও পারি, তিনি একটু বিমর্ষ হইয়া বলিতেন, আচ্ছা যাও, চেষ্টা কর। যদি কেহ বলিতেন, না, পারিব না, তাহাদের দেখি নাই অথবা লক্ষ্য করি নাই; তথাপি নর্টন সাহেব তাঁহাকে ছাড়িতেন না। যদি এতগুলি মুখ

দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের কোনও স্মৃতি জাগ্রত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে পাঠাইতেন। সাক্ষীর তেমন যোগশক্তি ছিল না। হয় ত পূর্ব্ব-জন্মবাদে আস্থাও নাই, তিনি আসামীদের দীর্ঘ দুই শ্রেণীর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সার্জ্জেণ্টের নেতৃত্বের অধীনে গম্ভীর ভাবে কুচ করিয়া আমাদের মুখের দিকে না চাহিয়াও মাথা নাড়িয়া বলিতেন, না, চিনি না। নর্টন নিরাশ হৃদয়ে এই মৎস্যশূন্য জীবন্ত জাল ফিরাইয়া লইতেন। এই মোকদ্দমায় মনুষ্যের স্মরণশক্তি কতদূর প্রখর ও অভ্রান্ত হইতে পারে, তাহার অপূর্ব্ব প্রমাণ পাওয়া গেল। ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা নাই, তাঁহাদের সহিত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস পূর্ব্বে কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দেখি নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে দেখিয়াছি, অমুক দুইস্থানে দেখি নাই:—উহাকে দাঁত মাজিতে একবার দেখিয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল। ইহাকে কবে দেখিলাম কি করিতেছিলেন, কে সঙ্গে ছিলেন, না একাকী ছিলেন, কিছুই মনে নাই, অথচ তাঁহারও চেহারা আমার মনে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অঙ্কিত হইয়া রহিল ; হরিকে দশবার দেখিয়াছি সুতরাং তাঁহাকে ভুলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের জন্য দেখিলাম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিব না, কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই,—এইরূপ স্মরণশক্তি এই অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতিতে, এই তমাভিভূত মর্ত্ত্যধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের নহে; দুই জনের নহে; প্রত্যেক পুলিস পুঙ্গবের এইরূপ বিচিত্র নির্ভুল অভ্রান্ত স্মরণশক্তি দেখা গেল। এতদ্দ্বারা সী·আই·ডী·-র উপর আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দিন দিন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখের কথা, সেসন্স কোর্টে এই ভক্তি কমাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যে দুই একবার সন্দেহ হয় নাই তাহাও নয়। যখন লেখা সাক্ষ্যে দেখিলাম যে, শিশির ঘোষ এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে ছিলেন অথচ কয়েকজন পুলিস পুঙ্গব ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে স্কটস্ লেনে ও হ্যারিসন রোডে দেখিয়াছিলেন, তখন একটু সন্দেহ হইল বটে। শ্রীহট্টবাসী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন স্থূল শরীরে বানিয়াচঙ্গে পিতৃভবনে থাকিয়াও বাগানে ও স্কটস্ লেনে—যে স্কটস্ লেনের ঠিকানা বীরেন্দ্র জানিতেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণ লেখা সাক্ষ্যে পাওয়া গেল—তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর সী. আই. ডী·র সূক্ষ্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তখন আরও সন্দেহ হইল। বিশেষতঃ যাঁহারা স্কটস্ লেনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, সেখানে পুলিস তাঁহাদিগকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তখন একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। একজন মেদিনীপুরের সাক্ষী বলিলেন যে তিনি—মেদিনীপুরের আসামীরা বলিলেন যে তিনিই

গোয়েন্দা—শ্রীহট্টের হেমচন্দ্র সেনকে তমলুকে বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র স্থূল চক্ষে কখন তমলুক দেখেন নাই, অথচ তাঁহার ছায়াময় শরীর দূর শ্রীহট্ট হইতে তমলুকে ছুটিয়া তেজস্বী ও রাজদ্রোহপূর্ণ স্বদেশী বক্তৃতা করিয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের চক্ষুতৃপ্তি এবং কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ছায়াময় শরীর মাণিকতলায় উপস্থিত হইয়া আরও রহস্যময় কান্ড করিয়াছিল। দুই জন পুলিস কর্ম্মচারী শপথ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অমুক দিনে অমুক সময়ে চারুবাবুকে শ্যামবাজারে দেখিয়াছিলেন, তিনি শ্যামবাজার হইতে একজন ষড়যন্ত্রকারীর সহিত মাণিকতলার বাগানে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি নিকট হইতে দেখিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ভুল হইবার কথা নাই। উকিলের জেরায় সাক্ষীদ্বয় টলেন নাই। ব্যাসস্য বচনং সত্যং, পুলিসের সাক্ষ্যও অন্যরূপ হইতে পারে না। দিন ও সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভুল হইবার কথা নহে, কারণ ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে চারুবাবু কলেজ হইতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন, চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারুবাবু হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভাল, তার্দিভালের স্ত্রী, চন্দননগরের গভর্ণর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পায়চারি করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই কথা স্মরণ করিয়া চারুবাবুর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় পুলিস চারুবাবুকে মুক্তি দেওয়ায় বিচারালয়ে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন হয় নাই। চারুবাবুকে এই পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে তিনি এইসকল প্রমাণ Psychical Research Societyর নিকট পাঠাইয়া মনুষ্যজাতির জ্ঞানসঞ্চয়ের সাহায্য করুন। পুলিসের সাক্ষ্য মিথ্যা হইতে পারে না,—'বিশেষতঃ সী· আই· ডী·র'—অতএব থিয়সফীর আশ্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মোটের উপর বৃটিশ আইন প্রণালীতে কত সহজে নির্দ্দোষীর কারাদন্ড, কালাপানি ও ফাঁসি পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই মোকদ্দমায় পদে পদে পাইলাম। নিজে কাঠগড়ায় না দাঁড়াইলে পাশ্চাত্য বিচার প্রণালীর মায়াবী অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। য়ুরোপের এই প্রণালী জুয়াখেলা বিশেষ; ইহা মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, তাহার ও তাহার পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধুর জীবনব্যাপী যন্ত্রণা, অপমান, জীবন্ত মৃত্যু লইয়া জুয়াখেলা। ইহাতে কত দোষী বাঁচে, কত নির্দ্দোষী মরে, তাহার ইয়ত্তা নাই। য়ুরোপে Socialism ও Anarchism এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জুয়াখেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠুর নির্ব্বিচার সমাজরক্ষক পেষণযন্ত্রের মধ্যে একবার

পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, যে অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সমাজ ভাঙ্গিয়া দাও, চুরমার কর; এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দ্দোষীর তপ্ত নিঃশ্বাসে ও হৃদয়ের শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সাক্ষ্য। সেই ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমার বিপদের সঙ্গী বালক আসামীদের কথা বলি। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, নূতন সন্ততি মায়ের কোলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল, হয় শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ, সচ্চরিত্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শূন্য, নয়ত দুশ্চরিত্র, দুর্দ্দান্ত, অস্থির, ঠগ, সংযম ও সততাশূন্য! এই দুই চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জীব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আট দশজন অসাধারণ প্রতিভাবান শক্তিমান ভবিষ্যৎ কালের পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তেজস্বী আর্য্যসন্তান প্রায়ই দেখা যাইত না। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ছিল, মেধাশক্তি ছিল, কিন্তু শক্তি ও মনুষ্যত্ব ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দ্দান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম্মস্রোতের লক্ষণ। ইহারা যদি হত্যাকারী হন, তবে বলিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রূরতা, উন্মত্ততা, পাশবিক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে ছিল না। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়া-শুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্র জেলের কর্ম্মচারী, সিপাহী, কয়েদী, য়ুরোপীয় সার্জ্জেণ্ট, ডিটেকটিভ, কোর্টের কর্ম্মচারী, সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রু মিত্র বড় ছোট বিচার না করিয়া সকলের সঙ্গে গল্প ও উপহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে অতি বিরক্তিকর ছিল, কারণ মোকদ্দমা প্রহসনে রস অতি অল্প ছিল। এই সময় কাটাইবার জন্য তাঁহাদের পড়িবার বই ছিল না, কথা কহিবার অনুমতিও

ছিল না। যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও গণ্ডগোলের মধ্যে ধ্যান করিতে শেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সময় কাটান বড় কঠিন হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ দুই চারিজন পড়িবার বই ভিতরে আনিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেখাদেখি আর সকলে সেই উপায় অবলম্বন করিলেন। তাহার পরে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাইত যে, মোকদ্দমা চলিতেছে, ত্রিশ চল্লিশ জন আসামীর সমস্ত ভবিষ্যৎ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামীগণ সেই দিকে দৃকপাত না করিয়া কেহ বঙ্কিমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা Science of Religions, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপীয় দর্শন একাগ্রমনে পড়িতেছেন। ইংরাজ সার্জ্জেণ্ট বা দেশী সিপাহী কেহই তাঁহাদের এই আচরণে বাধা দিত না। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ইহাতেই যদি এতগুলি পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও কার্য্য লঘু হয়; অধিকন্তু ইহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু একদিন বার্লি সাহেবের দৃষ্টি এই দৃশ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। দুই দিন তিনি কিছু বলেন নাই, পরে আর থাকিতে পারিলেন না, বইয়ের আমদানি বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। বাস্তবিক বার্লি এমন সুন্দর বিচার করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ করিবেন, না সকলে বই পড়িতেন। ইহাতে বার্লির গৌরব ও বৃটিশ জষ্টিসের মহিমার প্রতি ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই।

আমরা যতদিন স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন কেবল গাড়ীতে, ম্যাজিষ্ট্রেট আসিবার পূর্ব্বের একঘণ্টা বা আধঘণ্টাকাল এবং টিফিনের সময়ে কতকটা আলাপ করিবার অবসর পাইতাম। যাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরিচয় বা আলাপ ছিল, তাঁহারা এই সময়ে cellএর নীরবতা ও নির্জ্জনতার শোধ লইতেন, হাসি, আমোদ ও নানা বিষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। কিন্তু এইরূপ অবসরে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় না, সেইজন্য আমার ভাই বারীন্দ্র ও অবিনাশ ভিন্ন আমি আর কাহারও সহিত অধিক আলাপ করিতাম না, তাঁহাদের হাসি ও গল্প শুনিতাম, স্বয়ং তাহাতে যোগ দিতাম না। কিন্তু একজন আমার কাছে মাঝে মাঝে ঘেঁসিয়া আসিতেন, তিনি ভাবী Approver নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত ও শিষ্ট স্বভাব ছিল না, তিনি সাহসী, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্ম্মে অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাবিক সাহস ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বলিয়া কারাবাসের যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি জমিদারের ছেলে সুতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালিত হইয়া কারাগৃহের কঠোর

সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের নিকট প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে দিন দিন বাড়িতে লাগিল। প্রথম তাঁহার এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া দোষ স্বীকার করাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই আর এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন, শেষে ডিটেকটিভ শ্যামসুল আলমও তাঁহার নিকট আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গোপনে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল বলিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় লোকের সহিত তাঁহাদের আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না, গুপ্ত সমিতিকে কে কে আর্থিক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াছিলেন, সমিতির লোক বাহিরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সমিতির কার্য্য চালাইবেন, কোথায় শাখা সমিতি রহিয়াছে ইত্যাদি অনেক ছোট বড় প্রশ্ন বারীন্দ্র ও উপেন্দ্রকে করিতেন। গোঁসাইয়ের এই জ্ঞানতৃষ্ণার কথা অচিরাৎ সকলের কর্ণগোচর হইল এবং শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতার কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া open secret হইয়া উঠিল। ইহা লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরূপ পুলিস দর্শনের পরই সর্ব্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে জুটিত। বলা বাহুল্য তিনি এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার করিয়াছিলেন যে পুলিস তাঁহার নিকট আসিয়া "রাজার সাক্ষী" হইবার জন্য তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আমাকে কোর্টে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "আপনি কি উত্তর দিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি কি শুনিব! আর শুনিলেও আমি কি জানি যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব?" তাহার কিয়ৎ দিন পরে আবার যখন এই কথা উল্লেখ করিলেন, তখন দেখিলাম, ব্যাপারটা অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে Indentification paradeএর সময় আমার পার্শ্বে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, "পুলিস কেবলই আমার নিকট আসেন।" আমি উপহাস করিয়া বলিলাম, "আপনি এই কথা বলুন না কেন যে সার আন্দ্রু ফ্রেজার গুপ্ত সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।" গোঁসাই বলিলেন, "সেই

ধরণের কথা বলিয়াছি বটে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি আমাদের head এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কথা বলিবার প্রয়োজন কি ছিল?" গোঁসাই বলিলেন, "আমি —দের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িব। সেই ধরণের আরও অনেক খবর দিয়াছি। বেটারা corroboration খুঁজিয়া খুঁজিয়া মরুক। কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইতেও পারে।" ইহার উত্তরে আমি কেবল বলিয়াছিলাম, "এই নষ্টামি ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাকী করিতে গেলে নিজে ঠকিবেন।" জানি না, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা দিবার জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই approver হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাঁহার মন সেই দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুলিসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাটি করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদুপায়ে কার্য্যসিদ্ধি দুষ্প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পুলিসের বশ হইয়া সত্য মিথ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বলিয়া নিজে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিবেন। একটী নীচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুষ্কর্ম্মের দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত অভিনীত হইতে লাগিল। আমি দিন দিন দেখিলাম, গোঁসাইয়ের মন কিরূপে বদলাইয়া যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তারও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তিনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের সর্ব্বনাশ করিবার যোগাড় করিতে-ছিলেন তাহার সমর্থন জন্য ক্রমে ক্রমে নানা অর্থনৈতিক ও রাজনীতিক যুক্তি বাহির করিতে লাগিলেন। এমন interesting psychological study প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না।

প্রথম কেহই গোঁসাইকে জানিতে দিলেন না যে সকলে তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিও এমন নির্ব্বোধ যে অনেক দিন ইহার কিছু বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি খুব গোপনে পুলিসের সাহায্য করিতেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন হুকুম হইল যে, আর আমাদের নির্জ্জন কারাবাসে না রাখিয়া একসঙ্গে রাখা হইবে, তখন সেই নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের সহিত রাত-দিন দেখা ও কথাবার্ত্তা হওয়ায় আর বেশী দিন কিছুই লুকাইয়া ছিল না। এই সময়ে দুই একজন বালকের সহিত গোঁসাইয়ের ঝগড়া হয়, তাহাদের কথায় ও সকলের অপ্রীতিকর ব্যবহারে গোঁসাই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অভিসন্ধি কাহারও অজ্ঞাত নহে।

যখন গোঁসাই সাক্ষ্য দেন, তখন কয়েকটী ইংরাজী কাগজে এই খবর বাহির হয় যে, আসামীগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমৎকৃত ও উত্তেজিত হইলেন। বলা বাহুল্য, ইহা নিতান্ত রিপোর্টারদেরই কল্পনা। অনেক দিন আগেই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই প্রকার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে। এমন কি, যে দিনে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এই সময়ে একজন আসামী গোঁসাইয়ের নিকট গিয়া বলিলেন—দেখ ভাই, আর সহ্য হয় না, আমিও approver হইব, তুমি শামসুল আলমকে বল আমারও যেন খালাস পাইবার ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই সম্মত হইলেন, কয়েক দিন পরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই অর্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, সেই আসামীর নিবেদনের অনুকূল নির্ণয় (Favourable consideration) হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া গোঁসাই তাহাকে উপেন প্রভৃতির নিকট হইতে এইরূপ কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বাহির করিতে বলিলেন, যেমন—কোথায় গুপ্ত সমিতির শাখা সমিতি ছিল, কাহারা তাহার নেতা, ইত্যাদি। নকল approver আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন, তিনি উপেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া গোঁসাইকে কয়েকটি কল্পিত নাম জানাইয়া বলিলেন যে, মান্দ্রাজে বিশ্বম্ভর পিলে, সাতারায় পুরুষোত্তম নাটেকর, বোম্বাইতে প্রোফেসার ভট্ট এবং বরোদায় কৃষ্ণাজীরাও ভাও এই গুপ্ত সমিতির শাখার নেতা ছিলেন। গোঁসাই আনন্দিত হইয়া এই বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পুলিসকে জানাইলেন। পুলিসও মান্দ্রাজে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন, অনেক ছোট বড় পিলেকে পাইলেন, কিন্তু একটীও পিলে বিশ্বম্ভর বা অর্দ্ধ বিশ্বম্ভরও পাইলেন না, সাতারার পুরুষোত্তম নাটেকরও তাঁহার অস্তিত্ব ঘন অন্ধকারে গুপ্ত রাখিয়া রহিলেন, বোম্বাইয়ে একজন প্রোফেসার ভট্ট পাওয়া গেল, কিন্তু তিনি নিরীহ, রাজভক্ত ভদ্রলোক, তাঁহার পিছনে কোন গুপ্ত সমিতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ সাক্ষ্য দিবার সময় গোঁসাই পূর্ব্বকালে উপেনের নিকট শোনা কথা বলিয়া কল্পনারাজ্য নিবাসী বিশ্বম্ভর পিলে ইত্যাদি ষড়যন্ত্রের মহা-রথীগণকে নর্টনের শ্রীচরণে বলি দিয়া তাঁহার অদ্ভুত prosecution theory পুষ্ট করিলেন। বীর কৃষ্ণাজীরাও ভাও লইয়া পুলিস আর একটী রহস্য করিলেন। তাঁহারা বাগান হইতে বরোদার কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডের নামে কোনও "ঘোষ" দ্বারা প্রেরিত টেলিগ্রামের নকল বাহির করিলেন। সেইরূপ নামের কোন লোক ছিল কি না, বরোদাবাসী তাহার কোন সন্ধান পান নাই, কিন্তু সত্যবাদী গোঁসাই বরোদাবাসী কৃষ্ণাজীরাও ভাওয়ের কথা বলিয়াছেন তখন নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও ও কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই। আর কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে থাকুন বা না থাকুন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশবরাও দেশপাণ্ডের নাম চিঠিপত্রে পাওয়া গিয়াছিল। অতএব নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও

ভাও, কৃষ্ণাজীরাও দেশপাণ্ডে একই লোক। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কেশবরাও দেশপাণ্ডে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান পাণ্ডা। এইরূপ অসাধারণ অনুমান সকলের উপর নর্টন সাহেবের সেই বিখ্যাত theory প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গোঁসাইয়ের কথা বিশ্বাস করিলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহারই কথায় আমাদের নির্জ্জন কারাবাস ঘুচিয়া যায় এবং আমাদের একত্র বাসের হুকুম হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, পুলিস তাঁহাকে সকলের মধ্যে রাখিয়া ষড়যন্ত্রের গুপ্ত কথা বাহির করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই জানিতেন না যে সকলে পূর্ব্বেই তাঁহার নূতন ব্যবসার কথা জানিতে পারিয়াছেন, সেইজন্য কাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কোথায় শাখা সমিতি, কে টাকা দিতেন বা সাহায্য করিতেন, কে এখন গুপ্ত সমিতির কার্য্য চালাইবেন, এইরূপ অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রশ্নের কিরূপ উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি। কিন্তু গোঁসাইয়ের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা। ডাক্তার ডেলি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনিই এমারসন সাহেবকে বলিয়া কহিয়া এই পরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ডেলির কথাই সত্য ; তহার পরে হয়ত পুলিস নূতন ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া তাহা হইতে এইরূপ লাভের কল্পনা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পরিবর্ত্তনে আমি ভিন্ন সকলের পরম আনন্দ হইল, আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চলিতেছিল। সমতা, নিষ্কামতা ও শান্তির কতক কতক আস্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও সেই ভাব দৃঢ় হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তাস্রোতের আঘাত আমার অপক্ক নবীন চিন্তার উপর পড়িলেই এই নব ভাব হ্রাস পাইতে পারে, ভাসিয়া যাইতেও পারে। বাস্তবিক তাহাই হইল। তখন বুঝিতাম না যে আমার সাধনের পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য অন্তর্য্যামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নির্জ্জনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া উদ্দাম রজোগুণের স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। আর সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। সেই রাত্রিতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচীন্দ্র সেন ইত্যাদি গায়ক ছিলেন সেই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, অধিকাংশ আসামী সেইখানে একত্র হইয়াছিলেন, এবং দুটা তিনটা রাত্রি পর্য্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারা রাত হাসির রোল, গানের অবিরাম স্রোত, এতদিনের রুদ্ধ গল্প বর্ষাকালের বন্যার মত বহিতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহল-ধ্বনিত হইল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম কিন্তু যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ততবারই শুনিলাম সেই হাসি, সেই গান, সেই গল্প সমান বেগে চলিতেছে। শেষ রাত্রে এই স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল, গায়কেরাও ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল।

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থূলের সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম ; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শরীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "জগৎ-স্রষ্টা স্বয়ম্ভূ শরীরের দ্বার সকল বহির্ম্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া সকলের দৃষ্টি বহির্জগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেহও দেখে না। সেই ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিরল যিনি অমৃতের বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।" আমরাও সাধারণতঃ যে বহির্ম্মুখীন স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আমাদের মুখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদী বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু-অশ্বযুক্ত রথ, যে দেহ-রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাত্মক বুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কর্ম্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদ-বিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। কেন না, প্রকৃতি হৌক বা মনুষ্য হৌক, যে আমাদের শরীরের উপর কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য করিতে পারে কিংবা নিজশক্তির অধিকার-ক্ষেত্রে আনিতে পারে, তাহারই প্রভাবের অধীন হইতে হয়। ইহার চরম দৃষ্টান্ত শত্রুগ্রস্ত বা কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্তু যিনি বন্ধুবান্ধব-বেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দ্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্মক-বুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু।

এই কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছ্বাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখ-দুঃখ

বর্জ্জন, Stoicism, Epicureanism, asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্ম-মার্গ,—নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য—শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জ্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম অনুভব স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতি মাত্র, মনুষ্যের স্বাধীনতা-প্রয়াস ব্যর্থ; ধর্ম্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকৃতি-আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘনে মিথ্যা চেষ্টা। কিন্তু মানব-হৃদয়ের এমন গূঢ়তর স্তরে এই আকাঙ্ক্ষা নিহিত যে সহস্র যুক্তিও তাহা উন্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন যে স্থূলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্ম বস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান, সূক্ষ্মময় অধিষ্ঠাতা নিত্যমুক্ত আনন্দময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্তি ও নির্ম্মল আনন্দলাভ করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞান কল্পিত evolution এরও উদ্দেশ্য। বিচারশক্তি ও তাহার অভাব পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর বিচারশক্তি আছে, কিন্তু পশু-দেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীর-নেতাকে জ্ঞানদ্বারা চিনিতে কিম্বা কর্ম্মভক্তিদ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক শুভাশুভ সম্পদ-বিপদকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ং-প্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্ম্মসন্ন্যাস করেন। তিনি "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখ-দুঃখ গ্রহণ করেন না, অথচ কর্ম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুর যুদ্ধে রাগ ভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎ প্রেরিত যে কর্ম্ম-যোগী রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আধুনিক যুগে আমরা নূতন ... সন্ধিস্থলে উপস্থিত। মানুষ বরাবরই তাঁহার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর ...তেছেন, সময়ে সময়ে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে জ্ঞানে বিপ্লব হয়। বর্ত্তমানকালে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূল জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণ মার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষ্মজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে—যেমন অল্প দিনে থিয়সফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আকস্মিক ও আশাতীত উত্থান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ পরিবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবনবিকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুঃখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্ম্মে ভারতবাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বর্জ্জন ও কর্ম্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। এই জেলে প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে। যদিও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, তাহা ছাড়া রাঁধুনি পানিওয়ালা ঝাড়ুদার মেহতর প্রভৃতি যাহাদের সংস্রবে না আসিলে নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত। যাঁহারা আমার এক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভৃতি দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও নিন্দিত। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বারমাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে

ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত optimism অথবা অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়াছিলেন, আলিপুর জেলে ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন, "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীর আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্গুণ দেখে কে কল্পনা করতে পারে যে, এরা Anarchist বা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রূরতা উন্দামভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টা গুণই দেখি।" অবশ্যই জেলে চোর ডাকাত সাধু-সন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্বনাশের উপায়মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব গিয়াও যায় না। সামাজিক অবনতিতে পতিত, মনুষ্যত্ব নাশের ফলে নিষ্পেষিত, বাহিরে কালিমা কদর্য্যভাব কলঙ্ক বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর মজ্জাগত সদ্গুণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃ পুনঃ কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থির-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্ব্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করিয়া উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দুধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্ম ফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা পূত ও দেবভাবাপন্ন নহে, তাহারা এইরূপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রহিয়াছেন বা পাশ্চাত্য চরিত্র-প্রকাশক সাহিত্য

পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে হয়ত তাঁহাদের নিরাশা-পীড়িত ক্রোধ ও দুঃখের অশ্রুজলপ্লুত হৃদয় পার্থিব নরকের ঘোর অন্ধকারে এবং সহবাসীদের সংস্রবে পড়িয়া তাহাদেরই ক্রূরতা ও নীচবৃত্তি আশ্রয় করে ;—নয়ত দুর্ব্বলতার নিরতিশয় নিষ্পেষণে বল বৃদ্ধি হীন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নষ্টাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখা-পড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্ম, সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্য্যশিক্ষা-সুলভ ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধে কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রী-ছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্ত্রী-ছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধেব যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত। দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখসোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর—বিশেষ নিরপরাধ ও দুখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি বিনীত সেবা-সম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারত-বর্ষের চাষার মধ্যে—আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দুসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটি অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঁহারাও যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুষ্টমনে, এই আকস্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড

সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধ-দুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশক একটি কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ তিরস্কার ভাব বা বিরক্তি পর্য্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্যভাষায় ও পাশ্চাত্যবিদ্যায় অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত. মাতৃভাষাই ইঁহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুইজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিম্বা বিধাতার নিকট নালিস না করিয়া সহাস্য মুখে নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুটি ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর বুদ্ধিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্‌গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই তথাপি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন—এমন কি এক একবার মনে হইত যে ভগবদগুণাত্মক মহৎ উক্তিসকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত উক্তিগুলি সেই বাসুদেব মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেলে গীতার সমতাবাদ, কর্ম্মফলত্যাগ, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইঁহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে, বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি, এই মনুষ্যত্ব, এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুক্কায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারারুদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ-দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্‌গুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। আধুনিক-শিক্ষা-দূষিত আমাদের মধ্যে বরং এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ

পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্য্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানি-ওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ-কষ্ট কতকপরিমাণে অনুভব করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একদিনও আমাদের উপর অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশীয় জেলরক্ষকদের নিকট তাহারা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিত বটে, কিন্তু প্রসন্নমুখে আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিত। একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভালবাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীব-দুঃখীকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া ইহাদের এই দুর্দ্দশা।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী, চোর ডাকাত খুনীর এইরূপ আত্মসংযম দয়া-দাক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা পরার্থে ভগবৎভক্তি কি দেখা যায়? প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্তৃভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বর্ণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেব-প্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুর প্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রাধান্যবশতঃ আর্য্য-শিক্ষার অবলোপে, দেশের অবনতিতে, আমরা নিকৃষ্ট আসুরিকবৃত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জ্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অসুরত্ব এবং আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও অসুরত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিকৃষ্টে নিকৃষ্টে যখন তুলনা করি, ইহার যথার্থতা তখন অতি স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে, প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতার ভয়ে লিখিলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়

'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মনসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক-স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না—উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষ সঞ্চিত আর্য্যচরিত্রগত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যশিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিকভাব। যে সাত্ত্বিক, সে বিশুদ্ধ, সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রেই অশুদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অশুদ্ধি পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। মনের মালিন্য দুই প্রকার,—জড়তা, বা অপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা তমোগুণপ্রসূত। দ্বিতীয়,—উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান-মোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কর্ম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি ভ্রান্তজ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমোমালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়, সে নিবৃত্ত নয়,—জড়ভাব জ্ঞান-শূন্য; আর জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত; কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল।"

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহা-সাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতিসকল দ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টানজাতি প্রত্যক্ষ-ফলবাদী, তাঁহারা ধর্ম্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা বলেন—খৃষ্টান জাতিই জগতে প্রবল, অতএব খৃষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন—ইহা ভ্রম,

ঐহিক ফল দেখিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল দেখিতে হয়, হিন্দুরা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া, অসুর প্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্য জাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজ্ঞান-বিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না; এমনকি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্ব গুণের মুখ্যফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্ম-তেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিঁকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ম্লান হইয়া তমোমধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নিরাশা, বিষাদ, নিশ্চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা অবনতিও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশঃ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহদাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া পড়িলাম যে, ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য-ভগবান রজোগুণজনিত প্রবৃত্তি দ্বারা দেশ-রক্ষার সঙ্কল্প করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোদ্যত হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশঙ্কা। রজঃশক্তি যদি স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্ত-তার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপূরণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃঙ্খলভাবে স্বপথগামী হইলে অধিককাল টিঁকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটি-কার পরে আকাশ নির্ম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দনরহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তামসিকতার অল্পা-ধিক পুনরুত্থান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধী-নতারূপ আদর্শজনিত সাত্ত্বিক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বসেবাবিমুখ আসুরিকভাবে পরিণতি লাভ করিয়া স্বপ্রবৃত্তিপূরণে যত্নবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া ম্রিয়মাণ বিষম অবস্থায় হরি-শ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম

এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাত্ত্বিকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শক্তিও শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্ত্বোদ্রেকের উপায় ধর্ম্মভাব—স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ—ভগবানকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে, সত্ত্বরজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাবপ্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিকভাব পূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তির দ্বারা নহে, ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিকভাব, তাহা দ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরার্থে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এইভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিতভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বিক-নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও

মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্ত্বিকভাবের বন্ধন। যেমন রাজসিক অহঙ্কার আছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মানুষকে বন্ধ করে, তেমনই পুণ্যও বন্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটি অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করাই বুদ্ধি-শোধনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ত্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুমুক্ষুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ; ইহাই সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতীতের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

"যখন জীব সাক্ষী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্রয়েরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই ভগবৎ সাধর্ম্ম্য লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্ম-মৃত্যু জরা-দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্ত্বজনিত জ্ঞান,

রজোজনিত প্রবৃত্তি বা তমোজনিত নিদ্রা নিশ্চেষ্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্বধর্ম্মজাত বৃত্তি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখ-দুঃখ সমান, প্রিয়-অপ্রিয় সমান, নিন্দা-স্তুতি সমান, কাঞ্চন-লোষ্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, যে ধীর-স্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কার্য্যারম্ভ করে না, সকল ধর্ম্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্দোষ ভক্তিযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।”

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা লাভ সত্ত্বপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব্বপ্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্ত্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন।

গুণত্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয়জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তি মার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য জাতির মন কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁহ মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন

রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটি বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। আসামীর দোষ ধরিয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃ-শক্তির ক্ষণিক উন্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্প-বয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দন্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে, নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরি-বর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই-চারিখানি বই থাকায় একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশীগানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক অল্পস্বল্প পুস্তক। সকলে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তি-ময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যে দিন যে খেলা জোটে, আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা—কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি, দিন কতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত। দিন কতক কানামাছিই চলিল; এক একদিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎসু শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশপঁচিশ। দুই চারিজন গম্ভীর প্রৌঢ় লোক

ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একদিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, অভিনয়, ventriloquism অনুকরণ বা গেঁজেলের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত।* * * * * * মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্ত ভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য, ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙগসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা এই বালকের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জ্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে eating one's own heart বলেন, সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জ্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল। অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু'চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখ্‌ছ—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে' সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্মপ্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়; এই সাত্ত্বিকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বহিয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই

সাত্ত্বিকভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়, আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জ্জন, রজোদমন, সত্ত্ব-প্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

নবজন্ম

গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁহারা যোগপথে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খলিতপদ ও যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কি গতি হয়? তাঁহারা কি ঐহিক ও পারত্রিক উভয় ফলে বঞ্চিত হইয়া বায়ুখণ্ডিত মেঘের মত বিনষ্ট হন?" উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহলোকে বা পরলোকে সেইরূপ ব্যক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতি-প্রাপ্ত হন না। পুণ্যলোকসকলে তাঁহার গতি হয়, সেখানে অনেককাল বাস করিয়া শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগযুক্ত মহাপুরুষদের কুলে দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মপ্রাপ্ত যোগলিপ্সাচালিত হইয়া সিদ্ধির জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরম-গতি লাভ করেন।" যে পূর্ব্বজন্মবাদ চিরকাল আর্যধর্ম্মের যোগলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গাবিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতি-পত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। স্থূলজগতে যেমন Heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্মজগতে তেমনই পূর্ব্বজন্মবাদ প্রধান সত্য। শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে দুইটি সত্য নিহিত আছে। যোগভ্রষ্ট পুরুষ তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মার্জিত জ্ঞানের সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা বায়ুচালিত তরণীর ন্যায় যোগপথে চালিত হন। কিন্তু কর্ম্মফলপ্রাপ্তির যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জন্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট Heredity যোগ্যশরীরের উৎপাদক। শুদ্ধ শ্রীমান্ পুরুষের গৃহে জন্ম হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন ও প্রাণ গঠিত হয় এবং সেইরূপ শিক্ষা ও মানসিক গতিলাভও হয়।

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে যেন একটি নূতন জাতি পুরাতন তমঃ-অভিভূত জাতির মধ্যে সৃষ্ট হইতেছে। ভারতমাতার পুরাতন সন্ততি ধর্ম্মগ্লানি ও অধর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও সেইরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অল্পায়ু, ক্ষুদ্রাশয়, স্বার্থপরায়ণ, সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপৎকালে জাতিকে রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত কর্ম্ম না করিয়া কেবল জাতির ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্ম্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহাদেরই পুণ্যবলে নব ঊষার কিরণমালা চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। ভারতজননীর নূতন সন্ততি পিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া সাহসী, তেজস্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থত্যাগী, পরার্থে ও দেশহিতসাধনে উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল পিতামাতার বশ না হইয়া যুবকগণ স্বপথে পথিক হইতেছে, বৃদ্ধে-তরুণে মতের অনৈক্য ও কার্য্যকালে বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশসম্ভূত তরুণ সত্যযুগ-প্রবর্ত্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চাহিতেছেন, না বুঝিয়া কলির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশক্তিসৃষ্ট অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভক্তি ও বাধ্যতা রক্ষা করিতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই করিতে পারেন। তবে মহাশক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্ততি যাহা করিতে আসিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া যাইবেন না। এই নূতনের মধ্যেও পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃষ্ট Heredity-র দোষে আসুরিক শিক্ষার দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যাহারা নবযুগ-প্রবর্ত্তনে আদিষ্ট তাঁহারাও অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তি বিকাশ করিতে পারিতেছেন না। নবীন-দিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটি অপূর্ব্ব লক্ষণ, ধর্ম্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্দ্ধবিকশিত যোগশক্তি।

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন তাঁহারা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না যে, ইনি কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি অল্প ও অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি অন্য যুবকগণের ন্যায় প্রবল দেশ-সেবার আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চরিত্রে, প্রাণে তিনি সম্পূর্ণ যোগী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগ-শক্তির লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিকজীবনের পূর্ব্ব আয়োজনে তাঁহার মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূর্ব্বজ্ঞাত অসিদ্ধি উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরূঢ় হইয়াছিলেন। এমন সময়ে তিনি অকস্মাৎ ধৃত হইলেন। এই কর্ম্মফলপ্রাপ্ত বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ

অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম ছিলেন। তিনি ভক্তি ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাঁহার উদার চরিত্র, গম্ভীর ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুগ্ধকর ছিল। গোঁসাই-এর হত্যার সময়ে তিনি হাঁসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভের পূর্ব্বেই নির্জন কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তিনি বার বার জ্বর-ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই জ্বরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার আর আশা নাই, তখন বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু-আগারে রক্ষিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের আবেদনে তাঁহাকে হাস-পাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামিনে মুক্তিদান করা হইল না। শেষে ছোটলাটের সহৃদয়তায় তিনি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মরিবার অনুমতি পাইলেন। আপীলে মুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ভগবান তাঁহাকে দেহ-কারাবাস হইতে মুক্তি দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশক্তি বিলক্ষণ বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর দিন বিষ্ণুশক্তিতে অভিভূত হইয়া সকলকে ভগবানের মুক্তিদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ করিয়া নামোচ্চারণ করিতে করিতে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জিত দুঃখফল ক্ষয় করিতে অশোক নন্দীর জন্ম হইয়াছিল, সেইজন্য এই অনর্থক কষ্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। সত্য-যুগ-প্রবর্ত্তনে যে-শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক যোগশক্তি প্রকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মের গতি এইরূপই হয়। পুণ্যবান পাপফল ক্ষয় করিতে অল্প-কাল পৃথিবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুষ্টদেহ ত্যাগ ও অন্যদেহ গ্রহণপূর্ব্বক অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন করিতে আসেন।

'ধর্ম্ম' পত্রিকার সম্পাদকীয়

ধর্ম্ম
১ম সংখ্যা
৭ই ভাদ্র ১৩১৬

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আগত প্রায়। গতবৎসর পাবনার অধিবেশনে বঙ্গদেশের সমবেত প্রতিনিধিগণ বোম্বে-নীতি বর্জ্জন করিয়া বঙ্গদেশে ঐক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস হুগলীর অধিবেশনেও সেই শুভ পথ অনুসরণ করা হইবে। শুনিয়া সুখী হইলাম, হুগলীর অভ্যর্থনা সমিতি পাবনার প্রস্তাব সকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই অধিবেশনের প্রস্তাবগুলি রচনা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশেষ আবশ্যক বিষয় দুইটীই আছে। আজকাল রাজনীতিক বয়কট বর্জ্জন করিয়া নুন চিনির বয়কটই বজায় রাখিবার বিশেষ আগ্রহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মনে জন্মিয়াছে। আশা করি এই বিজ্ঞতা বঙ্গদেশের প্রতিনিধিবর্গের প্রিয় না হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত হইবে। দ্বিতীয় আবশ্যক বিষয় জাতীয় মহাসভা। পাবনায় এই সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সে প্রস্তাবই হইয়া রহিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার লেশমাত্র চেষ্টা হয় নাই। এইবার সমগ্র বঙ্গদেশের মত ও আকাঙ্ক্ষা যাহাতে উপেক্ষিত না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য।

অশোক নন্দীর পরলোক প্রাপ্তি

আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত যুবক অশোকনন্দী ক্ষয়রোগে দেহমুক্ত হইয়াছেন। জেলের কষ্ট ক্ষয়রোগের একমাত্র কারণ। যাঁহারা এই যুবককে চিনিতেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কোনও হত্যাকাণ্ডে বা ষড়যন্ত্রে অশোক নন্দীর পক্ষে সংলিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি অতিশয় শান্ত, নিরীহ, ধার্ম্মিক ও প্রেমধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জেলে যোগপথে অনেক অগ্রসর হইয়া মৃত্যুসময়ে যোগারূঢ় অবস্থায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে ধরাধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার কতক পরিচয় বারান্তরে দেওয়া হইবে।

হেয়ার ষ্ট্রীটে সরলতা

আমাদের হেয়ার ষ্ট্রীট নিবাসী সহযোগীর সরলতা দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম। সহযোগীর মতপ্রকাশে লুকোচুরির অভ্যাস নাই। সত্যকথা বলিতে হইলে সরল বালকের ন্যায় বলিয়া ফেলে; মিথ্যাকথার যদি প্রয়োজন হয় সত্য মিথ্যা মিশ্রিত না করিয়া বালকের মত উদারভাবে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা উদ্গীরণ করে। কিচেনারের সৈন্যসংস্কারের সম্বন্ধে সেইদিন পার্লামেণ্টে বাদ-বিবাদ হইয়াছিল; সেই উপলক্ষ্যে স্বনামধন্য স্যর এডওয়ার্ড কলিন এই মত ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই সৈন্যসংস্কারে যে ভারতের জাতীয় সেনা সৃষ্ট ও গঠিত হইতেছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় দলের উদ্দেশ্যের সাহায্য ও পোষকতা করা হইয়াছে। ইংলিশম্যানও এই মতে মত দিয়াছে। এই পর্য্যন্ত সৈন্যগঠনে ভেদনীতি সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাতে পল্টনে পল্টনে সহানুভূতি ও একতা না হয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির হৃদয়ে একপ্রাণতা না আসে, সেই চেষ্টা ও লক্ষ্য কখনও পরিবর্জ্জিত হয় নাই। লর্ড কিচেনার এই সকল ভেদ বিনাশ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ উল্টাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সহযোগী স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনকার স্বেচ্ছাতন্ত্র ভারতের জাতীয় একতার প্রতিকূল ও বিরোধী ছিল। একতার অভাবে ভারতের উন্নতির পথ হয় নাই। অতএব যে স্বেচ্ছাতন্ত্র তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষকের কথায় দেশের উন্নতির প্রতিকূল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রকে বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা ভারতবাসীর পক্ষে দোষাবহ না হইয়া স্বাভাবিক, অনিবার্য্য এবং যেমন ভারত তেমনিই বিলাতের মঙ্গলপ্রদ প্রতিপন্ন করা হইল।

বিলাত-যাত্রায় লাভ

আমাদের পরমপূজনীয় দেশনায়ক ও শ্রেষ্ঠ বক্তা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে বিশেষ সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই সম্মানলাভে আমরাও প্রীত হইলাম। আমাদের একজন বক্তা ইংরাজী ভাষায় বিলাতের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীসকলের সমান প্রতিভা, ভাষালালিত্য ও ওজস্বিতা দেখাইয়া বিপক্ষেরও প্রশংসা ও সম্মানলাভ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের গৌরবও বৃদ্ধি হইল, বাঙ্গালীর বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতাও প্রমাণিত হইল। তথাপি এত পরিশ্রমের ফল যদি ব্যক্তিগত সম্মানেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রবাবুর বিলাত যাত্রা ব্যক্তির পক্ষে সন্তোষজনক হইলেও দেশের পক্ষে বিফল চেষ্টা বলিতে হয়। আমরা ইংরাজের নিকট বুদ্ধির প্রশংসা ও বাগ্মিতার আদর

অর্জ্জন করিতে ব্যগ্র নহি, জাতির অধিকার সকল আদায় করিতে চাহিতেছি। সুরেন্দ্রবাবুর তিন মাস প্রবাসে ও ঘন ঘন বক্তৃতায় ইংরাজ জাতি যে এই উদ্দেশ্যের কিঞ্চিন্মাত্র অনুকূল হইয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। উহারা মধ্যপন্থী দলের রাজভক্তির সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন মাত্র। ইহাতে সুরেন্দ্রবাবু মধ্যপন্থী দলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বিলাতে দেশের প্রভূত সেবা ও উপকার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে অজুহাতে তাঁহার সম্মাননা হইতেছে তাহা অমূলক। সুরেন্দ্রবাবু পূজার্হ ও সম্মাননীয় বলিয়া বিদেশ হইতে পুনরাগমনকালে তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করা স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়; অন্য অলীক কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। দেশসেবার মধ্যে তিনি বিলাতে আমাদের রাজনীতিক অধিকারের দাবী জানাইয়া আসিয়াছেন! উপকারের মধ্যে অন্দোলনের সম্বন্ধে কয়েকজনের ব্যক্তিগত মত অল্পমাত্র সংশোধিত হইতেও পারে। আমরা এই অল্পলাভে আমাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দিকে এক পদও অগ্রসর হই নাই।

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নিবেদন-প্রধান কাতর রাজনীতিতে অভ্যস্ত, স্থানে স্থানে ইংরাজদের "জয়জয়কার" শ্রবণ করিয়া আবার সেই বিফল নীতিতে বিশ্বাসস্থাপন ও নিবেদন-প্রবণতাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে এই বিদেশযাত্রার অনিবার্য্য ফল। এখন জিজ্ঞাস্য এই, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যাহাই করুন, দেশবাসী এবং বিশেষতঃ বঙ্গবাসী, তাঁহার এই বৃথা চেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত কি? কোনও ব্যক্তিগত মত দ্বারা এই জাতি আর পরিচালিত হইতে পারে না। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও যুক্তি দেখিয়া দেশের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, রাজনীতিক্ষেত্রে যাহা সিদ্ধিদায়ক, শক্তি ও অর্থব্যয়ের তুলনায় যাহার ফল সন্তোষজনক, তাহাই আমাদের অনুষ্ঠেয়। সুরেন্দ্রবাবু যে "জয়জয়কারে" ভুল বিশ্বাস করিয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, সে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রশংসা; তাঁহার রাজনীতিক মতের সমর্থন অথবা রাজনীতিক দাবির অনুকূলতা-প্রকাশক নয়। যাঁহারা ভারতের উন্নতির প্রধান বিরুদ্ধাচারী, তাঁহারাও এই "জয়জয়কারে" উচ্চকণ্ঠে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে কি বোঝা গেল যে, তাঁহারা ভবিষ্যতে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতার অনুকূল আচরণ করিবেন। ইহা কখনও সম্ভব নয়। এই বাগ্মিতা-প্রভাবে তাঁহাদের মত

ও আচরণ কিঞ্চিতমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। যদি সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় কোন বিশেষ বা স্থায়ী ফল হইল না, তবে কি গোখলে, মেহতা, মালবিয়া, কৃষ্ণস্বামীর মিলিত বক্তৃতাস্রোতে ইংরাজের কঠিন মন এতই ভিজিবার আশা আছে যে এই ভূতশ্রাদ্ধে আমরা অজস্র টাকা ঢালিতে বাধ্য। ইংরাজ জাতি কার্য্যপটু ও বিচক্ষণ, কেবলমাত্র বক্তৃতায় ভুলে না, স্বার্থ ও দেশের হিত দেখিয়া রাজনীতিক পন্থা নির্দ্ধারণ করে। আমরা আগে জানিতাম উহাদের নিকট ভারতের দুঃখ, কর্ম্মচারীদের অত্যাচার জ্ঞাপন করিতে পারিলে বৃটিশ প্রজাতন্ত্রের এক কথায়ই আকাশ হইতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। সেই ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার কেহ যেন সেই পুরাতন মোহ উৎপাদন করিবার প্রয়াস না পান, পাইলেও দেশ শুনিবে না। ইংরাজ জাতিকে এমন বৃহৎ কি স্বার্থ দেখাইতে পারি যাহাতে তাঁহারা জাতীয় গর্ব্ব, লাভ ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে বিজিত দেশের সমস্ত শাসনভার ছাড়িতে পারে এবং কোন উপায়ে সেই বৃহৎ স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, ইহাই বিবেচ্য। সাম্রাজ্যরক্ষা ভিন্ন এমন কোন বৃহৎ স্বার্থ নাই। সাম্রাজ্য-রক্ষার আশায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ইংরাজ রাজনীতিতে নূতন পন্থা নয় তবে এই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট প্রকৃত উপকারের আশা অসঙ্গত। তাঁহাদের মনে সেই জ্ঞান জন্মাইবার একই পথ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ।

ধর্ম্ম
২য় সংখ্যা
১৪ই ভাদ্র ১৩১৬

জাতীয় মহাসভা

যে দিন সুরাটে জাতীয় মহাসভার বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, জাতীয়দলের সম্মিলনীর অধিবেশনে শ্রীযুত তিলক মহাসভার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া ঐক্য স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন ও মহাসভার কার্য্য ও উদ্দেশ্য রক্ষার্থ কমিটী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে কমিটী গঠনও হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কমিটীর অধিবেশন হয় নাই। শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ও শ্রীযুত বোডাস এই কমিটীর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ইহাই নির্ণয় করিলেন যে, এই বিভ্রাট সম্বন্ধে জাতীয়দলের দোষ-ক্ষালন করা ও প্রাদেশিক সমিতি সকলের অধিবেশনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

দেশবাসীর অভিমত জানা প্রথম কর্ত্তব্য, তৎপূর্ব্বে কমিটী আহ্বান করা বৃথা। এই গুরুতর বিষয়ে দেশবাসীর মত উপেক্ষা করিয়া পরামর্শ করা কোনও মতে বিধেয় বা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুইটী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জানা গেল যে, বঙ্গদেশের ও মহারাষ্ট্রের মতে ঐক্য স্থাপনই শ্রেয়স্কর এবং মহাসভার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রণালী ও কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত চারিটী মুখ্য প্রস্তাব সর্ব্বথা রক্ষণীয়। এলাহাবাদে কনভেনসনের কমিটী এই মত অগ্রাহ্য করিয়া ঐক্য স্থাপনের পথ বন্ধ করিল। তাহার পরেই আলিপুরে বোমার মোকদ্দমায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ধৃত ও অভিযুক্ত হইলেন। মহামতি তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, শ্রীযুত খাপার্দ্দে ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বিলাতে প্রস্থান করিলেন, বঙ্গদেশীয় জাতীয় দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ নির্ব্বাসিত হইলেন। দেশময় প্রবল নিগ্রহনীতিরূপ ঝটিকা বহিতে লাগিল। জাতীয় দলের নেতাগণের মধ্যে নাগপুর নিবাসী ডাক্তার মুঞ্জী, কলিকাতার শ্রীযুত রসুল এবং মধ্যস্থগণের মধ্যে পঞ্জাবের লালা রাজপত রায় ও বঙ্গদেশের শ্রীযুত মতিলাল ঘোষই রহিলেন। ডাক্তার মুঞ্জী প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়া ঐক্যস্থাপনের অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মধ্যপন্থীর প্রতিবাদে তাঁহাদের প্রস্তাব সকল প্রত্যাখ্যাত হইল। জাতীয় দলের নেতাগণ বিফলমনোরথ হইয়া নাগপুরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহাও রাজপুরুষদের আজ্ঞায় স্থগিত হইল। এই অনুকূল অবস্থায় কন্‌ভেন্‌সন কমিটীর নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে মান্দ্রাজে কনভেনসন্‌ সম্মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভা নাম ধারণ পূর্ব্বক বয়কট বর্জ্জন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চূণকালী মাখাইল, বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাগণও নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। এই বৎসর লাহোরে এই কৃত্রিম মহাসভার অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজনে শ্রীযুত নন্দী, লালা হরকিসনলাল ও পণ্ডিত রামভুজদত্ত চৌধুরী ত্রিমূর্ত্তি সাজিয়া, অসৎ হইতে সৎ সৃষ্টি করিয়া ঐশী শক্তির লক্ষ্য প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্জাবের প্রভাবশালী হিন্দুসভা সেই প্রদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে এই কৃত্রিম মরলীর ভেদনীতির পক্ষপাতী জাতীয় মহাসভার জাতীয়তা অস্বীকার করিতে আহ্বান করিতেছেন; লালা লাজপত রায়, লালা মুরলিধর, লালা দ্বারকাদাস প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত নেতাগণ এই আয়োজনের প্রতিবাদ করিয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ও এই রাজ-অনুগ্রহ-লালিত মহাসভায় যোগ দিতেছেন না। অতএব এই আয়োজনের সফলতা সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায় না। এই অবস্থায় ঐক্য স্থাপনের একমাত্র আশাস্থল হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। এই অধিবেশনে যদি ঐক্যস্থাপনের প্রকৃত প্রণালী নির্দ্ধারিত হয় এবং বঙ্গদেশের

মধ্যপন্থীগণ গোখলে—মেহতার আধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের মুখের দিকে চাহিয়া স্বপন্থা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবন করিয়া একতার পথ নিষ্কণ্টক করা যাইবে। গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় যে দেশদ্রোহিতা করিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহার কথায় দেশের অহিত-সাধন বঙ্গদেশীয় নেতাদিগের পক্ষে অতিশয় লজ্জাজনক হইবে। বোম্বাইয়ের নেতাগণ যে বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধকে দমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে? সুরেন্দ্রবাবু বিলাতে বয়কট সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া বোম্বাইয়ের নেতৃবৃন্দ এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, বিলাত হইতে পুনরাগমনকালে শ্রীযুত ওয়াচা ভিন্ন একজন সুপ্রসিদ্ধ মধ্যপন্থীও সুরেন্দ্র বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে যান নাই। তাঁহারা নাকি বয়কট নীতির সহিত তাঁহাদের সহানুভূতির অভাব ঘোষণার্থ এইরূপে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতাকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। লাহোরের সভা জাতীয় মহাসভাও নয়, মধ্যপন্থীদলের মহাসভাও নয়, বয়কট-বিরোধী রাজপুরুষভক্তের মহাসভা। যাহা হউক, জাতীয় দল হুগলীর অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তাহার পরে আপনাদের গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করিবেন। আমরা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব না।

হিন্দু ও মুসলমান

শাসন-সংস্কারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া বিরোধ বদ্ধমূল করিবার চেষ্টায় অনিষ্টের মধ্যে এই হিতও সাধিত হইয়াছে যে, নির্জ্জীব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-স্পন্দন হইয়াছে। তাঁহারা রাজপুরুষদের উপর দাবী করিতে এবং অসাধ্যসাধনের আশা পোষণ করিতে শিখিতেছেন। ইহাতেই দেশের পরম মঙ্গল। উহাদের আশা যে ব্যর্থ হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তাহা রাজপুরুষদের আচরণে বুঝা গেল। তাঁহারা যেমন অপর দেশবাসীদিগকে ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকার দান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়কেও সেইরূপ ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন অধিকার মাত্র দান করিয়া প্রকৃত শক্তিবিকাশের উপায় দিতে অসম্মত হইবেন। পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতি-প্রকাশক ইংরাজ আমাদিগকে আশা দিয়া যেমন নিবেদন-নীতিপ্রিয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সেইরূপ পৃষ্ঠপোষক ও সহানুভূতিপ্রকাশক জুটিবেন। শেষে মুসলমান ভ্রাতৃগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই নিবেদননীতি ফলপ্রসূ নয় এবং উঁহাদের প্রকৃত উপকার করিবার সামর্থ্য

ইংরাজ পৃষ্ঠপোষকগণের নাই। আমরা যদি এই শাসনপ্রণালীতে যোগদান করিতে অসম্মত হই, তবেই জাগরণের দিন শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে। যদি এই ভেদনীতিমূলক শাসন প্রণালীতে যোগদান করিয়া মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখাইলাম তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে। যদিও আমরা কাহারও প্রতিকূলতা ভয় করি না, তথাপি বিপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করা মূর্খতা মাত্র। আমরা কখনও মুসলমান ভ্রাতৃগণের তোষামোদ করি নাই, করিবও না, সরলমনে এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদিগকে জাতি সংগঠন কার্য্যে ব্রতী হইতে আহ্বান করিয়াছি। সেই আহ্বান শ্রবণ করিয়া নিজের হিত ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের বুদ্ধি, ভাগ্য ও সাধুতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি করিতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় সাহায্য করিব না।

পুলিশ বিল

সার এডওয়ার্ড বেকার পুলিশ বিল স্থগিত করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছেন। এই বিল আইনবদ্ধ হইলে যে অশান্তি ও অনর্থ ঘটিত, সংবাদপত্রে প্রতিবাদে ও বক্তৃতায় কতক পরিমাণে ও অস্পষ্টভাবে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। স্রোত ফিরিয়াছে। আমরা ৭ই আগষ্ট ভয় ও বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়া বুঝি ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। কুদিন অবসান হইতে যাইতেছে, সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে। আশা করিতে পারি যে, ইহার পরে জাতীয় শক্তির জয় ভিন্ন পরাজয় হইবে না। সেই শক্তির পুনর্বিকাশ, লোকমতের জয় ও চেষ্টার মঙ্গলময় পরিণামের পূর্ব্বলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ছোটলাটের মত প্রজাতন্ত্রের পক্ষেই আছে, ইহা জানা কথা, কিন্তু তাহার কার্য্য ও প্রকাশ্য কথা প্রজাতন্ত্রের প্রতিকূল হইয়াছে ও হইবে। তিনি লর্ড মরলীর আজ্ঞাবাহক ভৃত্য মাত্র, কেরাণীতন্ত্রের (Bureaucracy) প্রধান কেরাণী মাত্র, স্বতন্ত্র মত কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার নাই। তথাপি পুলিশ বিল স্থগিত হওয়ায় তাঁহার মন হইতে একটা চিন্তার ভার অপনীত হইবার কথা। আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই অনিষ্টকর বিল রুজু করেন নাই, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্থগিতও করেন নাই। বিলটি স্বর্গরাজ ইন্দ্রের বজ্রপাত নয়, আরও উচ্চ শৈলশিখরারূঢ় কখন সৌম্যমূর্ত্তি কখন রুদ্রমূর্ত্তি কোন সদাশিবের আদেশ-প্রসূত মহাস্ত্র। আমাদের অনুমান যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নিগ্রহনীতির জন্মস্থানে নিগ্রহমুদ্রা শিথিল হইয়া

পড়িতেছে। ইহা কি cooperation আকাঙ্ক্ষার ফল? কেহ যেন এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তী না হন যে, আমরা এত অল্পে ভুলিব। রাজনীতি প্রেমের মান মিলনের খেলা নয়; রাজনীতি বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। সেই বাজারে cooperation এর মূল্য control। অল্প মূল্যে বহুমূল্য বস্তু ক্রয় করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে।

জাতীয় রিসলী সারকুলার

আমরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা ৭ই আগষ্টে পরিষদের অধীন স্কুলসকলের ছাত্রবৃন্দকে বয়কট উৎসবে যোগদান করিতে নিষেধ করায় মফঃস্বলে অতিশয় কুফল ফলিতেছে। সাধারণ লোকের মন ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছে; যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সাহায্য করিতেন, তাঁহারা অনেকে সাহায্য বন্ধ করিতেছেন; এবং এই মত প্রচারিত হইতেছে যে, জাতীয় স্কুল কলেজে ও সরকারী স্কুল কলেজে নামমাত্র প্রভেদ বর্ত্তমান। শুনিয়াছি পরিষদের একজন বিখ্যাত সভ্য ছাত্রগণকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাঁহারা দেশের কার্য্যে যোগদান করিতে চান, তাঁহারা সরকারী কলেজের আশ্রয় গ্রহণ করুন। পরিষদের ইহাও মত হইতে পারে যে, মফঃস্বলের স্কুল সকল বন্ধ হউক, সাধারণ লোক সাহায্য বন্ধ করুন, আমরা বড় বড় লোকের অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় একটিমাত্র কলেজ চালাইয়া নিষ্কৃতি পাইব। যদি তাহাই হয় তবে সব ল্যাঠা চুকিয়া গেল। অন্যথা এই জাতীয় রিসলী সারকুলার প্রত্যাহার করা আবশ্যক।

গুপ্ত চেষ্টা

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ কোনও জেলা-সমিতি দ্বারা হুগলীর অধিবেশনে প্রতিনিধি নিযুক্ত না হন কয়জন পরম দেশহিতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা করিয়াছে। এই জঘন্য নীতি এখনও আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায়, ইহা বড় দুঃখের কথা। অরবিন্দবাবুকে যদি বয়কটই করিতে হয়, করুন। তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি দুঃখিত হইবেন না, দেশের কার্য্যে পশ্চাৎপদও হইবেন না। তিনি কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করেন নাই, পূর্ব্বে অনেক দিন স্বপথে একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যদি একাকী যাইতে হয়, যাইতে ভয় করিবেন

না। কিন্তু যদি এই মতই গৃহীত হয় যে, হিতের জন্য বা আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অরবিন্দবাবুর সংস্রব বর্জ্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই মত প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন কেন? এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাধিত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ডহারবার হইতে অরবিন্দবাবু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তোমাদের কনভেন্সন নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে হুগলীর অধিবেশন হইতেছে না, যে কোন সভা যে কোন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। ফলতঃ গুপ্ত-নীতি যেমন জঘন্য তেমনই নিষ্ফল। কপটতার অভাব ইংরাজদিগের রাজনীতিক জীবনের একটা মহান গুণ; তাহারা যাহা করিতে হয় তাহা সাহসের সহিত সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, আর্য্যভাবে করে। ভারতের রাজনীতিক জীবনে এই মহান গুণের অবতারণা করিতে হইবে। চাণক্যনীতি রাজতন্ত্রে পোষায়, প্রজাতন্ত্রে কেবল ভীরুতা ও স্বাধীনতারক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে।

মরলীর ভেদনীতি

শাসন-সংস্কারের ছায়ায় যে ভেদনীতিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, লর্ড মরলী তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশহিতৈষী গোখলে মহাশয় জলসিঞ্চন করিয়া সযত্নে পালন করিতেছেন। কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' স্বীকার করিয়াছেন যে, ভেদ-নীতিই ভারতীয় সৈন্য সংগঠনের মূলতত্ত্ব। ভেদনীতিই অনেক ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়। লর্ড মরলীর নীতিও ভেদনীতি-প্রধান। তাঁহার প্রথম চেষ্টা, মধ্যপন্থী দলকে রাজপুরুষ-দিগের হস্তগত করিয়া ও জাতীয় দলকে দলন করিয়া ভারতের নবোত্থান বিনষ্ট বা স্থগিত করিবার বিফল প্রয়াস। সুরাট অধিবেশনের সময় এই বিষ-বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের নেতাগণ ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ, শক্তি বা ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে কখনও উদার মত বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই। তাঁহারা অতি অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশের উত্থান ও বয়কট প্রচারের প্রভাবে তাঁহাদের আশাতীত শাসন-সংস্কার হইয়াছে। তাঁহারা সেই নবোত্থানের ফল স্বায়ত্ত করিয়া বয়কট ও বৈধ প্রতিরোধ বিনষ্ট করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন। সুরাট অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সংস্কারের সম্ভাবনা তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে বয়কট-বর্জ্জন ও চরমপন্থী দলের বহিষ্কার করিতে না পারিলে এই সুস্বাদু ফল তাঁহাদের মুখবিবরে পতিত হইবে না। এই দুই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাগপুর হইতে সুরাটে মহাসভা আনীত হইয়াছিল এবং মহাসভার কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন

প্রস্তাব হইয়াছিল; উদ্দেশ্য—জাতীয় দল আপনি মহাসভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতাও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল। মহামতি তিলক, শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতাগণ এই গুপ্ত অভিসন্ধি অবগত হইয়া মহাসভার কর্তৃপক্ষীয়দিগের কার্য্যে তীব্র প্রতিবাদ ও বয়কট-নীতি রক্ষার জন্যে চেষ্টা করিতেছিলেন। সুরাটের তুমুল কাণ্ডে তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সার ফেরোজ শাহ মেহতাই জয়ী হইলেন। আত্মদোষ-ক্ষালনের সময়ে জাতীয় দলের নেতাগণ বোম্বাইয়ের মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু মধ্যপন্থীচালিত অসংখ্য পত্রিকায় গালাগালির এমন রোল উঠিল যে, সত্যের ক্ষীণধ্বনি সেই কোলাহলে ভাসিয়া গেল। এখন সকল দেশবাসীকে বলিতে পারি, মেহতা-গোখলের কার্য্যকলাপ দেখুন, বুঝুন আমরা ভ্রান্ত ছিলাম, কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম; না বাস্তবিক তাঁহাদের ওইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। এই ভেদনীতি বোম্বাইয়ের মধ্যপন্থীগণকে অনায়াসে উদ্‌ভ্রান্ত করিল। বঙ্গদেশের নেতাগণ সেই কুপথের পথিক হন নাই, তাঁহারা বয়কট রক্ষা করিয়াছেন। ৭ই আগষ্ট স্বয়ং শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু রাজপুরুষদের মিনতি ও ভয় প্রদর্শন তেজের সহিত উপেক্ষা করিয়া বয়কট উৎসবের সভাপতি হইয়াছিলেন। আবার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বয়কট নাম প্রচার হইয়া আমাদের আনন্দ ও আশা উৎপাদন করিয়াছে। যদি ঐক্য স্থাপন কখনও সম্ভব হয়, যদি মরলীর ভেদনীতি বিফল হয়, তাহা বঙ্গবাসীর ঐক্যপ্রিয়তা ও বয়কটে দৃঢ়তা দ্বারাই সাধিত হইবে।

বিষবৃক্ষের অপর শাখা

লর্ড মরলীর দ্বিতীয় চেষ্টা, রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক করা। ইহাই ভেদনীতির দ্বিতীয় অঙ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় বিষময় ফল। এই সম্বন্ধে লর্ড মরলী গুপ্ত চেষ্টা করেন নাই, প্রকাশ্যেই ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া মুসলমান ও হিন্দুর চিরশত্রুতার ব্যবস্থা করিতেছেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধিতে মধ্যপন্থী নেতাগণ এমন মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ যে সেই অল্প লাভের আশায় এই মহান অনিষ্ট আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। গোখলে মহাশয় মুক্তকণ্ঠে এই ভেদনীতির প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে লর্ড মরলী ভারতের পরিত্রাতা। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের পৃথক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে যে মুসলমান ও হিন্দুর রাজনীতিক জীবনের শক্তি স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী হইয়া জাতীয় মহাসভার মূলতত্ত্ব ও ভারতের ভাবি

ঐক্য ও শান্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইবে এই সত্য গোখলে মহাশয়ের ন্যায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদের বুদ্ধির অগোচর হইতে পারে না। তবে কোন্ নিগূঢ় রহস্যময় সূক্ষ্মনীতির বশে গোখলে মহাশয় এই ভেদনীতির সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমাদের পূজনীয় সুরেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ দৃঢ়ভাবে এই শাসন-সংস্কার রূপ মহান অনর্থের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। বরং বিলাতপ্রবাসে প্রথম অবস্থায় এই শাসন সংস্কারের অযথা ও অমূলক প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমাত্র আস্থা নাই। যদি কয়েকজন বড় লোক এই নূতন শাসন প্রণালীতে যোগদান করিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া দেশের প্রকৃত হিত ভুলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সর্ব্বজনপূজিত নেতা এই বিষবৃক্ষে জলসেচন করিলে দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বুঝিতে হইবে। যাঁহারা এই সংস্কারে যোগদান করিবেন, তাঁহারা মরলীর ভেদনীতির সহায়, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টিকর্ত্তা ও ভারতভূমির ভবিষ্যৎ একতার বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবেন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র-নাথ এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করিতে কখনও সম্মত হইবেন না, ইহাই আমাদের আশা।

ধর্ম্ম
৩য় সংখ্যা
২১এ ভাদ্র ১৩১৬

শাসন সংস্কার

শাসন-সংস্কার গৃহীত হইলে যে কুফল ফলিবে, তাহা গতবারে বলা হইয়াছে এবং উহা দেশবাসীরও অবিদিত নহে। এরূপস্থলে যদি কেহ বলে যে, আমরা এই সংস্কারের দোষ দেখাইব কিন্তু তাহার মধ্যে যে সুবিধাটুকু দেওয়া হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন, তাহার বুদ্ধি বা রাজনীতি-জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারি না। যে দোষ দেখাইবেন সে দোষ রাজপুরুষ-গণের বুদ্ধির অগোচর নহে, তাঁহারা যে না বুঝিয়া সংস্কারে এই দোষ প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিতেন যে, এই দোষ সকলের প্রতিবাদ হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহা চান যে প্রতিবাদ করিয়াও দেশের নেতাগণ এই সৈন্য-সংস্কার প্রত্যাখ্যান না করুন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অভিসন্ধি সফল হইল। দোষ সংস্কৃত করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কেন না এই দোষ তাঁহাদের

যুক্তিতে দোষ না হইয়া সংস্কারের মুখ্য গুণ। এই সংস্কারে স্বাধীনতালুব্ধ দেশবাসীর শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, তাঁহারাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধে দুটী চিরসংঘর্ষ-প্রবৃত্ত শক্তির যুদ্ধে মধ্যস্থ ও দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবেন। তাঁহাদের এই নীতি দোষাবহ নয়, প্রশংসনীয়। তাঁহারা দেশ-হিতৈষী, স্বদেশের হিত, শক্তি বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যরক্ষার উপায় দেখিতেছেন। এই নীতি উদারনীতি নয়, কিন্তু উদারনীতি যদি স্বদেশের অহিতকর বিবেচনা করি, অনুদারনীতিই অবলম্বন করা দেশহিতৈষীর যোগ্য পন্থা। আমরা দেশের কল্যাণে নিরপেক্ষ হইয়া উদারনীতি অবলম্বন করিতাম, দেশহিতৈষিতা-ত্যাগে জগৎহিতৈষী সাজিতাম। এখন আমরাও স্বদেশের হিত, শক্তি বৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার পথ দেখি। দেশ আগে বাঁচুক, তাহার পরে জগতের হিত ও উদারনীতি আচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইব।

হুগলী প্রাদেশিক সমিতি

ইতিমধ্যে হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলাফল নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্য্যন্ত সমিতির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মত প্রকাশ অনাবশ্যক। এই বৎসর ভূতভবিষ্যতের সন্ধিস্থল। সমিতির কার্য্য-ফলের উপর বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। প্রবল নিগ্রহনীতি আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পড়িল। বঙ্গজাতির নবোত্থিত শক্তি ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে দেশবাসীর স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিলোপ হইতে চলিল। কোথায় নিগ্রহনীতির বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রতিরোধ করিয়া সেই নীতি বিফল করিবে, তাহা না হইয়া ভয়ে ও রাজনীতি-জ্ঞানরহিত বিজ্ঞতায় নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া প্রচারিত হইল, তাহাতে নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে, রাজপুরুষগণও বুঝিয়াছেন যে আমরা অমোঘ অস্ত্র আবিষ্কার করিলাম। এই নিশ্চেষ্টতা ও নীরবতায় দেশবাসীর মনপ্রাণ অবসাদপ্রাপ্ত ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছিল, জাতীয় শিক্ষার শেষ পরিণাম অতি শোচনীয় হইতেছে, বয়কটের বল ক্ষীণ হইয়া বিলাতী পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, গত পাঁচ বৎসরের যত চেষ্টা ও উদ্যম, শক্তিহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে। নেতাগণ হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া দেশের প্রকৃত নেতৃত্বকার্য্য করিতে অক্ষম, কন্‌ভেন্‌সন-নীতির মমতা ও শাসন-সংস্কারের মোহত্যাগ করিতে চান না, মুখে প্রকৃত জাতীয় মহাসভার পক্ষপাতী, কার্য্যে তাহার পুনঃসৃষ্টি করিবার কোনও আয়োজন করিতেছেন না, শাসন-সংস্কার গ্রহণ করিতেও ভয় করেন, প্রত্যাখ্যান করিতে

হইলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। এই অবস্থায় যাঁহারা দেশের জন্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা ভয়ের পরিচয় রাখেন না, ভগবান ও বঙ্গজননী ভিন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। যদি আমরা প্রাদেশিক সমিতিতে দেশের মুখ-রক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ আশা রক্ষা করিতে পারি, পথ অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়া থাকিবে। সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছি। নচেৎ নিজের পথ নিজে পরিষ্কার করিয়া ভয়ার্ত্ত ও নিগ্রহনীতিবিক্ষুব্ধ দেশের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।

দৈনিক পত্রিকার অভাব

জাতীয় দলের শক্তি অনেক দিন অন্তর্নিহিত হইয়া ছিল, আবার বিকাশ হইতেছে। কিন্তু সেই শক্তিবিকাশের উপযোগী উপকরণের অভাবে সম্পূর্ণ কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব। আমরা যথাসাধ্য আর্য্যধর্ম্ম ও ধর্ম্মসম্মত রাজনীতির প্রকাশপূর্ব্বক এই বিকাশের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্র দ্বারা এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয় না। বিশেষতঃ আমাদের রাজনীতিক জীবনে দৈনিক পত্রিকার অভাব গুরুতর অভাব। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে জাতীয় দলের মত বা কর্ত্তব্য লোকের সম্মুখে স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের চেষ্টায় তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারে না। সেদিন কলেজ স্কোয়ারে এক স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটী সুপ্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পত্রিকার কর্ত্তাগণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। সেই সভায় শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, ইহাতে হয়ত কর্ত্তাগণ ভীত বা বিরক্ত হইলেন, সে ভয় ও বিরক্তি স্বাভাবিক, আজকালকার দিনে বয়কট নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যক্তিগত মঙ্গল সম্ভব। বয়কট প্রচারের জন্য স্বাধীন দৈনিক পত্রিকার আবশ্যকতা প্রতিদিন বোধ হইতেছে।

মেহতা মজলিসের সভাপতি

সভা হইবে কি না স্থির নাই। কিন্তু পতিত্ব লইয়া বিষম সমস্যা উপস্থিত। মান্দ্রাজ কন্‌ভেন্‌সনের পুনরাবৃত্তি এবার লাহোরে হইবার কথা।

কিন্তু লাহোরের দেশভক্তগণ দেশসেবার এই কৃত্রিম অভিনয়ের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। দেশে মানে না, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অথচ দেশের দশ পাঁচ জন মাথাধরা লোক দেশের লোকের নামে, ডিক্রি ডিসমিস করিবেন ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুমোদন করিতে পারেন ? সে যাক। এখন সভাপতির কথা। এ সম্বন্ধে ভারত মিত্র বেশ বলিয়াছেন ঃ—ভিন্ন কংগ্রেসের পক্ষপাতিগণ আগামী লাহোর কনভেনসনে মান্দ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদকে সভাপতি করিতে চান। কিন্তু নবাব সাহেব এ সম্মান গ্রহণে সম্মত নন। এখন পাঞ্জাবের কংগ্রেস কমিটী সার ফিরোজ শা মেহতাকে সভাপতি করিতে চাহিতেছে—মেহতা সম্মত না হইলে অগত্যা সুরেনবাবু। ভারত মিত্র বলিতেছেন আমরা বলি যেরূপ করিয়াই হউক মেহতা সাহেবকেই সভাপতি করা উচিত। তিনিই ভাঙ্গা কংগ্রেসের জন্মদাতা। সুতরাং কংগ্রেসের (?) সভাপতিত্ব তাঁহাকে যেরূপ সাজে আর কাহাকেও সেরূপ সাজে না। লোকে এখন হইতেই ভাঙ্গা কংগ্রেসকে মেহতা মজলিস বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ধর্ম্ম
৪র্থ সংখ্যা
২৮এ ভাদ্র ১৩১৬

অসম্ভবের অনুসন্ধান

হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে সভাপতি শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয় দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যাঁহারা অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, মধ্যপন্থীরাই অধীরতার পরিচয় দিয়াছেন; জাতীয় দলের বিরুদ্ধে অধীরতার অভিযোগের কারণ নাই। হুগলীতে যে জাতীয়দলের সংখ্যাধিক্য ছিল, তাঁহাতে সন্দেহ নাই; অথচ বিরোধ-বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ স্বাবলম্বন ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইহাও যদি অধীরতা হয় তবে ধীরতা বোধ হয় জড়তার নামান্তর মাত্র। অসম্ভব আদর্শের কথায় আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, যাহারা বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে কিছুই দেখিতে চাহে না ও পারে না তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাবুকদিগকে চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। যে সকল কর্ম্মবীর সঙ্কটসময়ে বিশেষ

বিচার ও বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতের উন্নতির ভিত্তিস্থাপনক্ষম তাঁহাদের ভাগ্যেও ঐরূপ উপহাস লাভ ঘটিয়া থাকে। ফলের বিষয় না জানিয়া অপেক্ষা করা জড়ত্ব, তাহা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেখানে স্থৈর্য্য মূঢ়ের কার্য্য; গতিই জীবন। ভারতে মধ্যপন্থী সম্প্রদায়ের অকারণ ভীতিই জাতীয় উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে জাগরণ, যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, যে আবেগ আসিয়াছে জাপানে, পারস্যে, তুরস্কে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বড়লাট লর্ড মিণ্টোও স্বীকার করিয়াছেন, সে-প্রবাহের গতিরোধ করা মানবের সাধ্যাতীত। অথচ মধ্যপন্থীরা একথা বুঝেন না। বা বুঝিয়াও বুঝেন না সর্ব্বত্রই সংস্কারে প্রজাশক্তির আত্মবিকাশ দেখা যাইতেছে। কেবল ভারতেই অপেক্ষার আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই আদেশদাতা লর্ড মরলী —সমস্ত জীবন প্রজাশক্তির সমর্থন করিয়া জীবনের সায়াহ্নে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্যে জড়জীবন যাপনের আদেশ করিয়াছেন। এ অবস্থায়— জাতীয় দলের উন্নতি-চেষ্টা উপহাসাস্পদ না মধ্যপন্থীদিগের পরনির্ভরতা ও জড়ত্ব উপহাসাস্পদ?

যোগ্যতা বিচার

ভাবে বোধ হয়, সভাপতি মহাশয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার কথায় অযথা বিশ্বাস-বান হইয়া মনে করেন, আমরা আজও স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত নহি। স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনাকালে একজন বক্তাও এই কথাই বলিয়া-ছিলেন! আমাদিগকে অনুপযুক্ত বলা ব্যতীত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার পক্ষে স্বেচ্ছাচার সমর্থনের অন্য উপায় নাই। এ অবস্থায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ার স্বার্থ-সমর্থক যুক্তি স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই যুক্তি গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। গ্ল্যাডষ্টোন বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-সম্ভোগই লোককে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে। স্বায়ত্ত-শাসন-সম্ভোগ ব্যতীত স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী হইবার উপায়ান্তর নাই। আমরা অবগত আছি, স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে প্রথম আমাদের ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্য। সকল দেশেই এইরূপ হইয়াছে। জাপানের ভ্রম হইয়াছে, তুরস্ক ও পারস্যে এখনও ভ্রম ঘটিতেছে। তাই বলিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর না হওয়া আর উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য অর্গলবন্ধ করা একই কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা ভ্রান্ত শিক্ষায় আপনাদিগকে অসার ও অনুপযোগী বলিয়াই বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলাম। আজ সে ভ্রম অপগত। আজ আমরা বুঝিয়াছি, এ জাতির জীবন-স্পন্দন বন্ধ হয় নাই—এ জাতি জীবিত। এই অনুভূতিই জাতীয়

উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট। আর এই অনুভূতিই আমাদিগকে উন্নতির পথারূঢ় করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে মোক্ষলাভে সক্ষম করিবে। এ অবস্থায়—আজ যখন উন্নতি আরব্ধ তখন—যোগ্যতা-বিচারের ছল করিয়া উন্নতির গতি বন্ধ করিয়া স্থির হওয়া মূঢ়ের কার্য্য। আজ জাতীয় জীবনে যে সময় উপস্থিত সে সময়ের গতি রুদ্ধ হইলে আমরা উন্নতির পথে পিছাইয়া পড়িব—অগ্রসর হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদিগকে অগ্রসরই হইতে হইবে; শঙ্কায় বা সন্দেহে বিচলিত না হইয়া স্থির ও ধীরপদে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই আজ আমাদের কর্ত্তব্য।

চাঞ্চল্য-চিহ্ন

আমাদের কোন কোন বিজ্ঞ মধ্যপন্থী এমন কথাও বলেন যে, আজকাল কোন কোন সভায় কিছু কিছু গোলমাল হয়; ইহাতে রাজনীতিক অধিকার লাভে আমাদের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এ কথাটাও তাঁহাদের মৌলিক নহে, কপটাচারী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। যে সকল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এরূপ মত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে কপটাচারী বলিলাম, কারণ তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিলাতে রাজনীতিক সভা-সমিতিতে যেরূপ গোলমাল হয় ভারতে সভা-সমিতিতে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ধীর প্রকৃতি ভারতবাসীরা সেরূপ ব্যবহারে একান্ত অনভ্যস্ত। আমাদের দেশে সভা-সমিতিতে গোলযোগের দুইটী প্রধান দৃষ্টান্ত দেখা যায়;—সুরাটে সুরেন্দ্রনাথের কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই, তিনি বক্তৃতা বন্ধ করিয়া বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর সুরাটেই মধ্যপন্থীরা শ্রীযুত বাল গঙ্গাধর তিলককে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বিষম গোলযোগ উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভায় প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার ব্যালফোর গোলমালে বক্তৃতা করিতে পারেন নাই, শেষে দুইজন ছাত্র নারীবেশে মঞ্চে উঠিয়া তাঁহাকে জুতার মালা উপহার দেয়। তিনি হাসিতে হাসিতে সে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর একবার ছাত্রগণ কোন বক্তার বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হইয়া মারামারি করে ও পুলিশকে বিষম প্রহার করে। বিচারে ছাত্রদিগের কোনরূপ দণ্ড হয় নাই। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমাদের দেশে রাজনীতিক আন্দোলনে সভা-সমিতিতে এইরূপ চাঞ্চল্য আরব্ধ হউক। আমরা এই কথা বলিতে চাহি যে, এইরূপ চাঞ্চল্যে স্বায়ত্ত-শাসনলাভে আমাদের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয় না; পরন্তু ইহা জীবনের লক্ষণ। বরং ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, আমরা যুগ-ব্যাপী-

জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া নবীন উদ্যমে নবীন শক্তিতে নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি।

হুগলীর পরিণাম

হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন দ্বারা জাতীয় পক্ষের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মধ্যপন্থীদের মনের ভাব তাঁহাদের আচরণে বোঝা গেল, জাতীয় পক্ষের প্রাবল্যও সকলের অনুভূত হইল। বঙ্গদেশ যে জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন হুগলীতে জাতীয় পক্ষের দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতাই অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং এই বর্ষকালব্যাপী দলন ও নিগ্রহে এই দলের কি অদ্ভুত শক্তিবৃদ্ধি এবং তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর জাতীয় ভাব ও দৃঢ় সাহস জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দিত ও প্রফুল্ল হইল। কেবলমাত্র কলিকাতা বা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নহে, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি পশ্চিম বঙ্গের জেলা সকল হইতে জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি সমিতিতে গিয়াছিলেন। আর একটী শুভ লক্ষণ তেজস্বী ও ভাবপ্রবণ নবীন দলের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য নহে অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শৃঙ্খলা ও নেতাদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতাও হুগলীতে দেখা গেল। জাতীয় পক্ষের নেতারা কখনও মধ্যপন্থী নেতাগণের ন্যায় স্বেচ্ছায় কার্য্য চালাইতে ইচ্ছুক হইবেন না, দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গন্তব্যপথ নির্ণয় করিবেন, কিন্তু একবার পথ স্থির হইলে নেতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আবশ্যক। সেই বিশ্বাস যদি টলে, নূতন নেতা মনোনীত করা শ্রেয়স্কর, কিন্তু কার্য্যের সময়ে প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধি না চালাইয়া একপ্রাণ হইয়া নেতাকে সাহায্য করা উচিত। পথনির্ণয়ে স্বাধীন চিন্তা ও বহু জনের পরামর্শ নির্ণীতপথে সৈন্যের ন্যায় শৃঙ্খলা ও বাধ্যতা, ইহাই প্রজাতন্ত্রে কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃত উপায়। অতএব হুগলী অধিবেশনে ইহাই প্রথম উপলব্ধি হয় যে, জাতীয় পক্ষ এক বৎসরের নিগ্রহ ও ভয় প্রদর্শনে অধিক বলান্বিত ও শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা এতদিনের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ।

দ্বিতীয় ফল মধ্যপন্থীদের মনের ভাব কার্য্যে প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, সে সংস্কার নির্দ্দোষ হউক বা সদোষ হউক, দেশের হিতকর হউক, বা অহিতকর হউক, তাহা সংস্কার নামে অভিহিত, অতএব গ্রহণীয়, পুরাকালের কংগ্রেসের চিরবাঞ্ছিত দুর্লভ স্বপ্ন, অতএব গ্রহণীয়; তাহা লর্ড মরলীর প্রসূত মানস-সন্তান, অতএব, গ্রহণীয়; উপরন্তু মরলী-রিপণ-প্রসূত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের চরম-অবস্থা আনয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অতএব গ্রহণীয়! তাহাতে জাতীয় একতার আশা

লুপ্তপ্রায় হউক বা না হউক, নেতাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিবার নহে। বয়কটকে বিষরহিত প্রেমময় স্বদেশীতে পরিণত করাও নেতাদের স্থির অভিসন্ধি। স্বয়ং সভাপতি মহাশয় শেক্ষপীরকে প্রমাণ করিয়া বয়কট নাম বয়কট করিবার পরামর্শ দিলেন; পাছে মরলী-মডারেটের মিলনমন্দিরে বিদ্বেষ বহ্নি প্রবেশ করিয়া সব ভস্মসাৎ করে। আরও বোঝা গেল যে মধ্যপন্থী নেতাগণ বৈধ প্রতিরোধ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। বাস্তবিক মিলন যখন হইয়াছে, শাসন-সংস্কার যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন প্রতিরোধের আর আবশ্যকতা কোথায়? বিপক্ষে বিপক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব, প্রেমিকে প্রেমিকে প্রার্থনা অভিমান ও ক্ষণিক মনোমালিন্যই শোভা পায়। এই পুরাতন-নীতির পুনঃসংস্থাপনের ফল, নেতাগণ কন্‌ভেন্সনকে আরও দৃঢ় করিয়া আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, মান্দ্রাজে বয়কট বর্জ্জন করিলে সুরেন্দ্রনাথ কন্‌ভেন্সন ত্যাগ করিবেন বলিয়া কয়েকজন যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, সেই আশা বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে এখনও সন্দেহ বর্ত্তমান, জাতীয় মহাসভার পুনঃসংস্থাপন সম্ভব না অসম্ভব? একপক্ষে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে দেখা গেল যে, সভায় কোন পূর্ণ জাতীয়ভাব প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা সমিতি ভাঙ্গিয়া সরিয়া পড়িব, ইহাই মধ্যপন্থীদিগের দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে প্রকৃত ঐক্য অসম্ভব। ইহার তাৎপর্য্য কি? পূর্ণ রাজপুরুষ ভক্তি প্রকাশক কোনও প্রস্তাব উপস্থিত হইলে জাতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য, যত নিষ্ফল প্রার্থনা, প্রতিবাদ, নিবেদন গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু পূর্ণ জাতীয় ভাবব্যঞ্জক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। এই সর্ত্তে কোন প্রবল ও বর্দ্ধনশীল দল সমিতিতে থাকিতে সম্মত হইবে না, বিশেষতঃ যে দলের স্থায়ীভাবে সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। অপরপক্ষে জাতীয় পক্ষের নির্ব্বন্ধে দুই দলের একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, জাতীয় মহাসভায় ঐক্য স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য, সভ্যদিগের চারিজন মধ্যপন্থী, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, শ্রীযুত অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং চারিজন জাতীয় পক্ষের শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীযুত রজতনাথ রায়, শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কৃতান্তকুমার বসু। ইঁহারা যদি একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার ঐক্য সংস্থাপন চেষ্টাসাধ্য হইবে। চেষ্টা করিলেও যে ঐক্য সাধিত হইবে, তাহাও বলা যায় না; কেন না যদি মেহতা ও গোখলে অসম্মত হয়েন অথবা বর্ত্তমান ক্রীড ও কার্য্যপ্রণালী বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বলেন, তাহা হইলে মধ্যপন্থী নেতাগণের পক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় মহাসভা সংস্থাপনে উদ্যোগী হওয়া অসম্ভব।

এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও বিদ্যমান,

তাহাই জাতীয় পক্ষ ধরিয়া আছেন, সেই আশায় সংখ্যায় অধিক হইলেও তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে মধ্যপন্থীদের নিকট ইচ্ছা করিয়া হার মানিয়াছেন। এই-রূপে ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সবল পক্ষই দেখাইতে পারে। যাঁহারা স্বীয় বল অবগত আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা সেই বল প্রয়োগ করিতে ব্যস্ত হয়েন না। আমরা সুরাট অধিবেশনে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলাম, বোম্বাইয়ের নেতা-দিগের অন্যায় অবিচার ও অপমান সহ্য করিয়াও শেষে ধৈর্য্যভঙ্গে সেই আত্ম-সংযমের ফললাভ করিতে পারিলাম না, সেই দোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে হুগলীতে প্রবল হইয়াও দুর্ব্বল মধ্যপন্থীদলের সমস্ত আবদার সহ্য করিয়া একতার সেই ক্ষীণ আশা যাহাতে আমাদের দোষে বিনষ্ট না হয়, সেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া প্রাদেশিক সমিতিকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলাম। দেশের নিকট আমরা দোষমুক্ত হইলাম, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের অভিশাপ মুক্ত হইলাম, ইহাই আমাদের আত্মসংযমের যথেষ্ট পুরস্কার। মহাসভার একতা সাধিত হইবে কি চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইবে, তাহা ভগবানের ইচ্ছাধীন আমাদের নহে। আমরা ক্রীড সহ্য করিব না, যে কার্য্য প্রণালী দেশের অনু-মতি না লইয়া প্রচলিত করা হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ প্রকাশ্যসভায় তাহা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমরাও গ্রহণ করিব না। এই দুই বিষয়ে আমরা কৃতনিশ্চয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন আমাদের পক্ষ হইতে কোনও বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। বাধা যদি হয়, অপর পক্ষ হইতে হইবে।

কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। কবে কোন্ অতর্কিত দুর্ব্বিপাকে বঙ্গদেশের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের জাতীয় পক্ষ আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয় দলকে আহ্বান করিতেছি, এখন কার্য্য ক্ষেত্রে আবার অবতরণ করি; ভয়, আলস্য, নিশ্চেষ্টতা দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধকদের সাজে না, দেশময় জাতীয় ভাব প্রবলভাবে জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু কর্ম্মদ্বারা প্রকৃত আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় না দিতে পারিলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্থায়ী হইবে না। ভগবান কর্ম্মের জন্য, নবযুগ প্রবর্ত্তনের জন্য, জাতীয় পক্ষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইবার কেবল উত্তেজনা ও সাহস নহে, ধৈর্য্য, সতর্কতা ও শৃঙ্খলতা প্রয়োজনীয়। ভগবানের শক্তি বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছে; এবার সহজে তিরোহিত হইবে না। অযাচিত ভাবে দেশসেবা করি, পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আছে: হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম জাগিয়াছেন, ভয় ও সন্দেহ উপেক্ষা করিয়া ধীরভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হই।

ধর্ম্ম

৫ম সংখ্যা

৪ঠা আশ্বিন ১৩১৬

শ্রীহট্ট জেলা সমিতি

জাতীয় ভাবের বিস্তার এবং আশাতীত বৃদ্ধি হুগলীতে অবগত হইয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে ইহার চূড়ান্ত দেখা গেল। পূর্ব্বাঞ্চলের এই দূর প্রান্তে মধ্যপন্থী নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, তথায় জাতীয় ভাবই অক্ষুন্ন ও প্রবল। শ্রীহট্টবাসীগণ ভারতবন্ধু বেকরের রামরাজ্যে বাস করেন না, তথাপি নিগ্রহ-নীতির জন্মস্থানে সমিতি করিয়া স্বরাজের নাম করিতে ভয় করেন নাই, সর্ব্বাঙ্গীন বয়কট সমর্থন করিতে সাহসী হইয়াছেন, আবেদন-নিবেদননীতি বর্জ্জনপূর্ব্বক আত্মশক্তি ও বৈধ প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্ট জেলা সমিতিতে স্বরাজ ধর্ম্মতঃ প্রত্যেক জাতির প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সমিতি দেশবাসীদিগকে স্বরাজ-লাভের জন্য সর্ব্ববিধ বৈধ উপায় প্রয়োগ করিতে আহবান করিয়াছেন। এই অধিবেশনে কয়েকটি নূতন লক্ষণ দেখিলাম। প্রথমতঃ, সমিতি রাজনীতির সঙ্কীর্ণ গন্ডীর বাহিরে যাইতে সাহসী হইয়া বিলাত-যাত্রার প্রশংসনীয়তা প্রচার করিয়াছেন ও জাতীয়ভাবাপন্ন বিলাত-প্রত্যাগত-দিগকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে যথেষ্ট বাদবিবাদ হয় কিন্তু মতামত দিবার সময়ে সর্ব্বসমেত এগারজন বিলাতযাত্রা-বিরোধীর সংখ্যা একাদশের অধিক হয় নাই। প্রতিনিধিদের মধ্যেও ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। পাঁচ শত প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় চল্লিশজন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, বহুশত কণ্ঠের গগন ভেদী "বন্দেমাতরং" ধ্বনির সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইল। দ্বিতীয়তঃ, অধিবেশনের সময়ে এই প্রস্তাব ভিন্ন আর কোনও প্রস্তাব গ্রহণে বক্তৃতা করা হয় নাই। প্রস্তাবক, অনুমোদক ও সমর্থক সকলে বিনা বক্তৃতায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তৃতীয়তঃ, অধিবেশন সহরে না হইয়া জলপ্লাবিত জলসুকা গ্রামে হইয়াছে। চতুর্থতঃ, সভাপতির আসনে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল বা বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তা বিরাজমান না হইয়া একজন সুপন্ডিত ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীতুল্য নিষ্ঠাবান ধুতি-চাদর পরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত ব্রাহ্মণ সেই আসন গ্রহণে সর্ব্বজন সম্মতিতে নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সকল সুলক্ষণ দেখিয়া কাহার মনে আশা ও আনন্দ সঞ্চার হইবে না? অশিক্ষিত জনসম্প্রদায় এখনও আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই, শিক্ষার অভাবে সেইরূপ যোগদান দুঃসাধ্য, কিন্তু আন্দোলন কয়েকজন ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উকিল, ডাক্তার, সংবাদপত্র-সম্পাদক ও শিক্ষকের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমস্ত শিক্ষিত

সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট ও আত্মসাৎ করিয়াছে, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সহরবাসী, গ্রামবাসী কাহাকেও বাদ দেয় নাই, ইহাই আশার কথা।

প্রজাশক্তি ও হিন্দু সমাজ

বিলাত যাত্রার প্রস্তাবকে কেন সুলক্ষণ বলিলাম, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত। কারণ এই সম্বন্ধে এখনও মতের ঐক্য নাই, অতএব এইরূপ সামাজিক কথা উত্থাপিত না করাই শ্রেয়স্কর, ইহাই অনেকের ধারণা। আমরাও পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিতাম, এখনও যদি জাতীয় মহাসভায় এই প্রশ্ন আলোচিত হইত, আমরা তাহা বারণ করিতাম। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে কয়েকজন ইংরাজী-শিক্ষিত, বিলাতীভাবাপন্ন ভদ্রলোক ভিন্ন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ রাজনীতিক সভার অধিবেশনে যোগদান করিতেন না। ইঁহারা হিন্দুসমাজ সম্পর্কীয় জটিল প্রশ্নগুলির বিচার করিবার অধিকারী ছিলেন না, সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে হাস্যাস্পদও হইতেন, হিন্দুসমাজের ক্রোধ ও ঘৃণার পাত্র হইতেন। যে সামাজিক সমিতি মহাসভার অধিবেশনস্থানে বসিত, তাহাও সেরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিত। সমাজই সমাজরক্ষা ও সমাজসংস্কার করিতে পারে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম মানেন, তাঁহারাই হিন্দুসমাজের পুনরুজ্জীবনে ও ধর্ম্মসংস্থাপনে ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সেই সমাজকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে উপহাস করেন, তাঁহারা সংস্কারের কথা তুলিলে সেই চেষ্টাকে অনধিকার চর্চ্চা ভিন্ন আর কি বলিব? মহাসভায় এখনও সমস্ত হিন্দু সমাজ যোগদান করেন নাই, অতএব মহাসভা এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণে অনধিকারী। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র! নিষ্ঠাবান হিন্দু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উপরন্তু হিন্দুসমাজ রক্ষার উপায় না করিলে আর চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার আক্রমণে আমাদের সব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আচার-বিচার আজকাল ভান মাত্র, ধর্ম্মে জীবন্ত আস্থা ও বিশ্বাস এখন লুপ্ত না হইলেও কমিয়া গিয়াছে, মুসলমান ও খৃষ্টানের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া হিন্দুর সংখ্যা সবেগে হ্রাস পাইতেছে, পূর্ব্বে সময়োপযোগী, বর্ত্তমানে অনিষ্টকারক কয়েকটি প্রথার উপর অনুচিত মমতা বশতঃ জাতির উন্নতি ও মহত্ব প্রাপ্তি স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন, রাজশক্তিই ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে ও সাহায্যে সমাজরক্ষা ও সময়োপযোগী সমাজ-সংস্কার করিত। সেই রাজশক্তি লুপ্ত, শীঘ্র পুনরায় সংস্থাপিত হইবার আশাও নাই। তবে প্রজাশক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে ও সংস্থাপিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই

অবস্থায় প্রজাশক্তি পুরাতন হিন্দু রাজশক্তির স্থান অধিকার করিয়া সেই রূপেই সমাজরক্ষা ও সমাজ-সংস্কার করা উচিৎ; নচেৎ হিন্দু জাতি উৎসন্ন হইবে। শ্রীহট্টে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই প্রস্তাবের মুখ্য সমর্থক ছিলেন, প্রতিনিধিগণের মধ্যেও বোধহয় বিলাত-ফেরত কেহ ছিলেন না, গ্রামে গ্রামে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই-স্থলে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হওয়া আশার লক্ষণই বলিতে হইবে। ইহাতে হিন্দুসমাজেও আঘাত লাগিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এইরূপ প্রস্তাব অতিশয় সতর্কতার সহিত গৃহীত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণ ও প্রত্যেক বর্ণের মুখ্য মুখ্য সমাজিক নেতাদিগকে প্রস্তাবগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাহার পরে প্রস্তাব গ্রহণ করাই যুক্তি-সংগত।

বিদেশ যাত্রা

বিদেশযাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর মতের অনৈক্য থাকিতে পারে না। আমরা সকলে স্বদেশীর বিস্তারকে জাতির জীবন রক্ষার মুখ্য উপায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে সেই বিস্তার হওয়া দুঃসাধ্য। যাঁহারা শিল্পশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা দেশের রক্ষার্থে এবং সমাজ পুষ্ট্যর্থে বিদেশ যাত্রা করিবেন, পুণ্যকার্য্যে ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইয়া যাইবেন। কোন মুখে সমাজ এই কার্য্যকে পাপকার্য্য বা সমাজচ্যুতির উপযুক্ত কুকর্ম্ম বলিবেন, কোন্ মুখে উৎসাহী যুবকবৃন্দকে এই মহৎ উন্নতি-চেষ্টায় নিযুক্ত করিয়া সেই আজ্ঞাপালনের পুরস্কার না দিয়া বিষম সামাজিক শাস্তিতে দণ্ডিত করিবেন। এতগুলি তেজস্বী ধর্ম্মপ্রাণ স্বদেশহিতৈষী জাতীয়ভাবাপন্ন যুবক যদি সমাজ হইতে বিতাড়িত হন, তাহাতে হিন্দু সমাজের কি কল্যাণ সাধিত হইবে—যুক্তির দিক দেখিতে গেলে বিলাত-যাত্রা নিষেধের পক্ষে কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। শাস্ত্রের দিক হইতেও বিদেশ যাত্রার কোনও অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হয় না। শাস্ত্রের দুয়েকটি শ্লোকের দোহাই দিলে চলে না, শাস্ত্রের ভাবার্থ ও আর্য্যসমাজের পুরাতন প্রণালীও দেখিতে হয়। অতি অর্ব্বাচীন কাল পর্য্যন্ত বিদেশ যাত্রা ও সমুদ্র যত্রা বিনা আপত্তিতে চলিত, আর্য্য সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সমাজ-রক্ষা ও আচার-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে, তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে সমুদ্রযাত্রা ও আটক নদীর ওইদিকে প্রবাস করা নিষিদ্ধ হয়। সেইরূপ কারণেই জাপানে বিদেশযাত্রা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ বিধান কালসৃষ্ট, কালে নষ্ট হয়, সনাতন প্রথা হইতে পারে না। যতদিন জাতি ও সমাজ তাহা দ্বারা উপকৃত ও

রক্ষিত হয়, ততদিন সময়োপযোগী বিধান থাকে, যে দিন জাতির ও সমাজের বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া যায়, সে দিন হইতে তাহার বিনাশ অবশ্য-ম্ভাবী। বিদেশফেরত ভারতবাসীর ইংরাজ অনুকরণ, সমাজের উপর উপেক্ষা ভাব এবং উদ্ধত আচরণ ও কথায় এই কল্যাণকর সংস্কারের বিলম্ব হইয়াছে। সমাজ মানিয়া, সমাজে থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা সমাজ বিনাশের চেষ্টায় সাধিত হয় না।

তারপুরে চিনির কল

গতবারে তারপুরে যে দেশী চিনি প্রস্তুত করিবার নূতন চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়, নূতন সংস্থার যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা আমাদের নিকট এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় বোঝা গেল যে প্রথম পারিবারিক বিপদেই এই কলে কার্য্য বন্ধ হইল, দ্বিতীয়বার রায় ধনপতসিংহের বিধবা স্ত্রী একজন সুদক্ষ ম্যানেজারের সাহায্যে চালাইতে লাগিলেন, সেই ম্যানেজারের মৃত্যুতে আবার কল বন্ধ হইল। এই অবস্থায় তাঁহার দ্বারা এই বৃহৎ চেষ্টা সফল হইবার যোগ্য হইয়াও সফল হয় না দেখিয়া কলের মালিক কল বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় নূতন কোম্পানী অল্পমূল্যে কিনিতে পারিলেন। বাজারে জাভার চিনির প্রভূত বিক্রয়ে স্বদেশী চিনি প্রথম অবস্থায় তত লাভকর যদি না হয়, তথাপি গুড় হইতে নানা বস্তু প্রস্তুত হয় যাহাতে নিশ্চিত ও প্রচুর লাভ হয়, কোম্পানীর কর্ত্তাগণ সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য দিবেন। ইহা ভিন্ন আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত রসায়ন বিদ্যাপারগ শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্যে যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এই সংস্থার বিশেষ উন্নতির আশা করা যায়। মূলধন সংগ্রহ হইলেই গিরীন্দ্রবাবু দেশে ফিরিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

ধর্ম্ম
৬ষ্ঠ সংখ্যা
১১ই আশ্বিন ১৩১৬

লালমোহন ঘোষ

গত পূর্ব্ব শনিবার বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের লোকান্তর হইয়াছে। ইনি শেষ বয়সে বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণকে বর্জ্জন করিয়া কেবল মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত লোককে লইয়া রাজনীতিক আন্দোলন সফল হইতে পারে না; প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিবার প্রথা তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।

লালমোহনের প্রথম বয়সে বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় নাই তাই তিনি বিলাত পার্লামেন্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ঘটনাচক্রে ফলবতী হয় নাই।

লালমোহন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বক্তৃতা বিদেশীর বলিয়া বুঝিতে পারিত না। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনকালে ব্যারিষ্টার ব্রানসন যখন টাউন হলে বাঙ্গালীদিগকে গালি দেন তখন লালমোহন ঢাকায় নর্থব্রুক হলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার তীব্রতার তুলনা নাই। সেই বক্তৃতার ফলে ব্রানসন ভারত-বাসী অ্যাটর্নী-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

লালমোহন শেষ বয়সে নব ভাবের ভাবুক হইতে পারেন নাই; বরং পূর্ব্ব-সংস্কার প্রযুক্ত নব ভাবের ভাবুকদিগকে নিন্দাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গলায় 'বয়কট' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি, দিনাজ-পুরে তিনি বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ রূপে বিদেশী-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্টের প্রস্তাবাবলী

সহযোগিনী 'সঞ্জীবনী' সুরমা উপত্যকা সমিতির অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও নির্ব্বাসিতগণের সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন প্রস্তাব হইল না বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। 'বেঙ্গলী' প্রত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির ভ্রমাত্মক ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া সহযোগিনী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই অনুবাদ ভ্রম-পূর্ণ। যে স্থানে Self-Government শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল বাঙ্গালায় সে স্থানে স্বরাজ-শব্দ ছিল, স্বরাজে প্রত্যেক সভ্যজাতির অধিকার আছে, সমিতি দেশবাসী-গণকে সর্ব্ববিধ বৈধ উপায়ে স্বরাজ-লাভের চেষ্টা করিতে আহ্বান করিতেছেন, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ঔপনি-বেশিক সম্বন্ধ নাই; উপরন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন ভারতের পূর্ণ জাতীয় বিকাশের ও মহত্ত্বের উপযোগী শাসন-তন্ত্র নহে; এই বিশ্বাস-বলে সমিতি বিনা বিশেলষণে স্বরাজই আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার লক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। বয়কট প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয় নাই; কিন্তু তাহা বঙ্গ-ভঙ্গের সহিত জড়িত না করিয়া সমিতি স্বরাজ লাভ ও দেশের উন্নতির জন্য বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া সমর্থন করিয়াছেন। যে বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভের চেষ্টা সমিতির অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও প্রধান, ইহাই শ্রীহট্ট বাসীদিগের মত। বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বঙ্গভঙ্গ-প্রতিকারে

সীমাবদ্ধ হইলে তাহার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ হইবে। সমিতির গৃহীত প্রস্তাব রচনায় এই মূল নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে যে, আত্মশক্তি দ্বারা যাহা লভ্য তাহারই উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন নিবেদন বর্জ্জনীয়, এবং যে যে বিষয় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে অথচ উল্লেখ করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা বা প্রতিবাদ বর্জ্জন পূর্ব্বক মতপ্রকাশ মাত্র করাই যথেষ্ট। এই নিয়মানুসারে সমিতি নির্ব্বাসিতগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া সংক্ষেপে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সহযোগিনী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন সর্ব্ববাদী সম্মত বলিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। জাতীয় পক্ষ মধ্যপন্থীদিগের মন রাখিবার উদ্দেশ্যে সভা-সমিতিতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন না বটে, কিন্তু সেই রূপ স্বায়ত্তশাসনে তাঁহারা আদৌ আস্থাবান নহেন এবং তাহাকে স্বরাজ শব্দে অভিহিত করিতে সম্মত নহেন। অসম্পূর্ণ স্বরাজ অধীনতা-দোষে দূষিত বলিয়া স্বরাজ নামের অযোগ্য; সেইরূপ স্বায়ত্তশাসন ইংরাজ উপ-নিবেশ বাসিগণও অসন্তুষ্ট, সেই অসন্তোষ হেতু যুক্ত সাম্রাজ্য (Imperial Federation) এবং স্বতন্ত্র সৈন্য ও নৌ-সেনা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। তাঁহারা অধীন হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিতে চাহেন না, সাম্রাজ্যের সমান অধিকার-প্রাপ্ত অংশীদার হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যখন নবজাত অলব্ধ-প্রতিষ্ঠ অখ্যাতনামা শিশুজাতির এই মহতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তখন আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতি যদি অসম্পূর্ণ ও জাতীয় মহত্ত্ববিকাশের অনুপযোগী স্বায়ত্তশাসন আমাদের এই মহান্ ও ঈশ্বরপ্রেরিত অভ্যুত্থানের চরম ও পরম লক্ষ্য বলি, তবে তাহা আমাদের হীনতা ও ভগবানের সাহায্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অযোগ্যতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কি বলিব ?

জাতীয় ধনভাণ্ডার

হুগলী প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জাতীয় ধনভাণ্ডার ফেডারেশন হল নির্ম্মাণে ব্যয়িত করার প্রস্তাব অবিবাদে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যপন্থী দেশ নায়ক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জাতীয় পক্ষের নেতা শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন; বিনা বিবাদে ও উৎসাহের সহিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর সমস্ত দেশের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া অন্য মত সৃষ্টি করিবার চেষ্টা দেশহিতৈষীর কার্য্য নহে। অথচ 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় একজন পত্র-পেরক পুরাতন সংস্কারের

বশীভূত হইয়া ফণ্ডের দাতাগণকে কুপরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হুগলীতে সমবেত দেশনায়ক ও প্রতিনিধিগণ বিনা বিচারে ও ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের সাহায্যের জন্য ধন ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যথা ব্যয়িত হইলে ফণ্ডের ট্রাষ্টীগণ দেশের নিকট বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবেন। ধনভাণ্ডারের অর্থ ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ অপেক্ষা জাতীয় বিদ্যালয় বা বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের সাহায্যে ব্যয়িত করিলে তাঁহার মতে দেশের উপকার ও জাতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে। এইগুলিই মহৎ কার্য্য, ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ অতিশয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য কার্য্য, হলের অভাবে আমরা এতদিন কোন অসুবিধা বোধ করি নাই; আর কিছুদিন হল নির্ম্মিত না হইলেও চলে। প্রথম কথা, বস্ত্রবয়ন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে লেখক মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ের বা টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের কথা উত্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহাতে কি এই বুঝা যায় না যে, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা তাঁহার মতে অপরাধ নয়, কিন্তু ফণ্ড তাঁহার অনভিমত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কেবল বাধা দিবার জন্য তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন? ট্রাষ্টীগণ কাহার নিকট অপরাধী হইবেন? দেশের মত হুগলীতে প্রকাশ হইয়াছে, দেশের প্রতিনিধিগণ এই উদ্দেশ্যই উপযুক্ত উদ্দেশ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এইরূপ অর্থব্যয়ে ট্রাষ্টীগণ দেশের নিকট অপরাধী হইবেন না। দাতাদের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, দাতাগণ এই ধনভাণ্ডার নিজধন নিজ-সম্পত্তি হইয়া থাকিবে বলিয়া দিয়াছেন, না জাতীয় ধন, জাতীয় সম্পত্তি হইবে বলিয়া দিয়াছেন? যদি এই ধনভাণ্ডার জাতীয় সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে অর্থ সমস্ত বঙ্গদেশের মতানুসারে ব্যয়িত হওয়া উচিত। সমস্ত বঙ্গদেশ যখন এই উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছে, তখন দাতাগণ দেশের মতের বিরুদ্ধে মত দিয়া বাধা দিবেন কেন? অতএব এইরূপ অর্থ ব্যয়ে দাতাগণের নিকটও ট্রাষ্টী-গণ অপরাধী হইবেন না। তবে এই একটি আপত্তি করা যায় যে, হয়ত তাঁহারা আইনপাশে বদ্ধ, অন্য উদ্দেশ্যে ফণ্ড প্রয়োগ করিতে অসমর্থ, যখন জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তখন সংগৃহীত অর্থ বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, এইরূপ ঘোষণা হইয়াছিল। এখন বিবেচ্য, ইত্যাদি শব্দের অর্থ কি? বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি শিল্পকার্য্য, না বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জাতীয় কার্য্য? শেষ অর্থ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আইনের আপত্তিও কাটিয়া যায়। যদি ট্রাষ্টী-গণ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েন, তবে দাতাগণের সভা করিয়া বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণের মতে মত দেওয়া হউক, ট্রাষ্টীগণ সেই অনুমতিতে সন্দেহ-মুক্ত হইতে পারেন। জাতীয় বিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে ফণ্ড ব্যয় করার সম্বন্ধে নানা কারণে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আর বস্ত্র-বয়ন-শিল্পে ব্যয়

করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বয়ন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের অবশিষ্ট কার্য্য ব্যক্তিগত চেষ্টা বা যৌথ কারবার দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। এদিকে ফেডারেশন হল নির্ম্মাণ আর ক্ষুদ্র বা নিষ্প্রয়োজনীয় কর্ম্ম বলা যায় না। এতদিন হল নির্ম্মাণ না হওয়ায় সমস্ত জাতি সত্য-ভঙ্গ ও অকর্ম্মণ্যতারূপ কলঙ্কভাজন হইয়াছে এবং তাহার অভাবে যথেষ্ট অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গদেশের জীবনকেন্দ্র কলিকাতায় যে ধ্বনি উঠে, সমস্ত দেশময় তাঁহার প্রতিধ্বনি জাগে, তাহাতেই সমস্ত জাতি উৎসাহিত ও কর্ত্তব্যপালনে বলীয়ান হয়, আন্দোলনের আরম্ভ হইতে ইহা উপলব্ধি হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় নীরবতার ফলে দেশ নীরব ও উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হইবার স্থানের অভাব সামান্য অভাব নহে। এরূপ স্থলে সমস্ত বঙ্গদেশের অভীপ্সিত উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা উচিত ও প্রশংসনীয়।

সার ফেরোজশাহ মেহতার বয়কট অনুরাগ

এতদিন আমরা এই ধারণার বশীভূত ছিলাম যে, সার ফেরোজশাহ মেহতা চিরকালই বয়কট বিরোধী ও স্বরাজে অনাস্থাবান। এই ধারণা সার ফেরোজ-শাহের আচরণে ও কথায় সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া আসিতেছে। এতদিন পরে সার ফেরোজশাহের হৃদয়ে প্রবল বয়কট-অনুরাগ-বহ্নি জ্বলিতেছে ও স্বরাজের উপর অজস্র অকৃত্রিম-প্রেমধারা তাঁহার শিরায় শিরায় বহিতেছে এবং চিরকাল বহিয়াছে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও রোমাঞ্চিত হইলাম। এই অদ্ভুত বারতা 'বেঙ্গলী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে। লাহোরে সার ফেরোজশাহ মধ্যপন্থী মহাসভায় সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া যত ইংরাজ দৈনিক 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া,' 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান,' 'ইংলিশম্যান,' 'ডেলি ন্যুজ' সকলেই আনন্দে অধীর হইয়াছে: ইহা মেহতা মহাশয়ের কম গৌরবের কথা নহে। 'বেঙ্গলীর' আর সবই সহ্য হয়, কিন্তু 'ইংলিশ ম্যানের' আনন্দে সহযোগী বিপরীত ভাবে অধীর হইয়া সার ফেরোজশাহ বয়কট ও স্বরাজ বিরোধী নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী বলিয়াছেন, সার ফেরোজশাহ কলিকাতা অধিবেশনে বয়কট প্রস্তাব উৎসাহের ও আনন্দের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন, দাদাভাইয়ের মুখ হইতে স্বরাজ শব্দ নির্গত হইলে, তিনি আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বটে, কিন্তু পোড়া মনের দোষে দুষ্ট সন্দেহ জয় করিতে পারিলাম না। মনে পড়িতেছে, মান্দ্রাজে ও আমেদাবাদে স্বদেশী প্রস্তাবে মেহতা

মহাশয়ের তীব্র উপহাস। মনে পড়িতেছে, কলিকাতা অধিবেশনে স্বদেশী প্রস্তাবে "স্বার্থত্যাগ করিয়াও" কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করাইবার জন্য দুই-ঘণ্টা কাল ধরিয়া তিলকের উৎকট চেষ্টা, মেহতার ক্রোধ ও তিরস্কার ও গোখলে ও মালবিয়ার মধ্যস্থতা; প্রস্তাবে সেই কথার অবতারণায় মেহতার অভিমান ও মহাসভায় নীরবতা। মনে পড়িতেছে, সুরাটের সভাভঙ্গে মেহতার আনন্দ প্রকাশ। মনে পড়িতেছে, মেহতার পত্রে বঙ্গদেশের অপমান এবং মান্দ্রাজে বয়কট-বর্জ্জন। মনে পড়িতেছে, ঔপনিবেশিক স্বরাজ দূর ভবিষ্যতের স্বপ্নমাত্র বলিয়া মেহতার মত প্রকাশ। না, পোড়া মন 'বেঙ্গলীর' শুভ সংবাদে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত হইতেছে না। আমরা নম্র-ভাবে সহযোগীকে তাহার কথার অল্পমাত্র প্রমাণ দিতে অনুরোধ করিতেছি, নচেৎ এইরূপ সম্পূর্ণ অলীক ও অবিশ্বাসযোগ্য কথার প্রচারে মধ্যপন্থীদলের কি লাভ হইল, তাহা বুঝিলাম না।

কন্‌ভেন্‌সন্ সভাপতির নির্বাচন

মেহতা মহাশয় যে লাহোরে কন্‌ভেন্‌সনের সভাপতি রূপে নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহা জানা কথা ছিল। বঙ্গদেশের বাহিরে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মধ্যপন্থীগণের মধ্যে মধ্যপন্থী বলিয়া পরিগণিত নহেন, তাঁহাকে বাদ দিলে বঙ্গদেশকে বাদ দিতে হইবে বলিয়া অগত্যা তাহারা তাঁহাকে স্থান দিতেছেন। তাঁহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়াও হয়, সুরেন্দ্রনাথকে গিলিতেও পারেন না, উদ্গার করিতেও পারেন না। যাঁহাদের উদারমত, যাঁহাদের দেশের উপর প্রগাঢ় প্রেম, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতা, তেজস্বিতা ও স্বদেশ প্রেমের গুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে যাইতেছে, সাহসহীন বন্ধুগণের কুপরামর্শে সমস্ত ভারতের পূজ্য দেশনায়ক ক্ষুদ্র প্রাদেশিক দলের নেতায় পরিণত হইতেছেন। এই দিকে, সার ফেরোজশাহ মেহতা কন্‌ভেন্‌সনে অসঙ্গত আধিপত্য লাভ করিয়া এই জাল কংগ্রেস বয়কট-বর্জ্জন ও শাসনসংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ-পুরুষভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি ও জাতীয়তা হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতে বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে কন্‌ভেন্‌সনের রাজার কি? বঙ্গদেশের উপর তাঁহার অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ অতিশয় গভীর, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ কন্‌ভেন্‌সন বর্জ্জন করিলেও তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিবেন। স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের সহিত তাঁহার দলের কোনও আন্তরিক সহানুভূতি নাই, এই প্রস্তাবগুলি উঠিয়া গেলে তাঁহারা

বাঁচেন। তাঁহারা মিন্টো স্বদেশী চান, স্বার্থত্যাগযুক্ত স্বদেশী চান না। এই অবস্থায় বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ হয় আস্তে আস্তে স্বকীয় রাজনীতিক মত সকল মেহতার শ্রীচরণে বলি দিতে বাধ্য হইবেন, নাহয় কন্‌ভেন্‌সন হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। যুক্ত মহাসভা তাঁহাদের আত্মরক্ষার একই উপায়, কিন্তু মেহতার কথার বিরুদ্ধে সাহসে কথা বলিয়া যুক্ত মহাসভা স্থাপনের চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই বল কোথায়? যাহাহৌক, এই সভাপতি নির্ব্বাচনে আমাদের পথ আরো পরিষ্কার হইয়াছে। মেহতা মজলিসে আমাদের স্থান নাই, যুক্ত মহাসভার আশা আরও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, এখন নিজের পথ দেখি। বর্ষশেষের পূর্ব্বেই জাতীয় পক্ষের পরামর্শ সভা স্থাপন ও সম্মিলন প্রয়োজনীয়।

ধর্ম্ম
৭ম সংখ্যা
১৪ই আশ্বিন ১৩১৬

গীতার দোহাই

লণ্ডনে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনের পক্ষে গীতাকে আশ্রয় করিয়া একটী অদ্ভুত ও রহস্যময় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। অধিবেশনের পরিপোষকগণ সেইরূপ অধিবেশনে প্রকৃতফলের সম্ভাবনা দেখাইতে না পারিয়া দেশবাসীকে গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্ম এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সম্বন্ধে সমতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। লণ্ডন অধিবেশন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব তাহার ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান করা উচিত। রাজনীতিতে ধর্ম্মের দোহাই ও গীতার দোহাই দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম, এবং 'কর্ম্মযোগী' ও 'ধর্ম্মের' চেষ্টার ফল হইতেছে বুঝিয়া আশান্বিত হইলাম। তবে গীতার এইরূপ ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিতও হইলাম। কর্ত্তব্য পালনের উপায়-নির্ব্বাচনে অপরিণাম-দর্শিতা ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টায় উদাসীনতা শিক্ষা দেওয়া গীতার সমতাবাদ ও নিষ্কামকর্ম্মবাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা অগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক; তৎপরে ধীরভাবে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ধর্ম্মানুমোদিত পন্থা। লণ্ডন অধিবেশন আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিনা, তাহা লইয়াই বাদবিবাদ; সেই প্রশ্নের মীমাংসায় পরিণামচিন্তা বর্জ্জন করিতে পারি না। কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে দুই স্বতন্ত্র বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক, প্রথম উদ্দেশ্য,

দ্বিতীয় উপায়। মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মানুমোদিত হইলে—ধর্ম্মের আবশ্যক অঙ্গ হইলে—পরিণামচিন্তা চলে না; তাহা আমাদের স্বধর্ম্ম হয়, সেই ধর্ম্মপালনে নিধনও শ্রেয়স্কর তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মপালন পাপ। যেমন, স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা, স্বাধিকার-লাভের চেষ্টা, দেশহিত সম্পাদনের চেষ্টা জাতির প্রধান ধর্ম্ম, দেশের প্রত্যেক কর্ম্মী সন্তানের স্বধর্ম্ম, সেই স্বধর্ম্ম-পালনে প্রাণত্যাগও শ্রেয়স্কর, তথাপি স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রোচিত পরাধীনতা এবং দাস-স্বভাব-সুলভ স্বার্থপরতা আশ্রয় করা মহা-পাপ। কিন্তু উপায় কেবলই ধর্ম্মানুমোদিত হইলে চলে না, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগীও হওয়া প্রয়োজন। স্বধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধানের জন্য ধর্ম্মানুমোদিত ও উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য-সিদ্ধির চেষ্টা করিয়াও যদি সিদ্ধি লাভ না ঘটে, তাহা হইলে অসিদ্ধিতে অবিচলিত হইয়া প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সর্ব্ববিধ উপযুক্ত ও ধর্ম্মানু-মোদিত উপায়ে কর্ত্তব্যপালনের দৃঢ় চেষ্টা, ইহাই গীতোক্ত সমতা ও নিষ্কাম কর্ম্ম। নচেৎ গীতার ধর্ম্ম কর্ম্মীর ধর্ম্ম, বীরের ধর্ম্ম, আর্য্যের ধর্ম্ম না হইয়া হয় তামসিক নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক শিক্ষা, নহেত অপরিণামদর্শী মূর্খের ধর্ম্ম হইত। কর্ম্মফলে আমাদের অধিকার নাই, কর্ম্মফল ভগবানের হাতে; কর্ম্মেই আমাদের অধিকার আছে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনহংবাদী ও ফলাশক্তিহীন—কিন্তু দক্ষ ও উৎসাহী। তিনি জানেন যে তাঁহার শক্তি ভগবদ্দত্ত ও মহাশক্তি-চালিত অতএব তিনি অনহংবাদী; তিনি জানেন যে, ফল পূর্ব্ব হইতেই ভগবানের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অতএব তিনি ফলাশক্তিহীন; কিন্তু দক্ষতা, উপায়-নির্ব্বাচন-পটুতা, উৎসাহ, দৃঢ়তা, অদমনীয় উদ্যম শক্তির সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ, তাহাও তিনি জানেন, অতএব তিনি দক্ষ ও উৎসাহী হয়েন। সূক্ষ্মবিচারে গীতা-নিহিত গভীর চিন্তা ও শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। নচেৎ দুয়েকটা শ্লোকের স্বতন্ত্র ও বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে ভ্রমাত্মক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ধর্ম্মে ও কর্ম্মে অধোগতি হয়।

লণ্ডন অধিবেশন ও যুক্তমহাসভা

দেখা গেল যে, গীতোক্ত সমতাবাদের উপর লণ্ডন অধিবেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আর এক যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। তাহাতে পরিণাম-চিন্তা পরিবর্জ্জিত হয় নাই। অধিবেশনের সমর্থকগণ বলিতেছেন, আর কোনও ফল হউক বা না হউক, লণ্ডনে যুক্ত মহাসভা সংস্থাপন হইবে। লাহোরে সেই আশা করা বৃথা; লণ্ডনেই সমস্ত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা

ফলীভূত হইবে। কথাটী বিশেষ শ্রবণ-সুখোৎপাদক বটে। ইহার কোন সায় থাকিলে আমরাও লণ্ডন অধিবেশনের পক্ষপাতী হইতাম। আমরাও জানি যে লাহোরে যুক্ত মহাসভা স্থাপনের কোনও আশা নাই, কখন সেই আশা পোষণও করি নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যদি দেশেই সফল করিবার উপায় ও আশা নাই, তবে সুদূর বিদেশে সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা সফল হইবে, এই অদ্ভুত যুক্তির যাথার্থ্যতার সম্বন্ধে আমরা প্রত্যয়ান্বিত হইতে পারিলাম না। সেইরূপ সফলতার কি মূল্য বা কি স্থায়িত্ব হইতে পারে? বুঝিলাম মেহতা গোখলে কৃষ্ণস্বামী তথায় অনুপস্থিত হইলে যুক্ত মহাসভার সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। বুঝিলাম, তাঁহারা উপস্থিত হইলেও ছাত্রদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ সেইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পরে কি হইবে? দেশে ফিরিয়া তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন করিবেন? যাঁহারা স্বদেশে মেহতার ও গোখলের সম্মুখে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে অক্ষম, তাঁহারা না হয় বিদেশে যাইয়া সাহস ও চরিত্রের বল দেখাইলেন; স্বদেশে ফিরিলে তাঁহাদের সেই সাহস ও বল থাকিবে কি? যদি থাকে, তাহা হইলে দূর বিদেশে না যাইয়া যুক্ত মহাসভা দেশেই স্থাপিত হওয়া অসম্ভব কেন? মেহতা গোখলে লণ্ডন মহাসভার প্রস্তাব কখনও গ্রহণ করিবেন না। অধিবেশনে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন না, অল্প কয়জনের পরামর্শে অনেকের মত উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবাসীদিগের সংখ্যাধিক্যহেতু প্রস্তাব গৃহীত হইল; আবার কন্‌ভেন্‌সনের অধিবেশনে গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সম্মত হইব না, ইত্যাদি অনেক অজুহাত আছে। অজুহাতের কি প্রয়োজন? কন্‌ভেন্‌সন-নীতির মূলতত্ত্ব এই যে চরমপন্থীগণ রাজদ্রোহী এবং সমস্ত অশান্তি ও অনর্থের মূল; তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য, অতএব তাহাদের সংসর্গ রহিত না করিলে মহাসভা বিনষ্ট হইবে। এই মূল তত্ত্ব বিসর্জ্জন করিয়া যাঁহারা চরমপন্থীদিগকে পুনর্ব্বার মহাসভায় প্রবেশ করাইতে যাইতেছেন, তাহাদের প্রস্তাব আমরা শুনিতেও বাধ্য নহি, এই কথা কি রাসবিহারী, ফেরোজশাহ ও গোখলে বলিবেন না? সার ফেরোজশাহের মত সকলেই জানেন, রাসবিহারীবাবু সুরাটের বক্তৃতায় ও মান্দ্রাজের বক্তৃতায় এবং গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তখন কি আর এ আশা করা যায় যে, বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণ তাঁহাদের বর্জ্জন করিয়া স্বদেশে যুক্ত মহাসভা করিবেন? সেই সাহস ও দৃঢ়তা যদি থাকে, তাহা হইলে দেশে যুক্ত মহাসভার উদ্যোগ করেন না কেন? সেই দৃঢ়তা না থাকিলে লণ্ডনে যাইয়া কৌশলে বোম্বাইয়ের নেতাগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা বিফল হইবে। •

সার জর্জ্জ ক্লার্কের সারগর্ভ উক্তি

সার জর্জ্জ ক্লার্ক সম্প্রতি পুণায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অসার ও সারগর্ভ কথার আশ্চর্য্য মিশ্রণ হইয়াছে। প্রথম যুক্তি এই যে, ভারতে শিল্পবাণিজ্যের দ্রুততর উন্নতি হইলে দেশের অশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; কেন না, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতিশয় কম, মিলের সংখ্যা বাড়িলে আরও টানা-টানি পড়িবে, চাষীগণ শ্রমজীবী হওয়ায় কৃষির অবনতি হইবে। কৃষির অতি-মাত্র আধিক্যে, শিল্পবাণিজ্যের বিনাশে বৃটিশ বাণিজ্যের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। ক্লার্ক সেই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আশঙ্কিত হইয়াছেন। তাহা ইংরাজ রাজনীতিবিদের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু এই অবস্থায় ভারতবাসীর দারিদ্র্য ও অবনতি ঘটিয়াছে; কৃষি প্রাধান্যের সঙ্কোচে, বাণিজ্যের বিস্তারে শ্রমজীবীর উন্নতিতে দেশের মঙ্গল। সার জর্জ্জ আরও বলিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করা যদি বয়কটের উদ্দেশ্য হয়, জাভায় ও হিন্দুপ্রধান মোরিশ্যস্ দ্বীপের অধিবাসীর প্রস্তুত চিনির বর্জ্জনে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহাতে বৃটিশ জাতির জ্ঞানোদয় হওয়া অসম্ভব। কার্য্যতঃ এই কথায় তিনি দেশবাসীকে বিদেশী বর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এ কথা যুক্তিসঙ্গত ও সারগর্ভ। আমরাও বলি, ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক ও ভারতবাসীর সাহায্যদাতা আমেরিকার পণ্য বর্জ্জন না করিয়া বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করায় বয়কট কৃতকার্য্য হইবে; ইংরাজ জাতির জ্ঞানোদয় ও ভারতের উপর সম্মান ভাব হইবে, স্বদেশীরও বলবৃদ্ধি হইবে। স্বদেশী বস্তু থাকিলে বিদেশী কিনিব না, স্বদেশী বস্তুর অবর্ত্তমানে আমেরিকা বা অন্য দেশের পণ্য কিনিব, বর্ত্তমান অবস্থায় বৃটিশ পণ্য কিনিব না, ইহাই স্বদেশী ও বয়কটের প্রকৃত পন্থা। ক্লার্ক মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা বিশেষ দোষ বা অসু-বিধা উপলক্ষ না করিয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে গভর্ণমেন্টকে তিরস্কার করায় কোনও ফল নাই। যথার্থ কথা। আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় কি দোষ বা অসুবিধা দেখি, কিসে সন্তুষ্ট হইব, তাহা রাজপুরুষদিগকে জানান হউক, তাঁহারা যদি না শুনেন তাহা হইলেও তিরস্কার করা বৃথা, আত্মশক্তি ও বৈধ প্রতিরোধ অবলম্বনীয়। ক্লার্ক মহাশয়ের কথার এই অর্থ বুঝিলাম। আশা করি, দেশবাসী বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের এই দুই সারগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল

আমরা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের আফিস হইতে একটী সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র পাইলাম। স্থানাভাবে উহা এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এই বিষয়ে একটী মাত্র কথা বলা আবশ্যক! পত্রপ্রেরক এমন ইঙ্গিত করিয়াছেন যে আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর কর্ত্তাদের উদ্যোগের সহিত সহানুভূতির অভাবে কয়েকটী অপ্রিয় কথার অবতারণা করিয়াছিলাম। পাছে অন্য কোন পাঠকের সেই ধারণা হয়, এজন্য পত্রপ্রকাশের পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিক আমাদের সেরূপ কোন ভাব বা উদ্দেশ্য নাই। হুগলীর প্রাদেশিক সমিতির সময় মিলের দুরবস্থার কথা শুনিলাম, তাহার পর তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাহা অবগত হইলাম, তাহারই উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদপত্রপাঠে মিলের উন্নতি ও বর্দ্ধনশীল অবস্থার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গলক্ষ্মী মিল বাঙ্গালীর প্রথম চেষ্টা, তাহার উন্নতিতে বঙ্গদেশের উন্নতি।

বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন

জাতীয় পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল সম্প্রতি জাতীয় পক্ষের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণের সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। দেখিতেছি বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে বিপিন বাবুর মত কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অবস্থান্তরে সেইরূপ মত পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। বিশেষতঃ উদ্দেশ্য লইয়া যেমন অটল থাকা প্রয়োজনীয়, উপায় লইয়া অটল থাকা সর্ব্বদা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। উপায় লইয়া আমাদেরও মত কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তবে বিপিন বাবুর যুক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতভেদ হওয়া সম্ভব। তিনি বলিতেছেন, ইংরাজ জাতি দেবতা নন, তাঁহারা স্তব স্তোত্রে প্রীত হইয়া স্বর্গ হইতে স্বরাজ হাতে লইয়া অবতরণ করিবেন না, সত্য, তথাপি তাঁহারা গুণহীন বা স্বভাবতঃ অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। সম্প্রতি নিগ্রহনীতি প্রবর্ত্তিত থাকায় ভারতবর্ষে জাতীয় পক্ষের উদ্যম ও চেষ্টা অতিশয় সঙ্কট অবস্থায় পড়িয়া উত্তমরূপে চলিতেছে না, বিলাতে ভারতাগত ইংরাজের মিথ্যাসংবাদের প্রতিবাদ দ্বারা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য্য বৃটিশ জাতির নিকট জ্ঞাপন করিতে পারিলে সেই বিবেক জাগরিত হইতে পারে এবং নিগ্রহনীতিও বন্ধ হইতে পারে। অতএব বিলাতে সেইরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা স্বীকার করিলাম ইংরাজগণ দেবতাও নন, পশুও নন, তাঁহারা মানুষ, তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। কিন্তু ইংরাজ পশু ও সম্পূর্ণ গুণহীন, এ কথাও কেহ কখন বলেন নাই, এইরূপ ভুল ধারণায় জাতীয় পক্ষ বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজ মানুষ, মানুষ নিজ স্বার্থই অনলস যুক্তি

করিয়া নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিতে অভ্যস্ত। আমরা বিপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, বিলাতে সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ ইংরাজ কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন—আমাদের না নিজ জাত ভায়ের? এই কারণেই আমরা সেইরূপ চেষ্টায় আস্থাবান নই। আর একটী কথা স্মরণ করা আবশ্যক। নির্ব্বাসন ও নির্ব্বাসিতগণের সম্বন্ধে সত্য ও নির্ভুল কথা বিলাতে কটন প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভাসদগণ প্রাণপণে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে উদারনীতিক ও রক্ষণশীল অনেক সভাসদ নির্ব্বাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কি কখনও নির্ব্বাসনপ্রথা উঠাইয়া দেবেন বা রাজপুরুষগণকে নির্ব্বাসিতদের মুক্তি দিতে আদেশ করিবেন। বিপিন বাবু এখন ইংরাজদের রাজনীতিক জীবন নিকট হইতে দেখিতেছেন, কতক অভিজ্ঞতা লাভও করিয়া থাকিবেন, তিনি এ কথার উত্তর দিউন।

ধর্ম্ম
৮ম সংখ্যা
২৫শে আশ্বিন, ১৩১৬

বিলাতের দূত

যেমন ভারতে, তেমনই বিলাতে বহু রাজনীতিক সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মত ইংরাজ জাতিকে নানা দলে বিভক্ত করে এবং তাহাদের সংঘর্ষে দেশের উন্নতি ও অবনতি সংসাধিত হয়। মধ্যে মধ্যে এক এক সম্প্রদায়ের দূত-স্বরূপ কোন বিখ্যাতনামা সংবাদপত্র লেখক বা পার্লামেন্টের সভাসদ এই দেশে আগমন পূর্ব্বক লোকমত ও দেশের অবস্থা কতক অবগত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ভারতে নব-জাগরণ ও দেশব্যাপী অশান্তির গুণে অনেক ইংরাজের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, নবীন, উন্নতিশীল শ্রমজীবী দলে এইরূপ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ মিঃ কীর হার্ডি এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, আবার সেই দলের একজন প্রসিদ্ধ নেতা, মিঃ র‍্যামসী ম্যাকডনালড্ সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন। শ্রমজীবী দলের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, এক দলের নেতা মিঃ ম্যাকডনালড্, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত মডারেট। একদলের নেতা মিঃ কীর হার্ডি, তাঁহারা তত নরমপন্থী নহেন। তাহা ভিন্ন চরমপন্থী ও সোসালিষ্ট আছেন, তাঁহারা কীর হার্ডি ও ম্যাকডনালড্ প্রভৃতিকে গ্রাহ্য করেন না। মিঃ ম্যাকডনালড্ কীর হার্ডির ন্যায় বক্তৃতা ও মত প্রচার করিতে অনিচ্ছুক, তিনি সংযত-

ভাবে স্বীয় জ্ঞানলিপ্সা তৃপ্ত করিতে কৃত-সংকল্প। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে তিনি সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তিনি এক ফিরাশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, "আমি অপেক্ষাকৃত উন্নতমতাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মিঃ অরবিন্দ ঘোষের বক্তব্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইব না, মধ্যপন্থীদলভুক্ত মিঃ ব্যানার্জী ও নরমপন্থী মিঃ গোখলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা পোষণ করি। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও গীরসন প্রভৃতির ন্যায় প্রধান ব্যাঙ্কের চালকগণের সহিতও পরামর্শ করিব।" মিঃ ম্যাকডনালড্ লর্ড মরলীর শাসন-সংস্কার উদার বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভারতবাসী এইরূপ উদার সংস্কারের উপযুক্ত কিনা তাহা স্বয়ং দেখিতে চাহেন। দুই মাস বা তিনমাস ভারতে ঘুরিয়া ভারতবাসীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে মিঃ ম্যাকডনাল্ড স্বয়ং কিরূপে স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। মিঃ ম্যাকডনাল্ড বিলাতের একজন প্রধান প্রজাতন্ত্র-সমর্থক; বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতন্ত্রবাদীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ উদারনীতিকের মুখে মরলীর সংস্কারের উদারতা-প্রশংসা যখন শুনিতে হইল, দেশবাসী বুঝুন, বিলাতে আন্দোলন করায় আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ফললাভের সম্ভাবনা কত সুদূরপরাহত।

জাতীয় ঘোষণাপত্র

আমাদের রাজনীতিক কর্ত্তাদের গভীর, সূক্ষ্ম ও নানাপথগামী রাজনীতিক বুদ্ধির রহস্যময় গতি সর্ব্বদা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। ৭ই আগষ্ট কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথা লইয়া গোল হইয়াছিল। কলেজ স্কোয়ারের নামে কর্ত্তারা এত ভীত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন সভাপতি সভাপতিপদ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অগত্যা মিছিল পান্তি মাঠ হইতে বাহির হইবার ব্যবস্থা হইল। তথাপি অতি অল্প সংখ্যক লোক তথায় উপস্থিত হইলেন, অধিকাংশ লোক কলেজ স্কোয়ারের মিছিলে যোগদান করিতে গেলেন অথবা স্ব স্ব স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল করিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ৭ই আগষ্টের মিছিলের শোভা নষ্ট হয় এবং বিপক্ষগণ লোকের উৎসাহ ও বয়কটে তাহার ন্যূনতার কথা লিখিবার অবসর পান। এইবার কর্ত্তারা সেই ভীতি জয় করিয়াছেন, ৩০শে আশ্বিনের বিজ্ঞাপনে কলেজ স্কোয়ার হইতে মিছিল বাহির হইবার কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে জাতীয় ঘোষণাপত্র

পাঠের কথা বর্জ্জিত হইয়াছে। গত বৎসরের বিজ্ঞাপনে ছিল, "সভায় স্বদেশী মহাব্রত-গ্রহণ, বিদেশী-বর্জ্জন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ ও জাতীয় ঘোষণাপত্র-পাঠ হইবে।" এবার সেই কথার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, "সভায় বিদেশী-বর্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশী মহাব্রত গ্রহণ ও বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ হইবে" লেখা আছে। কর্ত্তারা "জাতীয়" কথায়, না "ঘোষণা" কথায়, না ঘোষণা পত্রের মর্মার্থে ভীত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। শ্রীযুত আনন্দমোহন বসু ফেডারেশন হলের জমিতে প্রথম এই ঘোষণা-পত্র পাঠ করিয়াছিলেনঃ—"যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বজনীন আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গভর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে দ্বিখন্ড করাই স্থির করিলেন, অতএব আমরা বাঙ্গালী জাতি ঘোষণা করিতেছি যে, এই বিভাগনীতির কুফল নিবারণ করিবার জন্য এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণকল্পে আমরা আমাদের সমগ্র-শক্তি প্রয়োগ করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে এমন কি ভীষণ রাজদ্রোহসূচক কথা সন্নিবিষ্ট আছে যে, ৩০শে আশ্বিনের ভাবসূচক ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতিজ্ঞা-প্রকাশক ঘোষণা-পত্র সহসা বর্জ্জন করিতে হইল? না মরলী ও মিন্টোর মনস্তুষ্টির জন্য এইরূপে নবোত্থিত জাতীয় ভাবকে খর্ব্ব করা আবশ্যক হইল? আমরা বঙ্গভঙ্গের কুফল নিবারণ করিব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিব, এই কথাও ঘোষণা করিতে যদি সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগষ্টের ও ৩০শে আশ্বিনের অনুষ্ঠান বন্ধ কর। এতটুকু তেজ ও সাহস যদি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় জাগরণ ও উন্নতির চেষ্টা বিফল বুঝিতে হইবে, বৃথা তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর করা মিথ্যাচার মাত্র। জনসাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, জনসাধারণ জাতীয় ঘোষণা বয়কট করিতে সম্মত হইবে না। আমরা সকলকে বলি, যদি এই ভুল সংশোধিত না হয়, ৩০শে আশ্বিনে সহস্রকণ্ঠে ঘোষণা পাঠের আদেশ কর, তাহার পরে যদি নেতাগণ সম্মত না হন, তাহা হইলে দায়িত্ব তাঁহাদের।

কৃষ্ণ মিলের মিথ্যা অপবাদ

কয়েকদিন কৃষ্ণ মিলের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা রটনা চলিতেছে যে সেই মিলের কাপড় স্বদেশী নয়, স্বদেশী মার্কা দিয়া বিদেশী কাপড় বাজারে চালান হইতেছে। আমরা মিলের কর্ত্তাদের চিনি, তাঁহারা সামান্য স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী নহেন, অতি ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান লোক। তাঁহাদের আন্তরিক স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশের জন্য নিঃস্বার্থ পরিশ্রম অতুলনীয়। তাঁহারা স্বদেশহিতার্থে সমগ্র

শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন, স্বদেশই তাহাদের একই চিন্তা, স্বদেশের জন্য খাটিয়াছেন, স্বদেশের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবসার লাভের অধিকাংশ স্বদেশ হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেছেন। এইরূপ লোকের নামে এইরূপ মিথ্যা রটনা বাঙ্গালী করিতেছেন শুনিয়া আমরা লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। একজন সংবাদপত্রে এইরূপ রটনা করায় মিলের ম্যানেজার উত্তরে অভিযোক্তাকে নিজের মনোমত যে কোনও পরীক্ষা করিতে আহবান করিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়া তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন। আশা করি যে সংবাদপত্রগুলি ভ্রম বশতঃ এই মিথ্যা রটনা পুনরুক্তি করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত কথা অবগত হইয়া তাহা প্রত্যাহার করিবেন। তাহার পরে এই আপত্তি খন্ডন হওয়ায় আর এক আপত্তি তোলা হইতেছে। কৃষ্ণ মিলের সূতো বিলাতী, বিলাতী সূতোর কাপড় বয়কট কর। জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি কখন বলিয়াছিলে যে মোটা কাপড় ভিন্ন সরু কাপড় পরিব না, বিলাতী সূতোর কাপড় ব্যবহার করিব না। তোমরা সেই কথা বল নাই, বলিয়াছিলে স্বদেশী সরু কাপড় পাওয়া যায় না, মোটা কাপড় পরিব, স্বদেশী সরু কাপড় প্রস্তুত হইলে ব্যবহার করিব। বলিয়াছিলে স্বদেশী সূতো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, বিদেশী সূতোয় প্রস্তুত তাঁতীর কাপড় বা স্বদেশী মিলের কাপড় স্বদেশী বলিয়া ব্যবহার করিব, তাঁতীরা বিদেশী সূতো ব্যবহার করিয়া তাঁত চালাইতে লাগিল, কৃষ্ণমিল ও তাতার মিল বিদেশী সূতো ব্যবহার করিয়া সরু কাপড় করিতে লাগিল, তোমরাও কিনিতে লাগিলে। কৃষ্ণ মিলের কর্ত্তাগণ বিলাতী সূতো বর্জ্জন করিয়া আমেরিকা বা জাপানের সূতো আমদানী করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেইরূপ সূতো না পাইয়া বিলাতী সূতো ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের মুখের দিকে চাহিয়া স্বদেশী চালাইয়াছেন, এখনও তাহা করিতে প্রস্তুত। যদি ইহাই স্থির করিলে যে বিলাতী সূতোর কাপড় ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আদেশ কর, তাঁহারা মোটা কাপড়ই প্রস্তুত করিবেন, কিন্তু যাঁহারা তোমাদেরই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সেই আজ্ঞাপালনের পুরস্কার স্বরূপ শাস্তি দেওয়া ও তাঁহাদের প্রস্তুত কাপড় বয়কট করা অন্যায় ও কৃতঘ্নতাসূচক। আর একটি কথা বলি, এখন কেবল স্বদেশী সূতো ব্যবহার করিয়া ভারতে বস্ত্র বয়ন করা অসম্ভব, স্বদেশীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে গেলে স্বদেশীই মারা যাইবে। এই দিকে বিলাতীর বিস্তর আমদানি আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গদেশে বিলাতী বিক্রয়ের বৃদ্ধি হইতেছে। এই সময়ে এইরূপ রব তোলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বিলাতীর বিক্রয় বন্ধ কর, স্বদেশীর কাটতি বাড়াইয়া দাও, তাহার পরে স্বদেশীর হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বিলাতী সূতো মারিবার উদ্যোগ কর।

৯ম সংখ্যা
১লা কার্ত্তিক ১৩১৬
ধর্ম্ম

জাতীয় ঘোষণাপত্র

জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ হইয়াছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ইহার মধ্যে আর কোনও কথা না উঠিলে বাদ প্রতিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণ ঘটিবার কোনও অবসর দিলেন না, সেই জন্য নেতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ক্ষান্ত হইতাম। কিন্তু বেঙ্গলী পত্রিকা আমাদের মিথ্যাবাদী বলায় আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সহযোগী প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া এই মাত্র বলিয়াছেন যে ধর্ম্মে প্রকাশিত কথা সম্পূর্ণ অমূলক, অর্থাৎ আমরা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত কথা প্রচার করিয়া মধ্যপন্থী নেতাদের উপর লোককে অসন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস করিলাম। তবে প্রকৃত ঘটনা জানিয়া বিচার করুন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গত বৎসরের বিজ্ঞাপন "জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ" হইবে এই কথা ছিল। এইবার যখন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে, তখন একজন সম্ভ্রান্ত নেতা "জাতীয় ঘোষণা পত্র" কাটিয়া দিলেন এবং এই কথা বাদ দিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিবার হুকুম হইল। এই সম্বন্ধে যে পরামর্শের সময়ে প্রতিবাদ একেবারেই হয় নাই, তাহাও নহে, কিন্তু নেতাদের কথার বিরুদ্ধে সজোরে কথা বলিবার কাহারও সাহস ছিল না। স্থির হইল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. রসুল ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বাক্ষর করিবেন। রসুল সাহেব জাতীয় ঘোষণা-পত্র বর্জ্জন হইল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি এই ভুল সংশোধন না হইলে বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত, এই অর্থে সুরেন্দ্রবাবুকে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রসুলের নামযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপান ও বিলিও হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উত্তর প্রাপ্ত হইবামাত্র ছাপান ও বিলি বন্ধ হইয়া শ্রীযুত রসুলের নামের বদলে শ্রীযুত মতিলাল ঘোষের নাম বসাইয়া সেই বিজ্ঞাপনই ছাপাইয়া বিলি করা হইল। যাহা বলিয়াছি, তাহা কেবল শোনা কথা নহে, অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, প্রত্যেক কথারই অকাট্য প্রমাণ আছে। তাহার পর, শ্রীযুত রসুল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জাতীয় ঘোষণা পত্র বর্জ্জন করিতে নেতাগণ সচেষ্ট আছেন বুঝিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর উপর নোটিশ দিলেন যে এই সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ্য সভায় আপত্তি উত্থাপন করিব এবং জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবার আদেশ যাহাতে হয়, সেই চেষ্টা করিব। উত্তরে শ্রীযুক্ত মতিলাল

ঘোষ দেওঘর হইতে এই অর্থে টেলিগ্রাম করিলেন যে যদি গভর্ণমেন্ট নিষেধ না করিয়া থাকেন, জাতীয় ঘোষণা-পত্র পাঠ করিতে সুরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাবু কোনও উত্তর করেন নাই। সভাপতি শুক্রবারে কলিকাতায় পেঁাছিলেন, রাত্রিতে পত্র পাইলেন, সেই জন্য তাঁহারও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুধবারে পত্র লেখা হইল, শুক্রবারে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ কলেজ স্কোয়ারে জাতীয় ঘোষণা পাঠ হইবে এই শুভ সংবাদ প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করিলেন, শনিবার সকালে বেঙ্গলী পত্রিকায় আমাদের কথা অমূলক বলিয়া সেই শুভ-সংবাদ পাঠকবর্গকেও জানাইলেন। এই বৃত্তান্ত। সর্ব্বসাধারণই তাহার বিচার করুন।

৩০শে আশ্বিন

৩০শে আশ্বিনের সমারম্ভ দেখিয়া এইবার দেশবাসীর আনন্দ, বিপক্ষের মনঃক্ষোভ হইবার কথা। আন্দোলন যে নির্ব্বাপিত হয় নাই, বাধা বিঘ্ন, ভয় প্রলোভন অতিক্রম করিয়া পূর্ণমাত্রায় সজীব রহিয়াছে, তাহার বাহ্যিক চিহ্ন বন্ধ কর, লুপ্ত কর, হৃদয়ে হৃদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত রহিয়াছে, স্বরাজলাভেই নির্ব্বাপিত নহে, সন্তুষ্ট হইয়া অন্য আকার ধারণ করিবে। বিজাতীয় সংবাদপত্র লোকের উৎসাহ অস্বীকার করিতে সচেষ্ট হইবেই, কিন্তু তাহাদের লেখার মধ্যে নিজেদের উৎসাহভঙ্গ লক্ষিত হয়। ষ্টেট্সম্যান্ অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীযুক্ত চৌধুরীর বক্তৃতা হইতে সান্ত্বনা রস চূষিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেন না চৌধুরী মহাশয় ছাত্রদের রাজনীতি বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু ছাত্রগণ যে পূর্ণমাত্রায় ৩০শে আশ্বিনের সমারম্ভে যোগ দিয়াছেন, সেই কথা সম্বন্ধে নীরব কেন? লোকে বলে যে গতবারেও সভায় এত ভিড় হয় নাই, সেই জনতার প্রান্তে বসিবার স্থানও ছিলনা, দাঁড়াইতে হইল। পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তায়, দেওয়ালে, ছাতেও লোক ছিল। বাঙ্গালী মাত্রই দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন, কেবল বড়বাজারে মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী দোকানদার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহাদের দোকানে কিনিবার লোক অতি অল্পই দেখিলাম, প্রায় দোকান খুলিয়া বসিয়াই আছে। লোকের উৎসাহও কম ছিল না। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষকে সভা হইতে লইয়া যাইবার সময় সেই উৎসাহের তীব্রতা ও গভীরতা প্রকাশ পাইল। যে অনবরত জয়জয়কার ও বন্দে মাতারং ধ্বনি অনেকক্ষণ ধরিয়া পৃথিবী ও আকাশ বিকম্পিত করিল, সে নেতাদের প্রাপ্য নহে, এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা আন্দোলনের চিহ্নস্বরূপ রহিয়া অগ্রভাগে জাতীয় ধ্বজা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই জন্য এই সম্মান। কাল যদি ভগ্নোৎসাহ হন বা সেই ধ্বজা ধূলায় লুটিতে দেন,

জয়জয়কারের বদলে ধিক্কার ধ্বনি উঠিবে, নেতাগণ যেন সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ করেন।

গভর্ণমেন্টের গোখলে না গোখলের গভর্ণমেন্ট

পুণার কাণ্ড ও গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দর্শনে সমস্ত ভারত অবাক হইয়া রহিয়াছে। শ্রীযুত গোপালকৃষ্ণ গোখলের বুদ্ধিতে ও চরিত্রে আমরা কখনও অন্য দেশবাসীর ন্যায় মুগ্ধ ছিলাম না। তাঁহার স্বার্থ ত্যাগের মধ্যে আমরা ব্যক্তিগত যশোলিপ্সা সম্মানপ্রিয়তা ও ঈর্ষা দেখিয়া অসন্তুষ্ট ছিলাম, তাঁহার দেশসেবার মধ্যে সাহস এবং উচ্চ আদর্শের অভাব বুঝিয়া তাঁহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে চিরকালই আশাঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু আমরাও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এতদূর অবনতি এই ভারতবাসীর সম্মাননা ও ভালবাসার পাত্রের ভাগ্যে ঘটিবে। জানিতাম, যে তাঁহার বিখ্যাত ক্ষমাপ্রার্থনার পরে গোখলে মহাশয় রাজপুরুষদের অতীব প্রিয় পাত্র ছিলেন, তিনি যখন ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের সহিত বাদ বিবাদ করিতেন, তখনও তাঁহাকে দেখিতে যেন আলালের ঘরের দুলাল, গায়ে হাত বুলাইতেন, অথবা মিষ্ট মিষ্ট গাল দিতেন। কিন্তু একদিন যে তাঁহারই খাতিরে এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র নিগ্রহ আইনে নিগৃহীত হইবে, পুণা সহর খানাতল্লাসীর ধূমধামে ব্যতিব্যস্ত হইবে, একজন সম্ভ্রান্ত উকিল পুলিশ দ্বারা ধৃত ও অভিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য নগরবাসী ধৃত হইবার ভয়ে ব্যাকুলিত হইবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। জানিতাম গোখলে গভর্ণমেন্টের, এখন জিজ্ঞাসা করিতে হইল, গভর্ণমেন্ট কি গোখলের? গোপালকৃষ্ণ গোখলে কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ও ভারতীয় শাসন-তন্ত্রের অঙ্গ হইয়াছে? আমরা জানিতাম রাজনীতিক হত্যা বা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রশংসা করিলে দেশবাসীর ছাপাখানা গভর্ণমেন্টের সম্পত্তি হয়, বোমা বা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পুলিশ পুঙ্গবদের তীব্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে পহুঁছিলে সহরময় খানাতল্লাসীর ধূমধাম আরম্ভ হয়। একটি ব্যক্তির মানহানিতে বা তাঁহার উপর ভয় প্রদর্শনে যে এইরূপ নবযুগের কাণ্ড হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না। এই নূতন প্রণালী গভর্ণমেন্টের যোগ্য কি না, তাহা রাজপুরুষগণ বিবেচনা করুন। কিন্তু গোখলে মহাশয়ের পরিণাম দেখিয়া আমরা দুঃখিত রহিলাম। কবি যথার্থই বলিয়াছেন, আমরা মানুষ, বিগত মহত্ত্বের ছায়ার বিনাশেও আমাদের চক্ষে জল আসে। গোখলে মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেন না, তবে তিনি মহতের ছায়া বটে। তাঁহার সকল মত, বুদ্ধি বিদ্যা, চরিত্র তাঁহার নিজস্ব নহে, কৈলাসবাসী রাণাডের

দান। গোখলের মধ্যে মহাত্মা রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চলিল দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

ধর্ম্ম
১০ম সংখ্যা
২২এ কার্ত্তিক, ১৩১৬

বজেট যুদ্ধ

বিলাতে বজেট লইয়া যে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে, সেই যুদ্ধ ইংরাজ রাজনীতির সামান্য বকাবকি নহে। উদারনীতিক দলে ও রক্ষাশীল দলে যে সংঘর্ষ হইত সে সামান্য মতভেদ লইয়া হইত। রেফর্মবিলের পরে জমীদারবর্গ ও মধ্যশ্রেণী ইংরাজের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ ও বিরোধ রাণী এলিসাবেথ ও রাজা চার্লসের সময় হইতে ইংরাজ রাজনীতির ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা প্রশমিত হইল। মধ্যশ্রেণীর জিত হইল কিন্তু জেতা বিজিত পক্ষকে বিনষ্ট না করিয়া লব্ধ অধিকারের ভাগ দিল। তাহার পরে ঘরাও বিবাদ চলিতেছে। এই বিবাদে মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর সাহায্যে বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে দমন করিবার আশায় আস্তে আস্তে ইংরাজ রাজনীতিক জীবনের ভিত্তি প্রশস্ত করিতেছে, তাহার ফলে ইংলণ্ড আজকাল (Limited Democracy) অসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন লয়ড জর্জ্জ ও ওয়িন্‌স্টন চার্চ্চিল এই শান্ত রাজনীতিক জীবনে মহাবিভ্রাট ও রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিতেছেন। আজকাল সমুদায় য়ুরোপে সোশালিষ্ট দলের অতিশয় বৃদ্ধি ও প্রভাব হইতেছে। জর্ম্মানীতে, ইতালীতে, বেলজিয়মে তাঁহারা মন্ত্রণাসভায় প্রবল ও বহুসংখ্যক। স্পেনে জোর-জবরদস্তিতে তাঁহাদের প্রচার ও দলবৃদ্ধি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বার্সেলোনার ভীষণ দাঙ্গা, ফেররের মৃত্যু ও সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই স্রোতের বহির্ভূত ছিল, কেন না সেই দুই দেশে প্রজার স্বাধীনতা ও সুখের কতক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে সেই দুই দেশেও সোশালিষ্টদের প্রভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। লয়েড জর্জ্জের বজেটে হঠাৎ সোশ্যালিস্‌ম বৃটিশ রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। এই বজেটে জমীদারবর্গের সম্পত্তির উপর কর বসান হইয়াছে, তাহাতে জমীদারে ও মধ্যশ্রেণীতে যে সন্ধি স্থাপন হইয়াছিল, তাহার মুখ্য অঙ্গ বিনষ্ট হইয়াছে। জমীদারদের জমীদারীর উপর একবার কর বসাইলে বৃটিশ প্রজাবর্গ অতি শীঘ্র সেই কর

বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে অল্প মূল্যে যত জমীদারী দেশের সম্পত্তি করিয়া লইবে। জমীদারবর্গ আর থাকিবে না। সেইজন্য জমীদারদের ভীষণ ক্রোধ হইয়াছে এবং জমীদার সভা (House of Lords) বজেট প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্ত্তন করিয়া Commons-এ ফিরাইয়া দিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ইহাতে বৃটিশ রাজতন্ত্রের মূল নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। নামে প্রজার প্রতিনিধিবর্গের সর্ব্ববিধ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার জমীদার সভার আছে, কিন্তু বজেট কেবল সম্মানের জন্য সেই সভায় পাঠান হয়, জমিদার সভা কখন বজেটে হস্তক্ষেপ করে না। অতএব বজেট প্রত্যাখ্যাত হইবামাত্র উদারনীতিক মন্ত্রীগণ জমিদার সভার কমনস্কৃত প্রস্তাব নিষেধ করিবার অধিকার লোপ করা হউক, এই প্রস্তাব লইয়া ইংরাজ জাতির নিকট উপস্থিত হইবেন। উদারনীতিক দলের জয় হইলে পুরাতন রাজতন্ত্র নিষেধ অধিকারের লোপে লুপ্ত হইবে, শীঘ্র সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র স্থাপন, জমীদার সভা ও জমীদারবর্গের বিনাশ এবং সোশ্যালিসমের বিস্তার হইবে। লয়ড জর্জ্জ ও চার্চ্চিল জানিয়া শুনিয়া এই রাষ্ট্রবিপ্লবের পোষকতা করিতেছেন, আস্কওয়িথ মরলী ইত্যাদি বৃদ্ধ মধ্যপন্থীগণ এই দুইজনের তেজে অভিভূত হইয়া এবং উচ্চপদের মোহে ও রাজনীতিক সংগ্রামের মত্ততায় অন্ধ হইয়া তাঁহাদের চেষ্টায় যোগদান করিতেছেন। আর Conservative England, রক্ষণশীল ইংলণ্ডের রক্ষা নাই। সর্ব্বগ্রাসী কলি ইংরাজ জাতির জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ধর্ম্ম এবং মহত্ত্বের ভিত্তি সকল গিলিয়া ফেলিতেছে।

কি হইবে ?

জানুয়ারী মাসে বিলাতে যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের পক্ষে উদারনীতিক ও সোশ্যালিষ্টদের জয় একান্ত বাঞ্ছনীয়। যদি কখনও বৈধ প্রতিরোধ দ্বারা ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে স্বায়ত্ত শাসনের বিল কমন্সে উপস্থিত করিতে বাধ্য করি, জমীদার সভা যেমন আয়রিশ স্বায়ত্ত শাসনের বিল প্রত্যাখ্যান করিল, আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের বিলও প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব জমীদার সভার নিষেধ অধিকার নষ্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র কার্য্যসিদ্ধির উপায়। ভগবান সেই উপায়ের উদ্যোগ করিতেছেন। সোশ্যালিষ্ট দলের প্রাবল্যে আমাদের আর বিশেষ কোন কার্য্যসিদ্ধির না হউক, নিগ্রহনীতি শিথিল করিবার সুবিধা হইতেও পারে, কেন না সোশ্যালিষ্ট দল এখন অধিকার-রহিত ও অধিকার লাভের প্রয়াসী, সেইজন্য জগতের অধিকার-রহিত সর্ব্ব সম্প্রদায় ও জাতির সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু এখন

যে অবস্থা তাহাতে উদারনীতিকদের জয় ও সোশ্যালিষ্টদের প্রাবল্যের আশা করা যায় না। বজেটে স্বতন্ত্র সম্পত্তির প্রথা বিনষ্ট হইবে, সোশ্যালিস্‌ম্‌ ইংলণ্ডে সংস্থাপিত হইবে, কাহারও ধনসম্পত্তি আর নিরাপদ নহে, এই রব তুলিয়া রক্ষণশীল দল অনেক উদারনীতিক ভদ্রলোককে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতেছেন। আবার টারিফ রিফর্ম্মের ধ্বয়া উঠাইয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোককেও তদ্রূপ হস্তগত করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের প্রধান স্থান বিলুপ্ত হইয়াছে, অন্য জাতি তাঁহাকে হারাইয়া দিতেছে, সেইজন্য নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মাভাবে ও খাদ্যাভাবে হাহাকার আরম্ভ হইতেছে এই মত উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করা হইয়াছে। যে সকল নির্ব্বাচন গত কয়েক মাসে হইয়া গিয়াছে, এই উপায় দ্বারা রক্ষণশীল দলের বৃদ্ধি করা হইয়াছে, উদারনীতিক ভোট কমিয়া গিয়াছে, তথাপি উদারনীতিক ও সোশ্যালিষ্ট যদি এক হয়, রক্ষণশীল দল পরাজিত হইবে। কিন্তু এখন বিপরীত অবস্থা। যেখানে উদারনীতিক দাঁড়ায়, সেইখানে সোশ্যালিষ্ট দাঁড়ান। দুইজনের সংযুক্ত ভোট যদিও রক্ষণশীল নির্ব্বাচন প্রার্থীর ভোটের অধিক, তথাপি তাহাদের বিরোধে দুর্ব্বলপক্ষের জিত হয়। সোশ্যালিষ্টগণ ঠিক পথই ধরিয়াছেন, এইরূপ অসুবিধা ভোগ না করিলে উদারনীতিক দল তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইবে কেন? কিন্তু মিঃ আস্কওয়িথের যদি নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে মিথ্যা কথা ও পরস্পর বিরোধী যুক্তি ব্যবহার করিতে করিতে বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, নির্ব্বাচনীর পূর্ব্বেই তিনি সোশ্যালিষ্টদের আশী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া আর সকল উদারনীতিক স্থানকে নিরাপদ করিবেন এবং টারিফ রিফর্ম্মের ধ্বয়া উড়াইবার জন্য পার্লামেণ্ট ভঙ্গের পূর্ব্বেই নিষেধ অধিকার লোপের বিল কমন্‌সে উপস্থিত করিয়া তাহার উপরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময়ে নির্ভর করিবেন। তাহা হইলে সমুদয় ইংরাজ নিম্নশ্রেণীর নির্ব্বাচক টারিফ রিফর্ম্মের মোহ ভুলিয়া উদারনীতিক পক্ষে ভোট দিতে ছুটিয়া আসিবে। গ্লাডষ্টোন জীবিত থাকিলে তাহাই করিতেন, আস্কওয়িথ সাহেবের নিকট সেই চৌকস বুদ্ধি প্রত্যাশা করা যায় কিনা সন্দেহ।

ধর্ম্ম,
১১ শ সংখ্যা
২৯এ কার্ত্তিক, ১৩১৬

রিফরম্‌

আজ সোমবার ১৫ই নভেম্বর—এই দিনে মহামতি লর্ড মরলী ও লর্ড মিণ্টোর গভীর ভারতহিতচিন্তায় রাজনীতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার মতের

আসক্তিফলজাত শাসনসংস্কাররূপ মানসিক গর্ভ প্রসূত হইবে। লর্ড মরলী ধন্য, লর্ড মিন্টো ধন্য, আমরা ধন্য। আজ ভারতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। আজ পারস্য, তুর্কী, চীন, জাপান পর্য্যন্ত ভারতের দিকে ঈর্ষার চোখে চাহিয়া 'ইংলিশম্যান'-এর সুরে সুর দিয়া গাহিবে "ধন্য যাহারা পরাধীন, ধন্য ধন্য যাহারা য়ুরোপীয় জাতির পরাধীন, ধন্য ধন্য ধন্য যাহারা উদার-নীতিক মরলী মিন্টোর পরাধীন। আমরাও যদি ভারতবাসী হইতাম, এই সুখে বঞ্চিত হইতাম না।" আশা করি, যত ভারতবাসী নব উন্মাদনায় উন্মত্ত না হইয়া থাকেন, এই গানের কোরস্ করিয়া আকাশ-মণ্ডল বিধ্বনিত করিবেন।

ইংলিশম্যানের ক্রোধ

আমরা অনেকদিন পূর্ব্বে সহকারী ইংলিশম্যানের সরলতার প্রশংসা করিয়াছিলাম। আবার আজ না করিয়া থাকিতে পারি না। অন্য অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দৈনিকগুলি দ্বিমুখ সর্পবিশেষ, স্বাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের পরাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের পরাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। সহযোগীর চক্ষু লজ্জা নাই, যাহা মনে আসে, তাহা কেবল মানহানির আইন চোখের সম্মুখে রাখিয়া বিনা আবরণে লেখেন, আবল-তাবল বকিতে হইলে আবল-তাবলই বকেন, যুক্তি, সত্য, সংলগ্নতার উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতে বড় ভালবাসেন। তিনি মুক্তপুরুষ ও সংবাদপত্রের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসী। ইংলিশম্যান স্বাধীনতার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠেন, যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী, তেমনই ইংলণ্ডের স্বাধীনতার বিরোধী। এক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বিরাজ করিবে এবং ইংলিশম্যান তাহার মুখপাত্র হইয়া থাকিবে, ইহাই সহযোগীর রাজনীতিক আদর্শ। যাহারা স্বাধীনতার অনুমোদক ও প্রচারক, তাহারা বধ্য বা নির্ব্বাসন ও জেলের যোগ্য। মিঃ ব্যালফুর অধিকারপ্রাপ্ত হইলেই লুই নাপোলিয়নের ন্যায় রাষ্ট্রবিপ্লব করিয়া মিঃ লয়ড জর্জ্জ ও ওয়িনষ্টন্ চার্চ্চিলকে জেলে এবং মিঃ কীরহার্ডি ও ভিকটর গ্রেসনকে কোর্ট মার্শ্যালে পাঠাবার পরামর্শ সহযোগী নিশ্চয়ই পাকে প্রকারে দিবেন। স্বাধীনতা অপেক্ষাও সাম্য কথা তাঁহার অপ্রিয়। সহযোগী বলেন, সমস্ত য়ুরোপ ও আসিয়াখণ্ডময় যে সাম্যপ্রচার ও সাম্যের আকাঙ্ক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রচারকদের রক্তে নির্ব্বাপিত না হইলে পৃথিবীর যত সিংহাসন টলিবে এবং হেয়ার ষ্ট্রীট্ লুপ্ত হইবে। অতএব ভিক্টর গ্রেসন, বৃদ্ধ মূর্খ টলষ্টয়

ও "মাণিকতলার" অরবিন্দ ঘোষ—কি অপূর্ব্ব সমাবেশ।—ইংলিশম্যান ঠিক ফেরারের ন্যায় বিনা বিচারে গুলি করিতে বলেন না, তবে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে আর কেহ নিরাপদ থাকিবে না। এত সরলতার মধ্যে এই অসরলতা কেন? ইংলিশম্যানের ভয় কি? হিন্দুপঞ্চের কপালে যাহা লেখা ছিল, ইংলিশম্যান হাজার হত্যা বা বলপ্রয়োগের পরামর্শ দিলেও তাহার ভাগ্যে ইহা ঘটিবে না। প্রজাকে হত্যা করিবার প্রবৃত্তি বন্ধ করা আইনের উদ্দেশ্য, কিন্তু রাজার মনে হত্যার প্রবৃত্তি জাগাইবার চেষ্টায় কোন শাস্তি নাই।

দেওঘরে জীবন্ত সমাধি

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, একজন হিন্দু সাধু হরিদাস সন্ন্যাসীকে অতিক্রম করিয়া সমাধি-নিমগ্ন না হইয়াও জীবন্ত কবরে কয়েকদিন রহিয়াছিলেন। আমাদের দেশে পুরাতন বিদ্যা সকল লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা এইরূপ প্রয়োগে আশ্চর্য্যান্বিত হই। পূর্ব্বপুরুষদের কথা আমরা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেই। অথচ যে বিদ্যার ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, শিক্ষায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত বিদ্যা নবজাত শিশুর অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। যেমন শিশু যত পদার্থ সম্মুখে দেখে, তাহা হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহ্যজগতের কতক জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না, সেইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রকৃতির স্থূল-পদার্থ সকল হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কতক জ্ঞান সঞ্চয় করে। কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ কি, স্থূল সূক্ষ্মের সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না এবং এই বিদ্যার অভাবে পদার্থের প্রকৃত স্বভাব অবগত হইতে পারে না। মনুষ্য সম্বন্ধে শবচ্ছেদ করিয়া ও রোগের লক্ষণ ও অবান্তর কারণ নিরীক্ষণ করিয়া যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় হয়, ততটুকু জ্ঞান পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাওয়া যায়। এই জ্ঞান অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক বলেন, আকর্ষণশক্তি জগতের সর্ব্বব্যাপী ও অলঙ্ঘ্য নিয়ম, কিন্তু মনুষ্য প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণ-শক্তি জয় করিতে পারে এবং স্থূল জগতের বাহিরে সেই নিয়মের কোন জোর নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে প্রাণ শরীরে থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসনিঃশ্বাসের ক্রিয়া অনেকক্ষণ ও অনেকদিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইতে পারে অথচ সেই রুদ্ধ-নিঃশ্বাস ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ নড়িতে পারে ও কথা বলিতে পারে, বাঁচা ত দূরের

কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বিদ্যা স্বক্ষেত্রে ও স্থূল পদার্থজ্ঞানেও কত সংকীর্ণ ও লঘু। আসল বিজ্ঞান আমাদেরই ছিল। সেই জ্ঞান স্থূল প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ না হইয়া সূক্ষ্ম প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপায় দ্বারা লুপ্ত হয়, সেই উপায় দ্বারা পুনর্লব্ধও হইতে পারে। সেই উপায় যোগ।

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী বেঙ্গলী যুক্ত মহাসভার সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ না করিলেই ভাল হইত। সহযোগী যে সর্ত্তে জাতীয়পক্ষকে আহ্বান করিতেছেন, সেইগুলি মধ্যপন্থীদের অনুকূল। গত বর্ষে জাতীয়পক্ষ কন্‌ভেন্‌সনে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এবং কলিকাতা অধিবেশনে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার আশা দেখিয়া মধ্যপন্থীদের মনোনীত সর্ত্তে সম্মত হইলেন। এইবার তাঁহারা তত সহজে সম্মত হইতে পারেন না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, পশ্চিম ভারতের মধ্যপন্থীগণের মনের ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, জাতীয়পক্ষ আর গোখলে মেহতার অধীন হইয়া মহাসভা করিতে রাজী হইবেন না। তথাপি এখনও বিবেচনা হইতেছে, অল্পদিনের মধ্যে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইবার কথা, এখন এই রূপ মত প্রকাশে বাদবিবাদ হওয়ায় মিটমাটের বিঘ্ন মাত্র হইবে।

ধর্ম্ম,
১২শ সংখ্যা,
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

হিন্দু সম্প্রদায় ও শাসন সংস্কার

আমরা যখন হিন্দু সভার কথা লিখিয়াছিলাম, তখন এই অর্থে মত-প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, যদিও গভর্ণমেণ্টের প্রাসাদান্বেষী ও স্বতন্ত্রতা অনুমোদক মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া স্বতন্ত্র রাজনীতিক চেষ্টা করা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক, তথাপি সেইরূপে চেষ্টায় দেশের অনিষ্ট ভিন্ন হিত সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। এখনও আমরা সেই মত পরিবর্ত্তন করিবার

কোন কারণ অবগত নহি। শাসনসংস্কারে বা নূতন ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের কোনও কালে আস্থা ছিল না, হিন্দু-মুসলমানকে বিনা পক্ষপাতে সেই সভায় সমান প্রবেশাধিকার দিলেও আমরা সেই কৃত্রিম সভার অনুমোদন করিতাম না। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই হাতে, এই সত্য যখন সম্পূর্ণ ভাবে এবং দৃঢ় হৃদয়ে গ্রহণ করিবার শক্তিলাভ করিব, তখন অতি শীঘ্রই প্রকৃত প্রজাতন্ত্র বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইবে। অতএব এই কৃত্রিম স্বর্ণভূষিত ক্রীড়ার পুতুল লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করা আমাদের মতে বালকোচিত মূর্খতা মাত্র। তথাপি ইহা স্বীকার করি যে, এই নূতন সংস্কারে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমান ও বহিষ্কারের চেষ্টায় হিন্দু সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মুসলমানদের সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, যে প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা কম সে প্রদেশে অল্পসংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকবর্গের নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং যে প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, সে প্রদেশে বহু-সংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বা-চকবর্গের নির্ব্বাচিত স্বতন্ত্র প্রতিনিধি দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুদের কোথাও সেই সুবিধা দেওয়া হয় নাই। যেস্থানে তাঁহারা অল্প সংখ্যক, সে স্থানে দেওয়া যায় না, দিলে সভায় তাঁহাদের প্রাবল্য হইবে। যে স্থানে তাঁহারা অল্পসংখ্যক, সেই-স্থানে দেওয়া হয় নাই, দিলে সভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ প্রাবল্য খর্ব্ব হইবে। মুসলমান নির্ব্বাচকবর্গ যে নিয়মানুসারে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব বা উদার মত লক্ষিত হয় না, অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাদ পড়িয়া গেলেন, অনেক অশিক্ষিত গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ নির্ব্বাচকবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই নূতন সৃষ্টিতে প্রজাতন্ত্রের অস্পষ্ট দূরবর্ত্তী ছায়ার ছায়া পড়িয়াছে, হিন্দুদের উপর সেই এক রতি পরিমাণেও অনুগ্রহ হয় নাই। এইরূপে ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট করিয়া রাখার কৌশল কোন জগদ্বিখ্যাত রাজনীতিবিদের কল্পনায় প্রথম উদয় হইল, তাহা জানিবার জন্য মনে কৌতূহল হইল। বর্ক ও ভলটরের ভক্তজন মরলীর না কানাডা-শাসক লর্ড মিন্টোর? না কোন গুপ্ত রত্নের?

মুসলমানদের অসন্তোষ

শাসন সংস্কারে দুইজন মুসলমান অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংলণ্ডবাসী আমীর আলী সাহেব এবং কলিকাতার ডাক্তার সুহরাওয়ার্দ্দি, কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ এক ধরণের নহে। আমীর আলী রুষ্ট, কেননা এই শাসন সংস্কারে মুসলমানদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যল্প, জর্জ্জ

সাহেবের বিশ্বগ্রাসী লোভ তাহাতে তৃপ্ত হয় না। পূর্ব্বেও বুঝিয়াছিলাম যে সারাসেন জাতির ইতিহাস লিখিবার ফলে আমীর আলী সাহেবের মনে অতি উচ্চ ও প্রশংসনীয় মহত্ত্বলোভ জন্মিয়াছে, তাঁহার মনে মধ্যযুগের মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন ঘুরিতেছে। বিদ্রূপ করিলাম কিন্তু ইহা বিদ্রূপ করিবার কথা নহে। মহৎ মন, মহতী আকাঙ্ক্ষা, বিশাল আদর্শ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অতিশয় উপকারী ও প্রশংসনীয়, তাহাতে শক্তি হয়, উদার ক্ষত্রিয় ভাব হয়, জীবনের তীব্র স্পন্দন হয়, যে অল্পাশী, সে জীবন্মৃত। কিন্তু বিদ্রূপের কথা, হাস্যকর স্বপ্ন এই যে, বৃটিশ কর্ম্মচারীবর্গের অধীনে মুসলমানদের লুপ্ত মহত্ত্ব উদ্ধার হইবে। আমীর আলী কি মনে করেন যে ইংরাজ মুসলমানকে ভারতের "দেওয়ান" করিবার মানসে এই পক্ষপাত করিতেছেন? ডাক্তার সুহরাওয়ার্দ্দির অসন্তোষের কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাহার নালিশ এই যে, বিলাত ফেরৎ অনেক শিক্ষিত মুসলমানকে নির্ব্বাচন অধিকারে বঞ্চিত করিয়া যত গভর্নমেন্টের খয়ের খাঁ অশিক্ষিত ওস্তাগর দফতরী বিবাহের রেজিষ্ট্রার খাঁ বাহাদুর খাঁ সাহেবকে নির্ব্বাচক করা হইল। তিনি কি ইহাও বুঝিতে পারেন না যে বিলাতে স্বাধীনতা-বিষ আছে, যাঁহারা বিলাত ফেরৎ, তাঁহারা হয়ত সেই বিষে অল্পাধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে মহা বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আর এইরূপ সংস্কারে শিক্ষিত লোক উপযুক্ত নির্ব্বাচক, না খয়ের খাঁ ওস্তাগর দফতরী খাঁন সাহেব খাঁ বাহাদুর বিবাহের রেজিষ্ট্রার উপযুক্ত নির্ব্বাচক? এই প্রশ্নের উত্তর ডাক্তার সাহেব বিবেচনা করিয়া দিউন, তাঁহার অসন্তোষ অজ্ঞানসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

মূল ও গৌণ

আমাদের রাজনীতিক চিন্তার প্রধান দোষ ও রাজনীতিক কর্ম্মে দৌর্ব্বল্যের কারণ এই যে আমরা মূল ও গৌণের প্রভেদ বুঝিতে অক্ষম। যাহা মূল, তাহাই ধরিতে হয়, যাহা গৌণ, তাহা মূলের অনুকূল যদি হয় মূলকে বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিব, কিন্তু গৌণকে গ্রহণ করিতে গেলে যদি মূলকে পাইবার পথে বিঘ্ন বা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে কোনও রাজনীতিবিদ গৌণকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না। আমরা কিন্তু সম্মত হই, পদে পদে মূলকে ফেলিয়া গৌণকে আগ্রহের সহিত ধরিতে যাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে গৌণকে লাভ করিলে শেষে মূল আপনিই হাতে আসিবে। বিপরীত কথাই

সত্য, মূলকে লাভ করিলে তাহার সহিত যত গৌণ সুবিধা ও অধিকার জুটিয়া আসে। রিফর্ম্মের সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মজ্জাগত ভ্রম ও বুদ্ধি-দৌর্ব্বল্য দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হউক, কিছু লাভ করিলাম, কোন সময়ে আরও লাভ করিব, শেষে অল্প অল্প অধিকার লাভ করিতে করিতে স্বর্গে পহুঁছিব, যাঁহাদের এইরূপ ভাব তাঁহারা এই কৃত্রিম ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত রাজনীতিক বটেন। শিশু ভিন্ন খেলনার কদর কে বোঝে? কিন্তু শিশুপ্রকৃতি ত্যাগ করিয়া স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতরণ করিয়া যদি একবার কঠিন ও অপ্রিয় সত্য দেখি, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী কি ভ্রান্ত ও অমূলক তাহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞ শিশুগণ আমাদের সম্মুখে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া স্বমত সমর্থন করেন। কিন্তু এই কাল মধ্যযুগও নহে, রাণী এলিজাবেথের সময়ও নহে, প্রজাতন্ত্রের চরম বিকাশের কাল বিংশ শতাব্দী, আমরাও স্বজাতির অধীন ইংরাজ প্রজা নই, শ্বেতবর্ণ পাশ্চাত্য রাজ-কর্ম্মচারীবর্গের কৃষ্ণবর্ণ আসিয়াবাসী প্রজা, অতএব এই অবস্থায় ও সেই অবস্থায় স্বর্গ-পাতালের তফাৎ। ইংলণ্ডেও গৌণকে উপেক্ষা করিয়া মূলকে আদায় করিবার সুবিধা বা যন্ত্র না থাকিলে ইংলণ্ড হয় আজও স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের অধীন দেশ হইয়া থাকিত, নহে ত রক্তপাতে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীন হইত। সেই সুবিধা বা যন্ত্র power of the purse, রাজা আমাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, আমরাও রাজার বজেট ভোট করিব না এই অভ্রান্ত ব্রহ্মাস্ত্র। আইন সংগঠন বা বজেট প্রণয়নে অধিকার প্রজার প্রতিনিধিবর্গের হাতে থাকিলে আমরাও আর রিফর্ম বয়কট করিতে বলিতাম না। তবে কি না, রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করা বিজ্ঞের কর্ম্ম নহে, গভর্ণমেণ্ট ত গভর্ণমেণ্ট, তাঁহারা যাহা দেন, তাহা গ্রহণ করিতে হয়, ইহার পরে আরও দিতে পারেন। গভর্ণমেন্ট কেন এই খেলনা ভারতের পক্বকেশ শিশুগণকে দিয়াছেন, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ? দেশময় অসন্তোষ ও অশান্তি এবং দৃঢ়ভাবে বর্জ্জন অস্ত্র প্রয়োগের ফলে তোমাদের এই লাভ হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, এই লাভে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে, কি আরও দিতে হইবে। তোমরা যদি ইহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে আর একবার সেইরূপ তীব্র আন্দোলন ও বয়কটনীতির প্রয়োগ না হইলে আর কিছুই পাইবে না, না আকাশের চাঁদ, না চাঁদের কৃত্রিম স্বর্ণমাখা প্রতিকৃতি। যদি দেখেন যে ইহাতে হইল না—প্রকৃত অধিকার দিতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত অধিকার দিবেন, অধিক না হউক, অল্প কিছু দিবেন। অতএব রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া দৃঢ়ভাবে বয়কট প্রয়োগই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। কিন্তু তোমাদের এই সব কথা বলা বৃথা, শিশুমহলে যে সন্দেশ রসগোল্লা প্রচলিত, সেইগুলিই তোমাদের মুখরোচক। আবার তোমরাই না কি ছেলেদের বল রাজনীতিতে মিশিতে নাই, তোমরা এখনও অপক্ববুদ্ধি, রাজনীতি বুঝিতে

পার না। স্বয়ং ছেলেমানুষী বুদ্ধি ত্যাগ করিলে তাহার পরে এই কথা বলা উচিত ছিল।

একটি খাঁটি কথা

আমাদের রাজনীতিকগণকে দোষ দিব কেন, এই দেশে বৃটিশ আমলে অনেকদিন প্রকৃত রাজনীতিক জীবন লুপ্ত হইয়াছে, সেই অনুভবের অভাবে আমাদের নেতারা রাজনীতিতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এত দীর্ঘকাল পরাধীন দেশের শাসনে কৃতবিদ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াও ইংরাজ রাজনীতিকগণ এই কয়েক বৎসর ধরিয়া যে বিষম ভ্রম করিয়া আসিতেছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্গভঙ্গের পরে এই রিফর্মই তাঁহাদের প্রধান ও মারাত্মক ভুল। এই রিফর্মের ফলে মধ্যপন্থীর প্রভাব দেশে বিনষ্ট হইবে, জাতীয় পক্ষের দ্বিগুণ বলবৃদ্ধি হইবে, কর্ম্মচারীবর্গের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ক্ষতি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়কে অপদস্থ ও অপমানিত করিয়া যে বিষ-বীজ বপন করা হইয়াছে তাহাতে আরও গুরুতর ক্ষতি হইল। মিঃ রামসী ম্যাকডনালড্ এম্পায়রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন, এই হিন্দু-মুসলমান ভেদ রাজনীতিক্ষেত্রে স্থাপিত করিয়া কর্ম্মচারীবর্গ নিজের অনিষ্টই করিয়াছেন। কাঁচা রাজনীতিক আন্দোলন অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ও ধর্ম্মভেদ মূলক অসন্তোষ ও আক্রমণ অতি গুরুতর ও গভর্ণমেণ্টের ভীতির কারণ। অতি খাঁটি কথা। আমরা যদি ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে গভর্ণমেণ্টের অকল্যাণই লক্ষ্য করিয়া দেশের কার্য্য করিতাম,—আমাদের শত্রুগণ সেই কথা রাতদিন প্রচার করেন—তাহা হইলে আমরা ইহাতে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্টের অকল্যাণ চাই না দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা চাই। হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষে যেমন গভর্ণমেণ্টের তেমন দেশের ভীষণ অকল্যাণ হইবে বলিয়া এই ভেদনীতির তীব্র প্রতিবাদ করি এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে মুসলমানের সংঘর্ষ ত্যাগ করিয়া রিফর্ম বয়কট করিতে বলি।

ধর্ম্ম,
১৩শ সংখ্যা,
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

রামসী ম্যাকডনালড্

আমরা রামসী ম্যাকডনালডের ভারতে আগমনের সময় এই ভাবে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি আসিয়াই বা কি করিবেন, অল্পদিনে ভারতে ফিরিয়া

বা কি জানিয়া লইবেন, এবং মরলীর শাসন-সংস্কারে যখন এত আস্থাবান তাহার নিকট আমরাও বা কি সহানুভূতি বা লাভের প্রত্যাশা করিব? তাহার পরে ম্যাকডনালডের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। তিনি ভারতে অতি অল্পদিন ঘুরিয়া আগামী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সংবাদ পাইয়া বিলাতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই অল্পদিনও প্রায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত বাস করিয়াছেন। অথচ দেখিলাম যে তিনি ভারতের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু মিঃ ম্যাকডনালড্ রাজনীতিবিদ ও সতর্ক। তিনি কীর হার্ডির মত তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা নহেন, নিজ মত অনেকটা গোপন করিয়া রাখেন, যাহা মনে ভাবেন তাহারা অল্পাংশই বাক্যে ব্যক্ত করেন। বৃটিশ রাজনীতিক জীবনে তিনি শ্রমজীবীদলের নরমপন্থী নেতা। শ্রমজীবীরা সকলেই সোস্যালিষ্ট, সকলেই এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, বর্ত্তমান সমাজ ও রাজতন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চান। কিন্তু কয়েক-জন চরমপন্থী, প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া উদারনীতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলকে পরাভূত করিয়া প্রকৃত সাম্যপূর্ণ প্রজাতন্ত্রে ব্যক্তিকে ডুবাইয়া সমষ্টিকে দেশের সর্ব্ববিধ সম্পত্তি ও আধিপত্যের অধিকারী করিতে কৃতসঙ্কল্প। মধ্যপন্থী শ্রমজীবী কীর হার্ডির দল, উদারনীতিক দলের সহিত যখন সুবিধা যোগদান করেন, যখন সুবিধা সেই দলের বিরুদ্ধাচরণ করেন, আমাদের ভূপেনবাবু ও সুরেনবাবুর ন্যায় Association cum Opposition নীতি অবলম্বন করিয়া এক হস্তে যুদ্ধ করেন, এক হস্তে আলিঙ্গন করেন। নরমপন্থীগণ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া উদারনীতিকদের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে চান। উদ্দেশ্য কিন্তু একই। মিঃ ম্যাকডনালড্ অতিশয় বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও চতুর রাজনীতিবিদ, বিলাতের ভাবী মহাযুদ্ধে তিনি বোধ হয় একজন প্রধান মহারথী হইবেন। ভারতের সহিত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, কিন্তু এই অবস্থায় ভারতের কোন হিতসাধন করা তাঁহার সাধ্যাতীত।

রিফর্ম ও মধ্যপন্থী দল

মধ্যপন্থীদল তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত শাসন সংস্কার পাইয়াছেন কিন্তু সেই লাভে হর্ষপ্রফুল্ল না হইয়া শোক-সন্তপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের ক্রন্দন ও তীব্র অভিমানের যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদের চতুরচূড়ামণি শ্বেত-শ্যামরায় মধ্যপন্থী রাধার সহিত তাঁহার স্বভাবসুলভ ধূর্ত্ততা অবলম্বন করিয়া চন্দ্রাবলীকে

কৌন্‌সিল অভিসারে ডাকিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। মধ্যপন্থীগণ বলিতেছেন, আমরাই শাসনসংস্কার করাইলাম, অথচ আমরাই সেই সংস্কারে বহিষ্কৃত হইলাম, যাঁহারা শাসন-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই গৃহীত হইয়াছেন, এ কি বিদ্রূপ, এ কি অন্যায়। এই করুণ অভিমানপূর্ণ নিবেদন চারিদিকে শুনিতেছি, তবে প্রভেদ আছে। বোম্বাইবাসিনী রাধা চির অভ্যাস রক্ষা করিয়া শ্যামের সহিত প্রেমে মাখা মধুর কলহ করিতেছেন, বঙ্গবাসিনী রাধার বিষম মান, আর শ্যামের মুখ দেখিব না, সেই কথা বলিবার সাহস নাই, শ্যামকে একেবারে চটাইতে চান না, অথচ মনে মনে সেই ভাবই রহিয়াছে। মধ্যপন্থীদের বিপ্রলব্ধ দশা দেখিয়া হাসিও পায় দয়াও হয়। কিন্তু রাধার মনে রাখা উচিত ছিল যে কেবলই কলহ কেবলই আবদার করিলে প্রেম টেকে না, মানের ভয়ে রাধার শ্রীচরণে পড়িয়া নিজ সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দেয়, শ্বেতবর্ণ শ্যামসুন্দর সেইরূপ ছেলে নহে। দুঃখের কথা, যে বেলাভিড়ীর নিবাসী শ্যামসুন্দর বেশী প্রেম দেখাইয়াছিলেন, তিনিই বেশী ধূর্ত্ততা করিয়াছেন, এখন মানভঞ্জন করিবে কে? বৃদ্ধ মরলী আবার কি নূতন বংশীরব করিয়া ইঁহাদের আহত হৃদয়কে শীতল করিবেন?

গোখলের মানহানি

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ মাননীয় গোখলে মহাশয়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন অপক্কবুদ্ধি লোক অযথা তিরস্কার ও বিদ্রূপ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় প্রজাকে উত্তেজিত করিয়াছিল, ইহা বড় দুঃখের কথা। গোখলে মহাশয় মর্ম্মাহত হইয়া বৃটিশ বিচারকদের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে তাঁহার মানহানির পন্থা বন্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান শত্রু ও নিন্দুক হিন্দু পঞ্চকে বিনাশ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে নাই, বিশ্বাস করিলেও যে কথা তুমি বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে অক্ষম, সেই কথা লিখিতে নাই। হিন্দু পঞ্চের সম্পাদক এবং পুণার উকীল শ্রীযুত ভীড়ে এই কথা বিস্মৃত হইয়া দণ্ডের পাত্র হইয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে নালিশ করিয়া লোকপ্রিয়তা আদায় করা যায় না। অপর লোকে গোখলে মহাশয়ের মানহানি করিলে তাহার উপায় আছে, তিনিও সেই উপায় অবলম্বন করিয়া জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু নিজে নিজ মানহানি করিলে তাহার কি উপায় হইতে পারে। গোখলে মহাশয় যাহা প্রশংসা করিতেন, এখন তাহার নিন্দা করিতেছেন, যাহার নিন্দা করিতেন তাহার প্রশংসা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহার উপর সহজেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। আগে কর্ম্মচারীদের প্রিয়

হইয়াও প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করা কঠিন হইলেও অসাধ্য ছিল না, কিন্তু নূতন প্রলয়ের পরে সেই জলস্থলবাসী জানোয়ার বিলুপ্ত হইয়াছে।

নূতন কৌন্সিলর

যখন বনের বড় বড় বৃক্ষ সকল কাটে, তখন সহস্র অলক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-পালা চক্ষু আকর্ষণ করে। আগে ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দ্বারভাঙ্গা, রাসবিহারী ইত্যাদি বড় বড় রাজনীতিক নেতা, বিখ্যাত জমিদার ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতেন, নূতন সংস্কারের প্রভাবে এইরূপ লোককে সরাইয়া সাগরের উপরে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উঠিয়া সহর্ষে নবসূর্য্য কিরণে লম্ফ করিতেছে। প্রতিদিন নূতন নূতন নির্ব্বাচন প্রার্থির নাম পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। এতগুলি অজানা মহার্ঘ্য রত্ন এতদিন অন্ধকারে লুকাইয়া ছিল? আমরা লর্ড মরলীকে ধন্যবাদ দিই, দেশ এত ধনী ছিল, নিজের ঐশ্বর্য্য বুঝিতে পারে নাই, মরলীর প্রভাবে রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে—সকল রত্ন সূর্য্যকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে।

ধৰ্ম্ম,
১৪ শ সংখ্যা,
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ট্রান্সভালে ভারতবাসী

ট্রান্সভালবাসী ভারতসন্তান যে দৃঢ়তা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ও দেখাইতেছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। প্রাচীন আর্য্য শিক্ষা ও আর্য্য-চরিত্র এই দূর দেশে এই নিঃসহায় পদদলিত কুলীমজুর দোকানদারের প্রাণে যেমন তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতে বঙ্গদেশেও সেই ভাবে, সেই পরিমাণে এখনও জাগে নাই। বঙ্গদেশে আমরা বৈধ প্রতিরোধ মুখে সমর্থন করিয়াছি মাত্র, ট্রান্সভালে তাঁহারা কার্য্যে সেই প্রতিরোধের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। অথচ ভারতে যে সকল সুবিধা ও সহজ ফলসিদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, ট্রান্সভালে তাহার লেশ মাত্র নাই। এক একবার মনে হয়, ইহা বৃথা চেষ্টা, কোন্ আশায় ইঁহারা এত যাতনা, এত ধননাশ, এত অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিতেছেন? ভারতে আমরা ত্রিশ-কোটী ভারত সন্তান,

রাজপুরুষগণ ও তাহাদের স্বজাতীয় সহায় মুষ্টিমেয় লোক, এই ত্রিশ-কোটী লোক দশদিন বৈধ প্রতিরোধ করিলে বিনা রক্তপাতে সেচ্ছাচারতন্ত্র আপনি বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে, এক কোটী লোকও সেই পথ দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিলে এক বৎসরের মধ্যে শান্ত অনিন্দ্য আইন-সঙ্গত উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফল সুসম্পন্ন হইবে। ট্রান্সভালে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী দেশের লোকের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, কোনও বল নাই, কোনও leverage নাই, তাঁহারা সকলে জেলে পচিলে দেশচ্যুত হইলে, নির্ম্মূল হইলে গরীব ট্রান্সভালবাসীর অল্পদিন আর্থিক ক্ষতি ও কষ্ট হইবে বটে কিন্তু সেই দেশের সেই গভর্ণমেণ্টের কোন গুরুতর বা স্থায়ী অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাঁহাদের শত্রুগণ এই পরিণামই চান। আর্খিমীদীস বলিতেন, উত্তোলন যন্ত্র রাখিবার স্থান যদি পাই, পৃথিবী শূন্যে উত্তোলন করিতে পারি। ইঁহাদের উত্তোলন-যন্ত্রও নাই, রাখিবার স্থানও নাই, অথচ পৃথিবী শূন্যে উত্তোলন করিতে উদ্যত। তথাপি তাঁহাদের পরিশ্রম কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন, আমরা ভারতবাসী, আমরা আধ্যাত্মিক বলে আস্থাবান, আধ্যাত্মিক বলে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিব। ভারতবাসী ভিন্ন এই জ্ঞান, এই শ্রদ্ধা, এই নিষ্ঠা কোন্ জাতির আছে বা থাকিতে পারে ? ইহাই ভারতের মহত্ত্ব যে এই নিষ্ঠার বলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্র সহস্র সংসারী সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া সরল প্রাণে দৃঢ় সাহসে এইরূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। হয় ত যে ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন সেই ফল হস্তগত হইবে না, কিন্তু এই মহৎ চেষ্টার মহৎ পরিণাম হইবে, ইহাতে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হইবে, তাহার লেশমাত্র সন্দেহ নাই।

টাউন হলের সভা

মিঃ পোলক ট্রান্সভালবাসী ভারত সন্তানদের প্রতিনিধিরূপে এই দেশে আসিয়া ভারতবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন। আমাদের সহানুভূতির অভাব নাই, ক্ষমতার অভাবে আমরা নিরুপায় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি। আমাদের তিনটি পন্থা আছে। গভর্ণমেন্টের নিকট নিবেদন করিতে পারি, ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, গভর্ণমেন্টও ট্রান্সভাল গভর্ণমেন্টের এইরূপ বর্ব্বরোচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণ আমাদের অপেক্ষাও নিরুপায়। যে বিষয়ে ভারতের হিত ইংলণ্ডের হিতের বিরোধী, সেই বিষয়ে ভারতীয় রাজপুরুষগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের হিতসাধনে

অক্ষম। ভারতবাসীর ঔপনিবেশিক গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করা ইংলণ্ডের অহিতের, ঔপনিবেশিকগণের ক্রোধ বিফল মনের ভাব নহে, সেই ক্রোধ কার্য্যকর। ভারতবাসীর হিতে আঘাত পড়িলে পরাধীন ভারতবাসী কাঁদিবে, আর কি করিবে? আমরা নাটালে কুলী পাঠাইবার পথ বন্ধ করিতে বলিতেছি, ইহাতে নাটালবাসী যদি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, আমাদের গভর্ণমেন্ট কখনও এই উপায় অবলম্বন করিতে সাহসী হইবে না। দ্বিতীয় পন্থা, ট্রান্সভালের ভারতবাসীদিগকে অধিক সাহায্যে পুষ্ট করা, বিশেষতঃ তাঁহাদের বালকদের শিক্ষাদানে এইরূপ সাহায্য করিলে তাঁহাদের এক গুরুতর অসুবিধা দূরীভূত হইবে। এইরূপ সাহায্য দেওয়া সহজ নহে। ভারতেরও অর্থের অশেষ প্রয়োজন, অর্থের অভাবে কোন চেষ্টা ফলবতী হয় না। তবে এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের সহানুভূতি আছে, গোখলেও দূরবর্ত্তী বৈধ প্রতিরোধের প্রশংসা করিয়াছেন, ভারতের রাজদ্রোহভয়ক্লিষ্ট ধনী সন্তান কেন এই নির্দ্দোষ যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হন? তৃতীয় পন্থা, সমস্ত ভারতময় প্রতিবাদের সভা করিয়া গ্রামে গ্রামে ট্রান্সভালবাসী ভারত-সন্তানদের অপমান, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, দৃঢ়তা, স্বার্থত্যাগ জানাইয়া ভারতের সেই আধ্যাত্মিক বল জাগান। কিন্তু সেই কার্য্যের উপযোগী ব্যবস্থা ও কর্ম্ম-শৃঙ্খলা কোথায়। যে দিন বঙ্গদেশ বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের একতা ও বলবৃদ্ধি করিতে শিখিবে, সেইদিন সেই ব্যবস্থা ও কর্ম্মশৃঙ্খলা হইতে পারে, আমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের লোকও সেই পথে ধাবিত হইবে। সেই পর্য্যন্ত এই নিজ্জীব ও অকর্ম্মণ্য অবস্থা থাকিবে।

নির্ব্বাসিত বঙ্গসন্তান

এক বৎসর গতপ্রায়, নির্ব্বাসিত বঙ্গসন্তান এখনও নির্ব্বাসনে, কারাগারে। গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহপ্রত্যাশীগণ এক বর্ষাকাল কেবলই বলিতেছেন, এই হইল, কারামুক্তি হইল, মরলী একপ্রকার সম্মত হইলেন, কাল হইবে, অমুক অবসরে হইবে, রাজার জন্মদিনে হইবে, রিফরম্ প্রচার হইলেই হইবে, প্রতিবাদ সভা কর না, গোল কর না, গোল করিলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে। অথচ সেইদিন ম্যাকডনাল্ড সাহেবের মুখে শুনিলাম ভারতবাসীর নিশ্চেষ্টতায় পার্লামেন্টে কটন প্রভৃতির আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, কেন না বিলাতের লোক বলিতেছে, কই ইঁহারা গোল করিতেছেন, ভারতে সাড়া শব্দ নাই, তাহাতে বোঝা গেল নির্ব্বাসনে ভারতবাসী সন্তুষ্ট, নির্ব্বাসিতদের কয়েকজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিই আপত্তি করিতেছেন, নির্ব্বাসনে

লোকমত ক্ষুব্ধ নহে। বিলাতের প্রজার পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সমস্ত দেশ নির্ব্বাসনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ রহিয়াছে, অথচ সকলে নীরব শান্তভাবে গভর্ণমেন্টের নিগ্রহনীতি শিরোধার্য্য করিলেন, ইহা বৃটীশ জাতির ন্যায় তেজস্বী ও রাজনীতি-কুশল জাতির বোধগম্য নহে। তাহার উপর মান্দ্রাজ কংগ্রেস নামে অভিহিত রাজপুরুষ-ভক্তদের মজলিসে বড় বড় নেতাগণ মরলী-মিন্টোর স্তব-স্তোত্র করিয়া বয়কট বর্জ্জন পূর্ব্বক গান করিয়াছেন, "আহা, আজ ভারতের কি সুখের সময়।" বঙ্গদেশের সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর আদরের গোখলে পুণায় গভর্ণমেন্টের "কঠোর ও নির্দ্দয় নিগ্রহ নীতির" আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ভারতবাসীর নেতা ও প্রতিনিধিরূপে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ রাজনীতিতে কোনকালে কোনও দেশে কোনও রাজনীতিক সুফল লব্ধ হয় নাই, হইবেও না।

যুক্ত মহাসভা

সহযোগী বেঙ্গলী সেইদিন আবার অসময়ে যুক্ত মহাসভার কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, যিনি ক্রীডে সহি করিবেন না বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বায়ত্ত-শাসনে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বাধীনতাকেই আদর্শ করেন, তাঁহার "কংগ্রেসে" প্রবেশ অধিকার নাই, তিনি মেহতা গোখলে মজলিসের উপযুক্ত নহেন। এই প্রবন্ধ লইয়া অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত সহযোগীর বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছে, বেঙ্গলী বলিয়াছেন, এখন বাদ-বিবাদ করা অনুচিত, মিলনের যে অল্প সম্ভাবনা আছে, তাহা নষ্ট হইতে পারে। উত্তম কথা। আমরা পূর্ব্বেই বেঙ্গলীকে সেই বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিলাম এবং মৌনাবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। আশা করি যতদিন এই বিষয়ের মীমাংসা না হয়, সহযোগী আবার বাক্‌সংযম করিবেন। কিন্তু যখন বেঙ্গলী এইরূপ স্বাধীনতা আদর্শ বর্জ্জন করিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তরে বলিতে বাধ্য যে, আমরা সত্য ও উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া মেহতা মজলিসে প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নহি, আমরা উপযুক্ত মহাসভা চাই, মেহতা মজলিস চাই না। স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভারত সন্তানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে সেই মজলিসের দ্বার রুদ্ধ তাহা জানি। কনষ্টিটিউশনরূপ অর্গল ও ক্রীড নামক তালা দিয়া সযত্নে বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা জানি। যখন ভারতের অধিকাংশ ধনী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা আদর্শ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে ভীত হন, তখন আমারও মহাসভার সেই বিষয়ে জেদ

করিতে রাজী নহি, কলিকাতায়ও জেদ করি নাই, সুরাটেও করি নাই। যতদিন সকলে একমত না হই, ততদিন স্বায়ত্ত্বশাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী আছি। কিন্তু আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ভাবে মত দিতে সত্য-ভ্রষ্ট হইতে, মিথ্যা আদর্শ প্রচার করিতে আদেশ করিবার তোমাদের কোনও অধিকার নাই। স্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ, তাহা বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হউক বা বহির্ভূত হউক, কিন্তু আইন সঙ্গত উপায়ে সেই আদর্শসিদ্ধি বাঞ্ছনীয়। যদি মেহতা-মজলিস মহাসভায় পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে সেই রুদ্ধ দ্বারের তালা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। কনষ্টিটিউসন ও দ্বারের অর্গল না হইয়া কর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ অন্য প্রতিষ্ঠার উপর মহাসভা সংগঠন করা উচিত। অবশ্যই ইহা আমাদেরই মত, যে কমিটী হুগলীতে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরামর্শের পরিণাম অবগত নহি, শেষ ফলের অপেক্ষায় রহিয়াছি।

রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে বঙ্গদেশের একজন উদ্যমশীল, বুদ্ধিমান ও কৃতী সন্তান কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন। রমেশ-চন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতিতে, রাজ্যশাসনে, বিদ্যাচর্চ্চায়, সাহিত্যে তিনি যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি পুস্তকদ্বারা ভারতবাসীর মন বয়কটগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, যদি রমেশচন্দ্রের আর সকল কর্ম্ম, পুস্তক ইত্যাদি বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হয়, এই একমাত্র অতি মহৎ কার্য্যে তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। কাহারও মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতে সম্মত নহি, কারণ আমরা মৃত্যুকে মানি না, মৃত্যু মায়া, মৃত্যু ভ্রম। রমেশচন্দ্র মৃত নহেন, এই শরীর ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন মাত্র এবং সেই স্থান হইতেও তাঁহার পরলোকগত আত্মা প্রিয় স্বদেশের অভ্যুত্থানের সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ নহে।

বুদ্ধ গয়া

গত ৩রা ডিসেম্বর প্রত্যুষে, পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সদলে মটরকারে করিয়া, বোধ গয়াস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন।

ঐ প্রাচীন মন্দিরটি গয়া হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ প্রাচীন স্থপতিবিদ্যার কৌতূহলোদ্দীপক আদর্শখানি হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের ঘোরতর মনোমালিন্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। মোহন্ত ছোটলাট বাহাদুরকে বাড়ীটির সর্ব্বত্র ঘুরিয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় দেখাইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস এই যে, যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ সর্ব্ব-প্রথমে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মন্দিরটি ঠিক সেই স্থানের উপরে অবস্থিত। যে বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি তাঁহার নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়, সেটি এখন বর্ত্তমান নাই। মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধদেবের একটি প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। এখানে প্রাচীন অশোক রেলিংএর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার অনেকখানি আজিও দাঁড়াইয়া আছে। ইহা নিঃসন্দেহে অশোকের সমকালীন এবং অন্যূন দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন। রেলিংএর অনেকগুলি প্রস্তরখণ্ড পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীগুলির দেওয়াল চাপা পড়িয়াছিল। সেগুলি যথাস্থানে আবার বসান হইয়াছে। শিবসহস্রাধিক বর্ষকাল ধরিয়া এই মন্দিরটি সমগ্র প্রাচ্যভূখণ্ডের বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম,
১৫ শ সংখ্যা,
২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬

ফেরোজশাহের চাল

কুচক্রীর চক্র বোঝা দায়। ফেরোজশাহ মেহতা কুচক্রীর শিরোমণি, যখন জোরে পারেন না, হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত চাল চালিয়া অভীষ্টসিদ্ধি আদায় করা তাঁহার অভ্যাস। কিন্তু লাহোর কন্‌ভেন্সনের পনের দিন পূর্ব্বে যে অপূর্ব্ব চাল চালিয়াছেন, তাহাতে কাহার কি লাভ হইবে, তাহা বলা কঠিন। লোকে অনেক অনুমান করিতেছে, কেহ কেহ বলে, ফেরোজশাহ বঙ্গদেশের ও পঞ্জাবের অসন্তোষে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছেন। স্বীকার করি, বোম্বাইয়ের এই একমাত্র সিংহ কলিকাতায় লোকমতের ভয়ে পেটে ল্যাজ গুটাইয়া রাখিয়াছিলেন, পাছে কেহ মাড়ায়,—কিন্তু লাহোর কন্‌ভেন্‌সন সিংহ মহাশয়ের নিজের গর্ত্ত, সেইখানে কোনও ভক্তিহীন জন্তুর প্রবেশ কঠিন আইনে নিষিদ্ধ। তাহার উপর অভ্যর্থনা সমিতি নিয়ম করিয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবক বল, দর্শক বল, কেহ

পাণ্ডালে উচ্চ শব্দ করিতে পারিবে না, না hiss না বন্দেমাতরং ধ্বনি, না 'shame, shame' না জয়জয়কার! যে করিবে, তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া সভা হইতে বাহির করা হইবে। সিংহ কিসেতে ভীত? ল্যাজ মাড়ান দূরের কথা, প্রভুর কাণে কোন বিরক্তিসূচক শব্দও পৌঁছিতে পারে না, চারিদিক নিরাপদ। আবার কেহ কেহ বলে, সার ফেরোজশাহ ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য হইতে আহূত হইয়াছেন, তাঁহার রাজভক্তির চরম বিকাশের চরম পুরস্কার হাতে পড়িতেছে, সেইহেতু আর কনভেনসনের সভাপতি হইতে তিনি অক্ষম। কিন্তু পনের দিন বিলম্ব মাত্র, সার ফেরোজশাহ কি এত নিষ্ঠুর পিতা, যে তাঁহার আদরের কন্যার শেষ রক্ষা করিয়া স্বর্গে যাইতে অসম্মত হইবেন, গভর্নমেন্টও কি কনভেনসনের মূল্য বোঝেন না? এই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য ফেরোজশাহকে পনের দিনের ছুটী দিবেন না? আমরাও একটি অনুমান করিয়া বসিয়াছি। শাসন সংস্কারে সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে, সেই কথা ফেরোজশাহের অজ্ঞাত নহে অথচ শাসন সংস্কার ও গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহের লোভ দেখাইয়াই তিনি সুরাটে মহাসভা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন। তাহার পরে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে এত রূঢ়ভাবে অবমাননা করিয়াছেন যে, তাঁহারা লাহোরে গিয়া আবার অপমানিত হইতে অনিচ্ছুক। ফেরোজশাহ স্বয়ং বলেন যে, গুরুতর রাজনীতিক কারণে তিনি সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাই কি সেই রাজনীতিক কারণ নহে? পদত্যাগের ফলে যদি সুরেন বাবুরা কনভেনসনে যোগ দিতে রাজী হন, শাসনসংস্কার গ্রহণের দোষ মেহতার ভাগে না পড়িয়া সমস্ত মধ্যপন্থীদলে সমভাবে বিভক্ত হয়, এই আশা। বঙ্গদেশের মধ্যপন্থীগণের অনুপস্থিতিতে মেহতার সভাপতিত্বে অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি দ্বারা শাসনসংস্কার যদি গৃহীত হয়, সংস্কারের দশা ও কনভেনসনের দশাও অতি শোচনীয় হইবে। ফেরোজশাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণকে লাহোরে হাজির করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজের কার্য্য হাসিল করিবেন, স্বয়ং বঙ্গদেশীয় শিখণ্ডীর পশ্চাৎ গুপ্তভাবে যুদ্ধ করিবেন। নচেৎ কুচক্রীর শিরোমণি উদ্দেশ্যহীন চাল চালিবেন কেন?

পূৰ্ব্ববঙ্গে নিৰ্ব্বাচন

পূর্ব্ববঙ্গ প্রথম হইতে যে তেজ, সত্যপ্রিয়তা ও রাজনীতিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখাইয়া আসিতেছে, শাসনসংস্কারের পরীক্ষায় বোঝা গেল সেই সকল গুণ নিগ্রহে ও প্রলোভনে নিস্তেজ হয় নাই, যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে।

ফরিদপুরে একজন হিন্দুও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হন নাই, ঢাকায় একজন মাত্র মরলীর মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন, ময়মনসিংহে যে চারিজন এই রাজভোগের আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজন আবার চৈতন্য লাভ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, আর দুইজন, আশা করি, শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করিবেন। অতি আশ্চর্য্যের কথা, শুনিতেছি অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সংস্কার-মদে মাতাল হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া মরলীর মনের মত নৃত্য করিতেছে। এই দুর্ব্বুদ্ধি কেন? নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমারের এই অপমান কেন? বরিশালের দেবতা বৃটীশ কারাগারে নিবদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত অথচ বিনা কারণে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়ের সেবা-শুশ্রূষায় বঞ্চিত, তাঁহার বরিশাল তাঁহাকে ভুলিয়া রাজপুরুষদের প্রেমের বাজারে নিজেকে বিক্রী করিতে ছুটিল। ছি! শীঘ্র এই দুর্ম্মতি ত্যাগ কর, পাছে বঙ্গদেশ বরিশালকে উপহাস করিয়া বলে, বৃথা অশ্বিনীকুমার সমস্ত জীবন বরিশালবাসীকে মনুষ্যত্ব কি তাহা শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে দেখাইতে খাটিয়াছেন বৃথা শেষে স্বয়ং দেশের হিতার্থে বলি হইয়া পড়িয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ কখন মাঝামাঝি ধরণের ভাবপোষণ করে না, যে পথে যায় ছুটিয়া যায়, যে ভাব অবলম্বন করে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত দেখায়। পশ্চিমবঙ্গে যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজস্বী পুরুষসিংহ আছেন, তেমনি নির্লজ্জ ধামাধরার পালও আছে। যাহারা কোমর বাঁধিয়া নির্ব্বাচন দৌড়ে প্রথম স্থান পাইতে লালায়িত, তাহারা প্রায়ই দেশের অজ্ঞাত অপূজ্য স্বার্থান্বেষী ধামাধরার পাল। তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় ভীড় করিলে দেশের লাভও নাই, ক্ষতিও নাই,— সভা অযোগ্য তোষামদকারীর চিড়িয়াখানা বিশেষে পরিণত হইবে, আর কোন কুফল হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুয়েকজন দেশপূজ্য লোকের নাম দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কি এত অল্প আদর যে শেষে এই ভীড়ের মধ্যে কৌন্সিলে ঢুকিবার জন্যে ঠেলাঠেলি করিতে হইল? বৃদ্ধবয়সে বৈকুণ্ঠ বাবুর এই অপমানপ্রিয়তা কেন? চিড়িয়াখানায় প্রবেশ কি এত লোভনীয়?

মরলীনীতির ফল

মোটের উপর মরলীনীতির ফল দেশের উপকারী বলিতে হইল। ভারতের প্রধান বন্ধু ও হিতকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়া সুপ্ত জাতিকে

জাগাইয়াছিলেন, নিবিড় মোহ দূর করিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, মোহের পুনর্বিস্তার, নিদ্রার নবপ্রভাবের আশঙ্কা আমাদের হিতৈষী লর্ড মরলী শাসন সংস্কার করিয়া অপনোদন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর বঙ্গভঙ্গের আঘাত পড়ে নাই, তাঁহারাও এই প্রহারে মর্ম্মাহত হইয়া জাগিতেছেন, সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায় পরমুখাপেক্ষায় অসারতা বুঝিয়া জাতীয়তার ধ্বজার তলে অচিরে সমবেত হইবে। রাজপুরুষদের সঙ্গে জমীদার ও মুসলমান রহিয়াছেন। দেখি তাঁহারাও কদিন টিকিতে পারিবেন। ভগবানকে প্রার্থনা করি, আমাদের তৃতীয় কোন হিতৈষী ইংরাজের মনে কোন নূতন যুক্তি ঢুকাইয়া দাও যাহার সুফলে জমীদার ও মুসলমানদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় হইবে। জাতীয় পক্ষের আস্থা বৃথা কল্পনা নহে। যখন ভগবান সুপ্রসন্ন, বিপক্ষের চেষ্টায় বিপরীত ফল হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সাহায্য করে।

মিণ্টোর উপদেশ

এই পরীক্ষাস্থলে ছোট বড় অনেক ইংরাজ ভারতবাসীকে সংস্কার বিষয়ক সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের অতি লোকপ্রিয় সদাশয় বড়লাটও নিজ পূজনীয় মুখবিবর হইতে উপদেশ-সুধা ঢালিয়া আমাদের কর্ণতৃপ্তি করিয়াছেন। সকলের একই কথা—আহা এমন সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তোমরা এইরূপে তাহার অপরূপ রূপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খুঁত বাহির না করিয়া cooperation সুধায় আমাদের সোনারচাঁদকে হৃষ্টপুষ্ট কর, দোষগুলি আপনিই যাইবে। শিশুর বাপ মা যে এইরূপ প্রশংসা করিবে, দোষ ঢাকিয়া দিবে তাহা স্বাভাবিক ও মার্জ্জনীয়। কিন্তু সত্য কথা এই, ছেলেটীর এক বা দুই বা তিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলে ক্ষতি হইত না, কিন্তু তাহার সমস্ত শরীর পচা, হৃৎরোগ, যকৃতের রোগ, ক্ষয়রোগ লইয়া জাত, এই সোনারচাঁদ বাঁচিবার নহে, বাঁচিবার যোগ্যও নহে, বৃথা বাঁচাইয়া কষ্ট দেওয়া অপেক্ষা বয়কট বালিসে শ্বাসরোধ করিয়া যন্ত্রণামুক্ত করা দয়াবানের কার্য্য। তাহাতে যদি শিশুহত্যা ও নৃশংসতা দোষে অপরাধী হই, না হয় নরকভোগ করিব। আমাদের কিন্তু এক কৌতূহলের কারণ রহিল, সোনারচাঁদের বাপ মিন্টোর উক্তি শুনিলাম,—মাননীয় মিঃ গোখলে যিনি সোনারচাঁদের মাতৃস্বরূপ, তিনি কেন নীরবে সন্তানের নিন্দা সহ্য করিতেছেন? না আমাদের গোপালকৃষ্ণ হিন্দু পণ্ড ধ্বংস করিয়া বিজয়ানন্দের অতিরেকে সমাধিস্থ হইয়াছেন? বোধ হয় সূতিকা অশৌচ কয়েকদিন রক্ষা করিতেছেন, সময়ে আবার সভ্যসমাজে মুখ দেখাইতে আসিবেন।

লাহোর কন্‌ভেন্‌সন

লাহোর কন্‌ভেন্‌সনের অদৃষ্ট নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশ অপ্রসন্ন, পাঞ্জাব অসন্তুষ্ট, দেশের অধিকাংশ লোক হয় বহিষ্কৃত, নহে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক, ফেরোজশাহ-প্রসূত, হরকিসনলাল-পালিত, গভর্ণমেন্ট লালিত কনভেনসন অতি কষ্টে নিজ প্রাণরক্ষা করিতেছিল। শেষে এই কি বজ্রাঘাত! যে প্রিয় পিতার প্রেমে বঙ্গদেশের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল, সেই পিতা ও ইষ্টদেবতা ফেরোজশাহ বিমুখ হইয়া সকল প্রার্থনা ঠেলিয়া নিজ গুপ্ত বিচারের অভেদ্য তিমিরে ইন্দ্রজিতের ন্যায় অতর্ক্য মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বাইয়ের সাঝ বর্ত্তমানের টেলিগ্রামের উত্তরে হরকিসন লাল দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে, ফেরোজশাহ তাঁহার পদত্যাগের কারণ জানাইতে অসম্মত। অগত্যা ভক্ত তাঁহার রহস্যময় অনির্দ্দেশ্য অতর্ক্য দেবতার মুখের দিকে করুণ শূন্যদৃষ্টিতে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। নূতন সভাপতিকে অল ইণ্ডিয়া "কংগ্রেস" কমিটি ভিন্ন কে নির্ব্বাচন করিবে? সেই কমিটির সভাস্থল ফেরোজশাহের শোবার ঘর। অতএব কমিটির অধিবেশনে প্রভুর ইচ্ছা ব্যক্ত হইতেও পারে। কাহার শিরে ফেরোজশাহের স্পর্শে পুণ্যময় পরিত্যক্ত মালা সেই পবিত্র করকমল হইতে নিক্ষিপ্ত হইবে? ওয়াচার না মালবিয়ার, না গোখলের? আমাদের সুরেন্দ্র-নাথের নামও করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফেরোজশাহের উচ্ছিষ্ট সভাপতিত্ব তাঁহার কৃপার দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বঙ্গবাসীর অপ্রীতিভাজন হইবেন, সেই আশা পোষণ করা অন্যায়। গোখলে ফেরোজশাহের দ্বিতীয় আত্মা, ওয়াচা তাঁহার আজ্ঞাবাহক ভৃত্য, মালবিয়াকে এই মহৎ পদে নিযুক্ত করিয়া কমিটি স্বাধীনতার ঢং করুক।

ধর্ম্ম,
১৬ শ সংখ্যা,
৫ই পৌষ, ১৩১৬

বেঙ্গলীর উক্তি

আমাদের সহযোগী "বেঙ্গলী" যুক্তমহাসভা কমিটির বিফল পরিণাম দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, জাতীয় পক্ষের প্রতিনিধি ক্রীডে সম্মত হইলেন না, ক্রীডে সহি না করিলে কেহ মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিবে না, অথচ এই উল্টিমেটম দিয়াও সহযোগী আশা করিতেছেন যে আবার মিলনের

চেষ্টা হইতে পারে, আবার দুই দল যুক্ত হইয়া এক সঙ্গে দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণা যতদিন মধ্যপন্থী নেতাদের মন হইতে বিদূরিত না হয়, ততদিন মিলনের আশা বৃথা। যতদিন তাঁহারা এই জেদ ছাড়িতে নারাজ হইয়া থাকিবেন, ততদিন জাতীয় পক্ষ মিলনের আর কোনও চেষ্টায় যোগদান করিবেন না। কেন না, তাঁহারা জানিবেন যে অপর পক্ষে প্রকৃত মিলনের ইচ্ছা নাই। দেশকে বৃথা আশা দেখান অনুচিত। জাতীয় পক্ষ অবিলম্বে তাঁহাদের বক্তব্য সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করিবেন, তাহাতে তাঁহারা কি সর্ত্তে মধ্যপন্থীদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত, তাহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইবে। যে দিন মধ্যপন্থীগণ মেহতা ও মরলীর সফল রাজনীতিতে বিরক্ত হইয়া এই সর্ত্ত মানিয়া আমাদের নিকট সন্ধি-স্থাপনার্থে আসিবেন, সেইদিন আমরা আবার যুক্ত মহাসভা স্থাপনে সচেষ্ট হইব।

মজলিসের সভাপতি

মেহতার পদত্যাগে বঙ্গদেশীয় মধ্যপন্থীগণ এই প্রবল আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, এইবার বুঝি সুরেনবাবুর পালা, এই বঙ্গদেশের মধ্যপন্থী নেতা কনভেনশনের সভাপতি হইবেন, বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইবে, বঙ্গদেশের জিত হইবে। আশাই মধ্যপন্থীর সম্বল, সহিষ্ণুতা তাঁহাদের প্রধান গুণ! যাঁহারা সহস্রবার শ্বেতাঙ্গের আনন্দময় পদ-প্রহার ভোগ করিয়া আবার প্রেম করিতে ছুটিয়া যান, সহস্রবার আশায় প্রতারিত হইয়া সগর্ব্বে বলেন, আমরা এখনও নিরাশ নহি, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী স্বদেশবাসীর ঘনঘন অপমানে লব্ধসংজ্ঞ হইবেন অথবা মেহতা মজলিসের বঙ্গবিদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়াও শিখিবেন এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবেন, এই আশা করা বৃথা। মেহতার মজলিস কংগ্রেসও নহে, কনভেনসনও নহে, যাহারা মেহতার সুরে গান করিবেন, মেহতার পদপল্লবে স্বাধীন মত ও আত্মসম্মান বিক্রয় করিবেন, তাঁহাদেরই জন্য এই মজলিস। যাঁহারা এই মেহতা-পূজার "ক্রীড" স্বীকার না করিয়া প্রবেশ করিবেন, অনাহূত অতিথির ন্যায় তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং যদি অপমানেও বশ না হন, শেষে গলাধাক্কা খাইয়া সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন যে পদত্যাগ করিয়াও মজলিসের কর্ণধার হাল ছাড়িয়াছেন? আমরা তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, মদনমোহনই সভাপতি হইবেন। মজলিসের পরমেশ্বর সেই আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহার বোম্বাইবাসী আজ্ঞাবহমণ্ডলী দেশকে এই আজ্ঞা জানাইয়াছেন, অল

ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিও মাথা পাতিয়াছে। বঙ্গদেশের অল্পজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন—কলিকাতায় ও ঢাকায়, কিন্তু অন্যত্র সাড়া শব্দ নাই। কয়-জন যাইবেন জানি না। যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা ইহা জানিয়া যাইবেন, যে আমরা বৃটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছি। তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রতিনিধি নহেন।

বিলাতের রাষ্ট্রবিপ্লব

বিলাতের পুরাতন বৃটিশ রাজতন্ত্র লইয়া যে মহান সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণও উগ্র ও ভীতি-সঞ্চারক। ইংলণ্ডের লোকমত কিরূপে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইতেছে, তাহা রয়টরের সংবাদে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে। অনেক দিন পরে সেই দেশে প্রকৃত রাজনীতিক উত্তেজনা ও দলে দলে বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে। প্রথম সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা হইল,—উদারনীতিক মন্ত্রী মিঃ উরের বক্তৃতার সময়ে চীৎকার ও বিরোধকারীদের গণ্ডগোল বাধা, পরে বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গের চেষ্টা। রক্ষণশীল দলের বক্তাগণও, বিশেষতঃ জমীদারবর্গ, প্রজার অসন্তোষে সেইরূপ বাধা পাইতে লাগিলেন, এখন মুখ্য মুখ্য মন্ত্রী ও বিখ্যাত বক্তা ভিন্ন কোন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ অবাধে স্বমত-প্রকাশের অবসর পাইতেছেন না, অনেক সভায় এক কথাও বলিতে দেওয়া হয় নাই। কয়েক স্থানে সুরাট মহাসভার অভিনয় বিলাতে অভিনীত হইতেছে। এখন দেখিতেছি বড় বড় রক্ষণশীল রাজনীতিবিদও বাধা পাইতেছেন। আরও উগ্র লক্ষণ দেখা দিয়াছে, প্রাণহানির চেষ্টা। উরের একটি সভায় সেই ঘরের কাচের দরজা একপ্রকার battering ram দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, অনেক লোক আহত হইয়াছেন। আর একটি রক্ষণশীল সভায় বলে সভাভঙ্গ করা হইয়াছে, সেই দলের স্থানিক কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দয় প্রহারে অচেতন করা হইয়াছে, নির্ব্বাচন-প্রার্থী পলায়ন পূর্ব্বক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ রাষ্ট্র বিপ্লবের—দিন দিন যে উগ্র স্বরূপ ধারণ করিতেছে, সন্দেহ হয়, নির্ব্বাচনের সময়ে রক্ষণশীল নির্ব্বাচকবর্গকে ভোট দিতে দেওয়া হইবে কি না।

গোখলের মুখদর্শন

গোখলে মহাশয়ের সূতিকা অশৌচ ঘুচিয়া গিয়াছে, আবার মুখ দেখাইয়াছেন, তাঁহার অমূল্য বাণীও শোনা গিয়াছে। জাতীয় পক্ষের নৃসিংহ

চিন্তামণি কেলকর দুষ্টা-সরস্বতীর আবেশে নব ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের লাট কেলকরকে অযোগ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার নির্ব্বাচন-লালসা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে কেলকরও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া লাট সাহেবকে সাধিতে গিয়াছিলেন, লাট সাহেবও এই আবদারের উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। আমাদের গোপালকৃষ্ণ ভাবিলেন, বেশ হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে কঠোর ও নির্দ্দয়ভাবে নিগ্রহ করুক, আমি সেই অবসরে তাঁহাদের সহিত একটু প্রেম করি, আমার উপর লোকের যে ঘৃণা ও ক্রোধ হইয়াছে তাহা কমিয়া যাইতেও পারে। অতএব তাঁহার "দাক্ষিণ সভার" অধিবেশনে গোখলে কেলকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার বন্ধু ক্লার্ককে মধুর ভর্ৎসনা শুনাইয়াছেন। বলিয়াছেন, কেলকর অযোগ্য নহেন, যোগ্য ব্যক্তি, গোখলে তাঁহাকে যৌবনকাল হইতে চিনিতেছেন, উত্তম সিফারস দিতে পারেন, কেলকর রাজদ্রোহী নহেন, বিকৃতমস্তিষ্ক নহেন, লাট সাহেব আবার বিবেচনা করিলে ভাল হয়।

গোখলের স্বসন্তান সমর্থন

গোখলে মহাশয় নিজের সংস্কাররূপ সন্তানের কথাও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, আমার প্রিয় সন্তান খুব সুন্দর ছেলে, শান্ত শিষ্ট ছেলে, সমস্ত দেশের আদরের যোগ্য, তবে গভর্ণমেন্ট তাহাকে যে রেগুলেশনরূপ বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন, তাহাতেই গোল, সোনার চাঁদের রূপ প্রকাশ পায় না। ক্ষতি নাই, সোনার চাঁদকে আদর কর, পোষণ কর, বস্ত্র কদিন থাকিবে, শীঘ্র পরিপাটী বেশভূষা পরাইয়া তাহার নির্দ্দোষ সৌন্দর্য্য সকলকে দেখাইব! বোম্বাইয়ের লাটও এই উপদেশ দিয়াছেন, দেশ কি এতই অভদ্র ও রাজদ্রোহী হইয়াছে যে লাটের অনুরোধ অমান্য করিবে? গোখলের উপযুক্ত কথা বটে।

ধর্ম্ম
১৭শ সংখ্যা
১২ই পৌষ ১২১৬

প্রস্থান

লাহোরের ধনীপুঙ্গব হরকিসনলালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাঁহারা প্রস্থান করিয়াছেন, কনভেনসন যজ্ঞে মরলীর শ্রীচরণে স্বদেশকে বলি দিতে, শাসনসংস্কার পেষণযন্ত্রে জন্মভূমির ভাবী ঐক্য ও স্বাধীনতা পিষিয়া খন্ড

খণ্ড করিতে বসিয়াছেন বলিয়া ভারতসচিবকে ধন্যবাদ দিতে যাঁহারা সানন্দে মহাসুখে নৃত্য করিতে করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা দেশের নেতা, সম্ভ্রান্ত, ধনীলোক, দেশে তাঁহাদের "Stake" আছে, সম্মান আছে, প্রতিপত্তি আছে। বোধ হয় এই ধনসম্পত্তি সম্মান প্রতিপত্তি ইংরাজের দত্ত, মায়ের দত্ত নহে বলিয়া তাঁহারা কৃতঘ্নতা অপবাদের ভয়ে জন্মভূমিকে উপেক্ষা করিয়া মরলীকেই ভজিতেছেন। দারিদ্র মা একদিকে, বরদাতা, শান্তিরক্ষক, সম্পত্তি রক্ষক গভর্ণমেন্ট অপরদিকে, যাঁহারা মাকে ভালোবাসেন, তাঁহারা একদিকে যাইবেন যাঁহারা নিজেকে ভালোবাসেন, তাঁহারা অপরদিকে যাইবেন; কিন্তু আর দুই-দিকে থাকিবার চেষ্টা যেন না করেন, দুই দিকের দেয় পুরস্কার ও সুবিধা ভোগ করিবার দুরাশা যেন পোষণ না করেন। যাঁহারা কনভেসনে যোগদান করিতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ লোকপ্রিয়তা, দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিপত্তি ও দেশহিতৈষিতার গৌরব পদতলে দলন করিয়া সেই কুস্থানে ছুটিতেছেন। এই প্রস্থান তাঁহাদের রাজনীতিক মহাপ্রস্থান।

হরকিসনলালের অপমান

তেজস্বী স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ কখনও দেশদ্রোহীর সম্মান করিতে ভালোবাসেন না। যদি স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কয়েকদিন মৌখিক ভদ্রতা ও প্রীতি দেখান, তথাপি হৃদয়ে অবজ্ঞা ও অসম্মানের ভাব লুক্কায়িত হইয়া থাকে। পাঞ্জাবের হরকিসনলাল মনে করিয়াছিলেন, আমি রাজপুরুষদের অতীব প্রিয়, পাঞ্জাবের লোকমত দলন করিয়া কনভেনসন করিতেছি, রাজ-পুরুষদের সাহায্যে স্বদেশী বস্তুর প্রদর্শনী করিতেছি, গভর্ণমেন্টের নিকট আমার সকল আব্দার রক্ষিত হইবে। হরকিসনলাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবার জন্য লালায়িত, তাঁহার নামও নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের মধ্যে করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন নিয়মভঙ্গের জন্য সেই নাম গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে লালাজীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। কন্‌ভেন্‌সনের হরকিসনলাল, গভর্ণমেন্টের হরকিসনলাল, প্রতিনিধি হইবেন না, নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই, এ কিরূপ কথা, কাহার এত বড় ধৃষ্টতা, র'স, গভর্ণমেন্টকে লিখি, সকলকে মজা দেখাইব। কিন্তু হরকিসনলালের আবেদনে বিপরীত ফল হইল। পঞ্জাব গভর্ণমেন্ট লালাজীকে অপদস্থ করিয়া এক কথায় তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, নিয়ম অনুসারে হরকিসনলালের নাম প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রত্যাখ্যাতই থাকিবে। ন্যায্য কথা, ব্যক্তির খাতিরে নিয়মভঙ্গ সভ্য রাজতন্ত্রের প্রথা নহে। কিন্তু হরকিসনলাল যখন মরলী ও মিন্টোর মনস্তুষ্টির জন্য

প্রাণপণে খাটিয়াছেন, নাম প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারিতেন, ভুল সংশোধন করা যাইত। আমরা বুঝি, জানিয়া শুনিয়া এই অপমান করা হইয়াছে, মধ্যপন্থীদলকে শিখাইবার জন্য করা হইয়াছে। রাজপুরুষেরা মধ্যপন্থীদিগকে স্বপক্ষে আকর্ষণ করিতে চান, কিন্তু কি রূপ মধ্যপন্থী? যে মধ্যপন্থী একহাতে গভর্ণমেন্টের পা টিপিতে, এক হাতে গলা টিপিতে অভ্যস্ত, গভর্ণমেন্টের নিন্দাও করিবেন, তাঁহাদের অনুগ্রহের দানও আদায় করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থীর আর ইংরাজের বাজারে দর নাই। সম্পূর্ণ রাজভক্ত, সম্পূর্ণ সহকারিতা করিবেন, সেইরূপ মধ্যপন্থী হও, নচেৎ চরমপন্থীর ন্যায় তোমারাও বহিষ্কৃত হইবে। নূতন কৌন্সিলের নিয়মাবলীর যে উদ্দেশ্য, হরকিসনলালের অপমান করিবারও সেই উদ্দেশ্য।

আবার জাগ

বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘুমাইয়া রহিয়াছ, যে নব জাগরণ হইয়াছিল, যে নব-প্রাণ সঞ্চারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, ম্রিয়মাণ অবস্থায়, অৰ্দ্ধ-নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অল্প অল্প জ্বলিতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, যদি বাঁচাইতে যাও, মিথ্যা ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া কেবলই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আবার সম্মিলিত হইয়া কার্য্যে লাগ। যে মিলনের আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপন্থীদল জাতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস করিতে চায়। সেইরূপ মিলনের ফলে যদি দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাঁহারা সত্যপ্রিয়, মহান আদর্শের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, ভগবান ও ধর্ম্মকে একমাত্র সহায় বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপন্থীদের সহিত যোগদান করিয়া, মেহতার আধিপত্য, মরলীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দেশের হিত করিতেন। কিন্তু সেইরূপ কূটনীতিতে ভারতের উদ্ধার হইবার নহে। ধর্ম্মের বলে, সাহসের বলে, সত্যের বলে ভারত উঠিবে। অতএব যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্ষস্থানীয়া শক্তিশালিনী, জ্ঞানদায়িনী বিশ্বমঙ্গলকারিণী ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া মানবজাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধর্ম্মবলে, ত্যাগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্য্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়াছ, আবার ধর্ম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে যেন কোন কার্য্য না কর, সকলে মিলিয়া এক প্রতিজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায়

নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্ম্মসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই করিতে শিখ।

নাসিকে খুন

নাসিকবাসী সাবরকর কয়েকটি উদ্দাম কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ বিচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন, সাবরকরের একজন অল্প-বয়স্ক বন্ধু নাসিকের কলেক্টর জ্যাকসনকে হত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। রাজনীতিক হত্যা সম্পর্কে আমাদের মত আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি, বার বার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা বৃথা।' ইংরাজের পত্রিকাসকল ক্রোধে অধীর হইয়া সমস্ত ভারতের উপর এই হত্যার দোষ আরোপ করিয়া গভর্ণমেন্টকে আরও কঠোর উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহার অর্থ দোষী নির্দোষীকে বিচার না করিয়া যাহাকে সন্দেহ কর, তাহাকে ধর, যাহাকে ধর, তাহাকে নির্ব্বাসিত কর, দ্বীপান্তরে পাঠাও, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাও। যাঁহারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করেন, তাঁহাদিগকে নিঃশেষ কর। দেশে প্রগাঢ় অন্ধকার, গভীর নীরবতা, পরম নিরাশা ব্যপ্ত করিয়া ফেলুক,—তাহাতেই যদি রাজদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সকল আর প্রকাশ না হয়, গুপ্ত বহ্নি নিবিয়া যায়। এই উন্মত্তের প্রলাপ শুনিয়া, বৃটিশ রাজনীতির শোচনীয় অবনতি দেখিয়া দয়াও হয়, বিস্ময়ও হয়। যদি সেই পুরাতন রাজনীতিক কুশলতার ভগ্নাংশও থাকিত, তোমরা জানিতে যে অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মত্ত রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর পিস্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুপ্ত সমিতির আশা। যাহাতে এই রাজনীতিক হত্যা অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দেশ হইতে উঠিয়া যায়, আমরাও সেই চেষ্টা করিতে চাই। কিন্তু তাহার একমাত্র উপায়, বৈধ উপায়-দ্বারা ভারতের রাজনীতিক উন্নতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, ইহাই কার্য্যেতেই দেখান। কেবল মুখে এই শিক্ষা দিলে আর লোকে বিশ্বাস করিবে না, কার্য্যেতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্য কার্য্যে তোমরাই বাধা দিতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদেরও বিনাশ হইবার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম
১৮ শ সংখ্যা
১৯শএ পৌষ, ১৩১৬

মুমূর্ষু কন্‌ভেন্‌সন

আমাদের কন্‌ভেন্‌সনপ্রিয় মহারথীগণ লাহোরে মেহতা মজলিস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রজাসকল কন্‌ভেন্‌সন চায় না, নানা

উপায়ে তাহাদের অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিল, কিন্তু হরকিসনলাল নাছোড়বন্দা। লোকমত দলন করিবার জন্য কন্‌ভেন্‌সনের সৃষ্টি, পঞ্জাবের লোকমত দলন করিয়া রাজপুরুষগণের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিয়া যদি লাহোরে কনভেনসন বসাইতে পারেন, তবে মেহতা মজলিসের অস্তিত্ব সার্থক হয়। এই হঠকারিতার যথেষ্ট প্রতিফল হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মোটে তিন শ প্রতিনিধি মেহতা মজলিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং দর্শকবৃন্দের সংখ্যা এত কম ছিল যে নাতিবৃহৎ ব্রাদলা হলের অর্দ্ধেক ভাগ মাত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই শূন্য মন্দিরে এই অল্প পূজকের হতাশ পুরোহিতগণ বৃটিশ রাজলক্ষ্মীকে নানান স্তব স্তোত্রে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার চরণকমলে অনেক আবেদন নিবেদনরূপ উপহার করিয়া, ভক্তদের উপযুক্ত আদর করেন না বলিয়া মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা শুনাইয়া তাঁহাদের আর্য্যকুলে জন্ম চরিতার্থ করিলেন। মেহতা মজলিস জোর করিয়া নিজেকে জাতীয় মহাসভা নামে অভিহিত ক'রে, জাতীয় মহাসভার কোন অধিবেশনে অর্দ্ধশূন্য পাণ্ডালে অল্পজন প্রতিনিধি এইরূপ হাস্যকর প্রহসন অভিনয় করিয়াছেন, বল দেখি? তোমাদের মজলিস সভা বটে, কিন্তু "মহা"-ও নহে, "জাতীয়"-ও নহে। যে সভায় জাতি যোগদান করিতে অসম্মত, তাহার আবার 'জাতীয়' নাম!

সখ্যস্থাপনের প্রমাণ

বৃটিশ রাজলক্ষ্মী উত্তর সমুদ্রের পারে বসিয়া যখন রয়টারের টেলিগ্রামরূপ দূতের মুখে এই সকল স্তবস্তোত্র শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা মনেই রাখিয়া প্রীত হাস্য করিলেন কিনা, আমরা জানি না। হয় ত প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের মহারোলে মালবিয়া গোখলে সুরেন্দ্রনাথের ক্ষীণস্বর একেবারে চাপিয়া পড়িয়াছে। কে জানে হয়ত, পূজ্য ইংরাজ দেবতাগণ ইহাও জানেন না যে হরকিসনলাল রাজভক্তিকে চরিতার্থ করাকে কনভেনসনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ক্ষতি নাই, কলিকাতাস্থ ইংরাজ সংবাদপত্রের চালকগণ বৃটানিয়ার নামে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। লাহোরের এই কেলেঙ্কারি বৃথা হয় নাই। ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ মুক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন, ষ্টেটসম্যান সেই মধুর ভর্ৎসনার মধুর ভাব না বুঝিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়াও পূজায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলিশম্যানও গালাগালি দিতে না পারিয়া এদিক ওদিক বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়াও হরকিসনলালের রাজভক্তি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। দেশবাসীর অসন্তোষ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রীতি ও প্রশংসা মেহতা মজলিসের পরিপোষকগণের উপযুক্ত পুরস্কার।

নেতা দেখি, সৈন্য কোথায় ?

কন্‌ভেন্‌সনের অপূর্ব্ব বাহাদুরী এই যে, ভারতের যত বড় বড় নেতা আছেন, সর্ব্ব প্রধান ফেরোজশাহ ভিন্ন সকলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাহাদের অধীন সৈন্য লাহোরের ভীষণ শীতের ভয়ে বা আর কোনও কারণে নেতাদের সাহসে সাহসান্বিত না হইয়া স্বগৃহেই খ্রীষ্টমাস ছুটি কাটাইলেন। বঙ্গদেশ হইতে অম্বিকাবাবু ভিন্ন যত নেতা গিয়াছিলেন সুরেনবাবু, ভুপেন-বাবু, আশুবাবু, যোগেশবাবু, পৃথ্বীশবাবু, তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা কেহ কেহ দুইজন, কেহ কেহ তিনজন, কেহ কেহ পাঁচজন বলেন। মান্দ্রাজ হইতে বারজন গিয়াছিলেন, একজন দেওয়ান বাহাদুর এই মহতী সেনার নেতা, আর কয়জন নেতা ছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ এখনও আসে নাই। মধ্যপ্রদেশ হইতে পাঁচ ছ জন, সকলে নেতা, কেন না মধ্যপ্রদেশে পাঁচ ছ জন নেতা ভিন্ন মধ্যপন্থী আর নাই। সংযুক্ত প্রদেশ হইতে মহারথী মালবিয়া গঙ্গাপ্রসাদ ও কয়েকজন রাজা, শাহেবজাদা ইত্যাদি গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্য ছিল, কেহ বলে ত্রিশ জন, কেহ বলে ষাট, কেহ বলে আশী। কেবল পঞ্জাবে এই ক্রম রক্ষিত হয় নাই, সেই প্রদেশে হরকিসনলালই একমাত্র নেতা, আর সকলে সৈন্য। গ্রীক প্রতিনিধি কিনিয়াস রোমন সেনেটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, This is a senate of kings ! এই সভার প্রত্যেক সভ্য একজন রাজা ! আমরাও কন্‌-ভেন্‌সন দেখিয়া বলিতে পারি, This is a Congress of leaders, এই মহা-সভায় প্রত্যেক সভ্য একজন নেতা ! কিন্তু সৈন্য কোথায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নূতন ভাব গঠিত হইয়াছে, যে ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করিতেছে, সে ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই, সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবান তাহা দেখেন নাই; এ কথা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি ? যাঁহার পাদস্পর্শে পৃথিবীতে সত্যযুগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে বহুযুগ সঞ্চিত তমোভাব বিদূরিত, যে শক্তির সামান্য মাত্র উন্মেষে দিগদিগন্ত-ব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে; যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টি স্বরূপ; তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই

বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না—আমাদের বিশ্বাস যাহা তিনি মুখে বলেন নাই. তাহা তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতকে, ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবী করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধক ভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, "তুই যে বীর রে"! তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকর জালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাবে সাধন করিতে হইবে। তাহাদিগকে বেপরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎবাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে "তুই যে বীর রে"!

ধর্ম্ম
১৯শ সংখ্যা
২৬এ পৌষ ১৩১৬

কন্‌ভেন্‌সনের দুর্দ্দশা

বোম্বাইয়ের "রাষ্ট্রমতে" কন্‌ভেন্‌সনের প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দের সংখ্যা বাহির হইয়াছে। এই সংবাদপত্রের লাহোর পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন, "লাহোরের ক্রীড্ কংগ্রেসের অধিবেশনে সবসুদ্ধ ২২৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এই সংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। যাঁহারা আগে রাজনীতিক কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন, সেইরূপ ভদ্রলোক খুব অল্পই ছিলেন। দর্শকের সংখ্যা ছয় শত বা সাত শত হইবে। সময়ে সময়ে হলের দুই ভাগই খালি ছিল। একজনও মুসলমান প্রতিনিধি বা দর্শক উপস্থিত ছিলেন না। সভাপতি মালবীয় অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য চালাইলেন, নচেৎ এইবার ক্রীড্ কংগ্রেসের আরও দুরবস্থা হইত।" পত্র-প্রেরকের শেষ

উক্তির মধ্যে কোনও গুপ্ত মতভেদের ইসারা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাসন-সংস্কার লইয়া এই মতভেদ, দুই দলের আপোষের সর্ত্ত কন্‌ভেন্‌সনের তদ্বিষয়ক প্রস্তাব দেখিলেই বোঝা যায়। প্রস্তাবের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের সম্পূর্ণ বিরোধ। প্রথমাংশে মিন্টো ও মরলীর উদারতা, প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য উৎকট ও বিকট চেষ্টা ইত্যাদি গুণের সানন্দ প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার উদ্দাম লহরী, শেষাংশে কঠোর, প্রায় অভদ্রভাষায় গভর্ণমেন্টের গালাগালি এবং ক্রোধ ও ঘৃণার উদ্দাম উচ্ছ্বাস। এই হাস্যকর অসঙ্গত সম্মিলনে মালবীয়ার দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে, কন্‌ভেন্‌সন করাল অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আলাহাবাদে মালবীয়ার শীতল ছায়ায় আবার সম্মিলিত হইবার দুরাশা পোষণ করিতেছে।

দলাদলি ও একতার মিথ্যা ভান

মানুষমাত্র কথার দাস, বাক্‌দেবীর পুতুল। চিরপরিচিত শ্রুতিমধুর কথা শ্রবণ করাইয়া মনকে নাচান আমাদের মধ্যপন্থী বন্ধুদের এক প্রকার সিদ্ধি। তাঁহারা ইংরাজ রাজনীতিবিদগণের শিষ্য। ইংরাজ যেমন কোন শ্রুতিমধুর কথা আবৃত্তি করিয়া—যথা, বৃটীশ শান্তি, বৃটীশ ন্যায়পরতা, স্বায়ত্ত-শাসন সংস্কার ইত্যাদি,—বিশাল শূন্যভাবের আবরণে স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি করিতে অভ্যস্ত, তেমনই তাঁহাদের মধ্যপন্থী শিষ্যগণ "বৃটীশ ন্যায়পরতার এজলাস" "বৃটীশ প্রজার বিবেকবুদ্ধি", "বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত অধিকার" ইত্যাদি শ্রুতিমধুর শূন্য কথায় দেশের বুদ্ধি বিব্রত করিয়া এতদিন ভারতের প্রকৃত উন্নতির সুপন্থা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এখনও সেই অভ্যাস যায় নাই। তাঁহারা জাতীয়-পক্ষের স্বতন্ত্র কার্য্যশৃঙ্খলার উদ্যোগ চলিতেছে দেখিয়া "দলাদলি", একতা ইত্যাদি পরিচিত কথার রোল করিয়া লোকের মন নাচাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারাই ক্রীড ও কনষ্টিটিউসন সৃষ্টি করিয়া জাতীয়-পক্ষকে মরলীর মনস্তুষ্টির আশায় বহিষ্কৃত করিলেন, তাঁহারাই হুগলী প্রাদেশিক সমিতিতে জাতীয় পক্ষের কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে উঠিয়া সমিতি ভাঙ্গিয়া দিবেন, এই বিভীষিকা দেখাইলেন, তাঁহারাই জাতীয় পক্ষের নেতাগণের সহিত একসঙ্গে কার্য্য করিতে ভীত ও অনিচ্ছুক, মধ্যপন্থী নেতাদের নামের সঙ্গে কোনও ঘোষণায় তাঁহাদের স্বাক্ষর দিবার প্রস্তাব উঠিলে "কাজ নাই, কাজ নাই, গভর্ণমেন্ট চটিবে, বড় মানুষেরা চটিবে," বলিয়া সেই প্রস্তাব উড়াইয়া দেন। অথচ আমাদের উপর উল্টা চাপ দিতে লজ্জিত নন। আমরাই নাকি দলাদলি করিতেছি, সামান্য মতভেদের জন্য একসঙ্গে কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, কন্‌ভেন্‌সনে ঢুকিয়া মেহতাকে বুঝাইবার চেষ্টা না করিয়া

স্বতন্ত্র হইয়া থাকি। এতদিন আমরা কোন বাধা করি নাই, দেশ, আন্দোলন, রাজনীতিক ক্ষেত্র তোমাদেরই হাতে ছিল, এই ফল হইয়াছে যে, সমস্ত দেশ নীরব হইয়া পড়িয়াছে, ভারত নিদ্রা যাইতেছে, লোকের উৎসাহ, সাহস, আশা ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। আমরা দেশকে জাগাইতে চাই—তোমাদিগকে চিনিয়া লইয়াছি; জানি যে ইচ্ছা থাকিলেও ভয় ও বিপদের আশঙ্কা তোমাদিগকে কার্য্য করিতে দিবে না,—আমাদের বিপদ হউক, দলন হউক, আমরা দেশের কার্য্য করিব, সেই উদ্যোগ করিতেছি। অমনই মধ্যপন্থীদের রব উঠিতেছে, 'আহা কি করিতেছ? একজোট হইয়া কি সুন্দর ঘুম মারিতেছিলাম। আবার দলাদলি! আমাদের প্রিয় একতা গেল, রক্ষা কর, মতিলাল কোথায়, অনাথবন্ধু কোথায়, আমাদের রক্ষা কর। তোমাদের মনের ভাব জানি, জাতীয়-পক্ষ যদি কার্য্যশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, তোমাদের হয় সেই কার্য্যে যোগদান করিয়া গভর্ণমেন্টের অপ্রিয় হইতে হইবে, নয় নিশ্চেষ্ট থাকিলে অকর্ম্মণ্য ও ভীরু বলিয়া দেশবাসীর সম্মান ও তোমাদের নষ্টপ্রায় নেতৃত্বের ভগ্নাংশ হারাইতে হইবে। এই জন্যই চির অভ্যাসবশে মিথ্যা একতার ভান করিয়া তোমাদের সেই প্রিয় সুখকর নিশ্চেষ্টতার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ কর।

নির্ব্বাসনের বিভীষিকা

আমাদের পুলিশ বন্ধুগণ রটনা করিয়াছেন যে, আবার নির্ব্বাসনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ জনকে মোটরকারে রেলে, "Guide" জাহাজে গভর্ণমেন্টের খরচে নানা প্রদেশ ও বিবিধ জেল ঘুরিয়া আসিবার জন্য প্রস্থান করিতে হইবে। পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ নাকি প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝিতে পারি নাই, নির্ব্বাসন এমন কি ভয়ঙ্কর জিনিষ যে লোকে নির্ব্বাসন নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া দেশের কার্য্য, কর্ত্তব্য, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়ে। চিদাম্বরম প্রভৃতি কর্ম্মবীর বয়কট প্রচার দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই দণ্ড অতি লঘু, অতি অকিঞ্চিৎকর। বাহিরে পরিশ্রম করিতেছিলাম, নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, না হয় ভগবান লর্ড মিন্টো বা মরলীকে যন্ত্র করিয়া বলিলেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাক, নির্জ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন করিতেছিলে,
নতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর

হইতে হয়? কয়েকদিন প্রিয়জনের মুখ দেখিতে পারিব না,—বিলাতে বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন, অখাদ্য খাইয়া, গ্রীষ্ম ও শীতে কষ্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বাড়ীতে বসিয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, অদৃষ্ট-লিখিত আয়ুক্রম কেহ অন্যথা করিতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরানো বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহস্রবার জন্মিয়াছি, সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন করিতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ করিতে আসিব, কেহ আমাকে বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইতিহাসে অমর নাম লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কষ্ট নাই, অথবা সামান্য শরীরক্লেশে মুক্তি ও ভুক্তি পাইলাম। এ ত কথা? ট্রান্সভালের কুলীদের মহৎ-ভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দেখিয়া লজ্জিত হইতে হয়।

নির্ব্বাসন অসম্ভব

আমাদের ধারণা, এই ভয় দেখান বৃথা আস্ফালন মাত্র। প্রস্তাব করা হইয়াছে, হয়ত ইণ্ডিয়ান গভর্ণমেন্টের অনুমতিও হইয়াছে, কিন্তু লর্ড মরলী যে সম্মত হইবেন, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে চাই না। নয় জনকে নির্ব্বাসিত করায় লর্ড মরলীকে যথেষ্ট ভুগিতে হইয়াছে, আবার চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করিবেন? বিশেষতঃ ইহা জানা কথা যে লর্ড মরলী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জনকে কারামুক্তি দিতে উৎসুক, কেবল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের জেদে পারিতেছেন না। এই অবস্থায় তিনি কি সহজে আর চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করিয়া দেশের গভীর অশান্তিকে আরও গভীর করিবেন, বিপ্লবকারীদের ইচ্ছার মত কার্য্য করিবেন? তিনি অনেক ভুল করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার উন্মত্ত অবস্থা হয় নাই। অবশ্য লর্ড মিন্টো যদি বলেন যে নির্ব্বাসনের অনুমতি না দিলে তিনি ভারতের শান্তির জন্য দায়ী নহেন, কিম্বা পদত্যাগ করিবার ভয় দেখান, তাহা হইলে লর্ড মরলী দায়ে ঠেকিয়া সম্মত হইতে পারেন। নাও হইতে পারেন, কেন না লর্ড মিন্টো না থাকিলে বৃটীশ সাম্রাজ্য যে ধ্বংস হইবে, সেই কথায় লর্ড মরলী হয়ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক চব্বিশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, বা একশ জনকে নির্ব্বাসন করুন, অরবিন্দ ঘোষকে নির্ব্বাসন করুন, বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জীকে নির্ব্বাসন করুন, কালচক্রের গতি থামিবার নহে।

ধর্ম্ম
২০শ সংখ্যা
৪ঠা মাঘ ১৩১৬

নবযুগের প্রথম শুভলক্ষণ

শাসন সংস্কার নবযুগের প্রথম অবতারণা, সেই যুগে অবিশ্বাসের ঘোর অন্ধকার মধুর প্রীতির আলোকে পরিণত হইবে, এবং দণ্ডনীতির কঠোর মূর্ত্তি ইংরাজ প্রকৃতিতে লীন হইয়া সাম্যনীতির আনন্দময় বিকাশ ভারত-জীবনকে সুখে ও প্রেমে পূর্ণ করিবে, এই শ্রুতি-মধুর রব অনেকদিন অবধি শুনিতেছি। এতদিন পরে কুহকিনী আশার বাণী সফল হইল। যে সভা-নিষেধ আইন পূর্ব্ব বাঙ্গালার একমাত্র জেলায় জারি হইয়াছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতে জারি হইয়াছে। গত শুক্রবার হইতে সমগ্র ভারত এই আইনের অধীন হইয়াছে। আইনে বিনা অনুমতিতে কোথাও কুড়ি জন লোক এক সঙ্গে দাঁড়াইতে বা বসিতে পারিবেন না, দাঁড়াইলে বা বসিলে পুলিসে যদি এই কুড়িজনের সম্মিলনকে প্রকাশ্য সভা নামে অভিহিত করিতে অভিলাষী হয়,—সেইরূপ হাস্যরসপ্রিয় লোক পুলিসে অনেক আছে—তাহা হইলে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন বা বসিয়াছেন, তাঁহারা আইনে দণ্ডনীয়। প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহারা "সভার" সভ্য ছিলেন না, বা সভ্য হইলেও "প্রকাশ্য" ছিলেন না। তবে যদি "প্রকাশ্য" না হন, কাজেই গুপ্ত ছিলেন, তাহা আরও বিপজ্জনক। ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে ছয়মাস বিনা পয়সায় গভর্ণমেন্টের আতিথ্য এবং বিনা মাহিনায় সম্রাটের জন্য খাটুনীর সুযোগ লাভ করিয়া নূতন যুগের রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। নিজগৃহে সম্মিলিত হইলেও রক্ষা নাই। সেইখানে যদি রাজনীতির কথা হয়, বা সেইরূপ কথা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, অথবা সেইখানে অমৃতবাজার পত্রিকা, পঞ্জাবী, বেঙ্গলী, কর্ম্মযোগী ইত্যাদি রাজ-দ্রোহী সংবাদপত্র পড়া হয় বা পড়া হইবার কোনও সম্ভাবনা হয়, পুলিস আসিতে পারিবে, এবং গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণকে গভর্ণমেন্ট হোটেলে লইয়া যাইতে পারিবে। যদি কুড়িজনকে পিতার শ্রাদ্ধে বা কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করি, সেখানেও এই পুলিস-লীলার সম্ভাবনা। নবযুগের সুপ্রভাত হইয়াছে। জয় মিন্টো-মরলী! জয় শাসন-সংস্কার।

আইন ও হত্যাকারী

লাটসাহেব সমগ্র ভারতের উপর কেন এই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলা কঠিন।' অনেকে বলে, হত্যা ও ডাকাইতি হইতেছে বলিয়া এই সভা-নিষেধ

ঘোষণা। গুপ্ত হত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রে ভীত হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তাঁহারা যে কুড়িজন মিলিয়া "প্রকাশ্য সভা" করিতে অভ্যস্ত, ইহাও কখনও শুনি নাই। ছয়মাস কারাদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুমতি লইয়া গুপ্ত হত্যা বা ডাকাইতির পরামর্শ করিতে বসিবেন, তাহার সম্ভাবনাও অত্যল্প। এই যুক্তির মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বন্ধুগণ বলেন যে তাহা নহে, দেশে আন্দোলন হইলেই হত্যা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, অতএব সভাসমিতি বন্ধ করা ও হত্যা ডাকাইতি বন্ধ করা একই কথা। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে এই জগতে রাজনীতি অতি সহজ খেলা হইত, পাঁচ বৎসরের শিশুও শাসনকার্য্য চালাইতে পারিত। দুঃখের কথা, বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায় এই অদ্ভুত যুক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। এতদিন কি সভা সমিতি বন্ধ ছিল না? চরমপন্থীদলের সভাসমিতি অনেকদিন আগেই লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী নেতাগণ নির্ব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন বিখ্যাত বক্তাও উপস্থিত হন না, দর্শকমণ্ডলীও সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ জেল হইতে আসিবার পরে কয়েকদিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন বটে, তিনিও হুগলী প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পড়িয়াছেন। সভার মধ্যে হত্যা-নিষেধের ঘন ঘন সভা এবং দক্ষিণ সভার অধিবেশনে ইংরাজবন্ধু গোখলের শক্তিময় বক্তৃতাই মাঝে মাঝে হয়। তবে হত্যা ডাকাইতি গোখলে মহাশয়ের বক্তৃতার ফল? হইতে পারে, কেন না গোখলে মহাশয় ভারতের স্বাধীনতালুব্ধ যুবকগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে বলপ্রয়োগই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায়। নচেৎ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইতির বৃদ্ধি দিন দিন হইতেছে। তাহাই স্বাভাবিক, ভিতরে বহ্নি থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ বন্ধ করায় তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, বলে নির্গমনের পথ খুলিয়া প্রতিরোধককে বিনাশ করিতে বাহির হয়।

আমরা কি নিশ্চেষ্ট থাকিব

এই আইন এখনও জেলা বা সহরে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু কোনও প্রদেশে সতেজে আন্দোলন আরব্ধ হইবামাত্র প্রযোজিত হইবে, সন্দেহ নাই, অতএব ইহাকে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য

গভর্ণমেন্টের সঙ্কেত বলিতে হইবে। এখন বিবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয় পক্ষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? আমরা আইনের ভিতরে আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টিত আছি। আইনের গন্ডী যদি এত সংকীর্ণ হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের কি উপায় রহিয়াছে। এক উপায়, নীরবে এই ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা। আমরা জানি, গভর্ণমেন্টও জানে যে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই, মস্তকে নিগ্রহ দণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পরিণত হয় নাই। প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গুমরিয়া রহিয়াছে। এখনও বিপ্লবকারীগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের পথে টানিতে পারে নাই, কিন্তু কবে টানিতে পারিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। একবার অনর্থ ঘটিত হইলে গভর্ণমেন্টের বিপদ এবং দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকিবে না আমরা এই আশঙ্কায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয় পক্ষ সুশৃঙ্খলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের নির্দ্দোষ পন্থা দেখাইতে পারিলে গুপ্তহত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন বুঝিলাম ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সেই উপায় অবলম্বন করিতে দিবেন না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই এই চিন্তা মনে আসে, তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই ধারণা যে আরও উগ্র দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দণ্ডনীতি প্রয়োগ করুন। আমরা চুপ করিয়া দেখি কিসেতে কি হয়, আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরাজ রাজনীতিবিদগণ নিজেদের ভুল বুঝিবেন তখন আমাদের কর্ম্মের সময় আসিবে। এই পন্থাকে masterly inactivity—ফলবতী নিশ্চেষ্টতা বলা যায়।

চেষ্টার উপায়

নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করায় আমাদের ভবিষ্যৎ সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে দেশের প্রচুর অমঙ্গল হইবার কথা। আমরা না হয় বক্তৃতা বা সভাসমিতি নাই করিলাম, কুড়িজনের সম্মিলন নাই বা হইল, আমাদের উদ্দেশ্য বক্তৃতা করাও নহে, ইংরাজী ধরণে আন্দোলন করাও নহে। দেশের কার্য্য করা আমাদের উদ্দেশ্য, কার্য্যের শৃঙ্খলা আমাদের মিলিত হইবার কারণ। সেই কার্য্যের শৃঙ্খলা বার চৌদ্দ জন দেশের প্রতিনিধি কি করিতে পারেন না? তাঁহারা যে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবেন দেশের লোক কি সেই পরিমাণে ক্ষুদ্র পরামর্শ-সভা করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারে না? আর যদি এই আইনও হয় যে পাঁচ জন একসঙ্গে বসিলে বেআইনী জনতা হইবে, তাহা হইলে কি

আর কোনও নির্দ্দোষ উপায় নাই? শঙ্করাচার্য্যের দেশে কি সভাসমিতি না করিয়া কোন মত প্রচার হয় না? মন্দিরে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানাস্থানে নানা অবসরে ভায়ে ভায়ে দেখা হয়, সামান্য কথার মধ্যে দেশের কার্য্যবিষয়ক দুয়েক কথা কি হইতে পারে না? আইনের গণ্ডীতে থাকিব, কিন্তু আইন যাহা বারণ করে না, তাহা ত করিতে পারি? এত করিয়াও যদি শেষে গভর্ণমেন্ট জাতীয় শিক্ষাপরিষদকে বেআইনী জনতা বলিয়া জাতীয় বিদ্যালয়সকল বন্ধ করে, শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, শালিসীতে কলহ মিটানকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া সশ্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করেন, আর যদি ট্রান্সভালবাসী কুলি ও দোকানদারদের সাহস, দেশহিতৈষিতা ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে না থাকে, তাহা হইলে না হয় পুলিস ও গুপ্ত বিপ্লবকারীর পন্থা আর রোধ করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সরিয়া পড়িব। সেই পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।

ধর্ম্ম
২১শ সংখ্যা
১১ই মাঘ ১৩১৬

আর্য্য সমাজ

আর্য্যসমাজ স্বামী দয়ানন্দের সৃষ্টি। তিনি যে ভাব ও প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, আর্য্যসমাজ যতদিন সে ভাবে ভাবান্বিত এবং সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত রহিবে, ততদিন তাহার তেজ, বৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থাকিবে। বিভূতি বা মহাপুরুষ কোনও বিশেষ ভাব লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, সেই ভাব প্রকাশ করিয়া তাহার বলে জগতের উপকারী মহৎ কার্য্য করিয়া যান, বা নিজ ভাবের সঞ্চারে ও বিস্তারে শক্তির একটী বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার সংস্থাপিত সংস্থা বড় হউক বা ছোট হউক সেই সংস্থা সেই বিভূতি বা মহাপুরুষের প্রতিনিধি হইয়া জগতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য করিতে থাকে। যে দিন সংস্থায় মহাপুরুষের ভাব মলিন হইবে বা তিরোহিত হইবার লক্ষণ হইবে, সেই দিন হয় ইহা বিনষ্ট হইবে, নয় অন্য আকার ও অন্য ভাব গ্রহণ করিয়া জগতের অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে। তখন অন্যান্য মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্থার বিনাশ ঠেকাইতে পারেন এবং অনিষ্টের মাত্রা কমাইতে পারেন, কিন্তু আসল ভাব ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। আর্য্যসমাজের সংস্থাপক তেজস্বী স্বামী দয়ানন্দের ভাবের মধ্যে আমরা তিন

তত্ত্ব পাই, পুরুষার্থ, স্বাধীনতা এবং কর্ম্ম। এই তিনটীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম কর্ম্মঠ তেজস্বী স্বাধীনতাপ্রিয় পঞ্জাবী জাতির প্রিয় হইয়াছে, অতুল্য কর্ম্মশৃঙ্খলা, কার্য্যসিদ্ধি এবং উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন যে পরীক্ষা আসিয়াছে আর্য্য-সমাজ উত্তীর্ণ হইবে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। লালা লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের সময়ে সমাজে অনেক দোষ প্রকাশ হইয়াছিল, এখন আরও শোচনীয় দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখিতে পাই। যে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবের ভিত্তি ছিল, সমাজ সে মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিয়া কিসেতে নিরাপদ থাকি, এই ভাবনায় ও ভয়ে উন্মত্ত হইয়াছে। বিনা বিচারে পরমানন্দকে তাড়ান এবং দুই সামান্য পত্র প্রকাশ হওয়ায় লালা লাজপত রায়কে তাঁহার সকল পদ ছাড়ান এই আশ্চর্য্য বিহ্বলতার প্রমাণ। শীঘ্র মতি না ফিরিলে আর্য্যসমাজ মৃত্যুর পথে ধাবিত হইবে। যে যে ধর্ম্ম জগতে রহিয়াছে, মনুষ্যজাতির মন অধিকার করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইসলাম, শিখধর্ম্ম, ছোট হউক, বড় হউক, পরীক্ষার সময় নিজ ভাব রক্ষা করিতে পারিয়াছে বলিয়া বাঁচিতে পারিয়াছে।

প্রহারকের পরিচয়

আমরা "একটী সত্য ঘটনা" বলিয়া যে বাঙ্গালীর ও বঙ্গদেশের অপমান ও লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে কাহারও নাম প্রকাশ করি নাই। সেই আত্মসংযমের কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের সহযোগী হিতবাদী "প্রহারকের পরিচয়" শীর্ষক পত্র বাহির করিয়া আক্রমণকারী সাহেব ও মেমদের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম, প্রহারক রাইচ সাহেবের পুত্র, কিন্তু সহযোগীর পত্রপ্রেরক বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ নির্ভুল হইবার কথা। যাহা হউক যদি পূর্ব্ববাঙ্গালার গভর্ণমেন্ট এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথ সুগম করা হইয়াছে। নিম্নে পত্র উদ্ধৃত করিলাম—

গত ২রা মাঘের দৈনিক হিতবাদীতে "ধর্ম্ম" হইতে উদ্ধৃত "সত্যঘটনা" শীর্ষক প্রবন্ধে গোয়ালন্দে জনৈক কাব্যতীর্থ পণ্ডিত মহাশয়ের কতিপয় শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতমহিলাকৃত লাঞ্ছনার বিষয় অবগত হইয়া আমি উহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা আপনার দেশপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

আপনার পত্রিকায় ঘটনা যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; যে দুইটী শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব এই পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে, তাহার

একটী গত বৎসরের (ঢাকা) "বায়ড়া হাঙ্গামা" মোকদ্দমার প্রধান অভিনেতা স্বনামধন্য মহাবীর শ্রীল শ্রীযুক্ত ডি মন্টি সাহেব বাহাদুর; (ইঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন)। অপরটী মিঃ ল্যাণ্ডেল এণ্ড ক্লার্কের (পাবনা) নাকালিয়া পাটের কুঠির ম্যানেজার মিঃ রাইচ সাহেবের মাননীয় শ্যালক, এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথম আক্রমণকারী। দুঃখের বিষয়, এই শ্যালক মহাশয়ের নাম জানিতে পারি নাই, তবে "রাইচ্ সাহেবের শ্যালক" এই পরিচয়ই যথেষ্ট। মহিলাদ্বয়ের একটী উক্ত রাইচ্ সাহেবের সহধর্ম্মিণী এবং অপরটী তাঁহারই কনিষ্ঠা।

ইঁহারা গোয়ালন্দে এই অমানুষিক অভিনয় করিয়া পরদিন রাত্রিতে নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এখানে একদিন মাত্র ফিলিপপোলো সাহেবের বাংলোয় অবস্থান করিয়া পরদিন জগন্নাথগঞ্জের পথে কালীগঞ্জ ষ্টীমারে আড়ালিয়া অবতরণ করতঃ তথা হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী নাকালিয়া কুঠীতে কুটুম্ব সমাগমে সজ্ঞানে এবং খোস মেজাজে আহার বিহার করিতেছেন।

শ্রী—

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনী

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনী আরম্ভ হইয়াছে। ফলে কোন্ দলের যে প্রাধান্য হইবে তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। আপাততঃ রক্ষণশীল দলেরই জয় হইতে চলিয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডে ইহাদিগের প্রভাব অত্যন্ত অধিক দেখা যাইতেছে। লণ্ডনে দুইদলেরই সমান প্রভাব বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাংশেই উদারনীতিকগণের প্রভাব এবং ওয়েলস ও স্কটলণ্ড একরকম সম্পূর্ণরূপেই ইহাদিগের পক্ষে। নির্ব্বাচনের ফলে উভয়ের ক্ষমতা সমান সমান হইলে যে দলই গভর্ণমেন্ট করিতে চাহিবেন, ন্যাশনলিষ্টদিগের উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইবে। রক্ষণশীলগণ হোমরুলের পক্ষপাতী নহেন কাজেই ন্যাশনলিষ্টদিগের সহিত যোগদান করিয়া উদারনীতিকগণ গভর্ণমেন্ট করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা গভর্ণমেন্ট চালাইতে পারিবেন না। কারণ অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা রহিয়াই যাইবে ও তাহারা পুনর্ব্বার বজেট প্রত্যাখ্যান করিবে। কাজেই যে পথেই যাওয়া হউক না কেন তাহা সকলই রুদ্ধ। এই অদ্ভুত উভয় সঙ্কট এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্ব্বাচনের ফলের সহিত ভারতবর্ষের তত সংস্রব নাই। তবে আমরা এইটুকু আশা করি যে উদারনীতিকগণের জয় হইলে ও অভিজাত সভার

ভিটোর ক্ষমতা লুপ্ত ও তৎসম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তনাদি হইলে শাসন সংস্কারাদি সম্বন্ধে আমাদিগের একটু সুবিধা হইবে। ইহা ব্যতিরেকে উদারনীতিকেরই জয় হউক, আর রক্ষণশীলেরই জয় হউক আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

ধর্ম্ম
২৪শ সংখ্যা
২রা ফাল্গুন ১৩১৬

বিচার

বিচারের শুদ্ধতা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ। সেই শুদ্ধতা কতক জজের মন ও চিত্তের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, কতক স্বাধীন লোকমত দ্বারা রক্ষিত হয়। জজ রাজার মুখ্য ধর্ম্মের ভার বহন করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, যেমন ঈশ্বর বিচারাসনে বসিয়া নিরপেক্ষভাবে শত্রু মিত্র, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা ইত্যাদি ভেদ না করিয়া কেবলই ধর্ম্ম রক্ষা করেন, সেইভাবে বিচার করা তাঁহার ধর্ম্ম। যদি রাগদ্বেষ, মানমর্য্যাদা, রাজনীতিক বা সামাজিক কোনও উদ্দেশ্যের বশে আইনের বিভ্রাট করেন, তিনিও ধর্ম্মচ্যুত হন, সমাজের বন্ধনও শিথিল হয়। আর যদি অজ্ঞ বা লঘুচিত্ত ব্যক্তিকে বিচারকর্ত্তার আসনে বসান হয়, সেই রাজ্যের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। আর সকল শাসনতন্ত্রের বিভাগে বিভ্রাট হওয়ায় অনিষ্ট ক্ষণস্থায়ী হইতেও পারে, বিচারের অশুদ্ধতায় রাজা, রাজ্য ও প্রজার ধ্বংস হয়। কোনও শাসনতন্ত্রের গুণ দোষ নির্ণয় করিবার সময় সহস্র শৃঙ্খলা, কার্য্যক্ষমতা ও সুখশান্তির প্রমাণ দেওয়া নিরর্থক,—যদি বিচারপ্রণালী নির্দ্দোষ না হয়, সেই শাসনতন্ত্রের প্রশংসা মিথ্যা।

লোকমতের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ যদি নিষ্পাপ ও স্থিরবুদ্ধি হইত, বিচার সম্বন্ধে লোকমতের স্বাধীনতা আবশ্যক হইত না। কিন্তু মানুষের মন চঞ্চল, তাহার চিত্তে কামনা ও রাগদ্বেষ প্রবল, তাহার বুদ্ধি অশুদ্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ। এই অবস্থায় বিচারের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার তিন উপায় আছে। প্রথম উপায় আইনজ্ঞ, প্রৌঢ়, ধীরপ্রকৃতি লোককে বিচারাসনে বসাইয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, স্বার্থচিন্তা, পরের আদেশ, প্রার্থনা, অনুনয় ইত্যাদি হইতে দূরে রাখা; চঞ্চলমনা, আইনে অনভিজ্ঞ যুবক কখন বিচারাসনে

আরূঢ় করা উচিত নহে, বিচারককে কোনমতে শাসকের অধীন করাও বিপজ্জনক; এই তত্ত্ব ও নিয়ম ইংলণ্ডীয় বিচারপ্রণালীতে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ বিচারপ্রণালীর এত প্রশংসা। দ্বিতীয় উপায় বিচারের মহান নিষ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন করিয়া সেই আদর্শ বিচারক, আইনব্যবসায়ী লোকও সর্ব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হওয়া মানুষের পক্ষে অতি সহজ, সেইজন্য লোকমতকে আদর্শের রক্ষকরূপে দাঁড় করান ভাল। বিচারক যদি জানেন যে আদর্শ হইতে লেশমাত্র ভ্রষ্ট হইলে লোকের নিন্দা ও কলঙ্কের পাত্র হইব, তাঁহার মনে অন্যায় করিবার প্রবৃত্তি সহজে আশ্রয় পাইবে না।

আমাদের দেশে

আমাদের দেশে কয়েক কারণ বশতঃ বিচারককে শাসকের অধীন রাখা হইয়াছে, সেই জন্যে বিচারকের দায়িত্ব অনেকটা শাসকের উপর পড়িয়াছে। বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি না হইয়া শাসকের প্রতিনিধি হন। অতএব শাসকের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ইহার উপর শাসনতন্ত্রের সুবিধার জন্য অপক্ককেশ অনভিজ্ঞ লোকের উপরেও বিচারের ভার দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আবার সম্প্রতি নূতন আইনে বিচারকের বিচার সম্বন্ধে বিপরীত লোকমত ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা শাসনের জন্য আবশ্যক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার আমাদের নাই। কিন্তু এই অবস্থায় শাসকের কি ভীষণ দায়িত্ব, তাহা শাসনকর্ত্তারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাঁহারা যেন স্মরণ করেন যে, তাঁহারা এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার কি প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা ভগবান দেখিতেছেন, দেশের হিতাহিত, রাজ্যশাসনের ফলাফল এবং সাম্রাজ্যের সুখ শান্তি ও স্থায়িত্ব তাহারই উপর নির্ভর করে।

ধর্ম্ম
২৫শ সংখ্যা
৯ই ফাল্গুন ১৩১৬

ভগবদ্দর্শন

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র নির্ব্বাসিত হইয়া আগ্রা জেলে কিরূপে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও সর্ব্বত্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি ব্রাহ্ম-

সমাজের ছাত্রসমাজে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যখন উত্তরপাড়ায় সেই কথাই বলিয়াছিলেন, পুণার ইণ্ডিয়ান সোশাল রিফর্মর (সমাজ সংস্কারক) উপহাস করিয়া বলিলেন, দেখিতেছি জেলে ঈশ্বর দর্শনের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপহাসের অর্থ এই যে এই সব কথা মাথাপাগলা লোকের কল্পনা অথবা মিথ্যাবাদীর বুজরুকী। অথচ অরবিন্দবাবু যাহা বলিলেন, ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার অবিকল তাহাই বলিয়াছেন। এমন কি যাহা অনেকের বিশেষ পরিহাসের যোগ্য কথা বোধ হইয়াছে, বিচারক ও জেলরের মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপী প্রেমময় ও দয়াময় দর্শন, তাহাও দুজনেই লাভ করিয়াছেন। অবশ্য, একই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দুই প্রকার তার্কিক সিদ্ধান্ত হইতে পারে, এক সত্য লইয়া নানা মত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আগ্রায় ও আলিপুরে, যাহাদের ভিন্ন মত ও ভিন্ন প্রকৃতি, সেইরূপ দুইটি লোকের একই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে, তখন কি কেহ তাহাকে পাগলামী বা বুজরুকী বলিতে পারে? পুণার "সমাজ সংস্কারক"-এর মতে ভগবান কখনও প্রত্যক্ষ দর্শন দেন না, তিনি নিয়মের অন্তরালে থাকেন, আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুভব করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা বাতুলের কথা। একজন বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ লোক যদি বলেন যে অমুক রাসায়নিক প্রয়োগ মিথ্যা এবং কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া করিয়া বলেন, ইহা সত্য, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কাহার কথা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, কাহার মত লোকে গ্রহণ করিতে বাধ্য?

জেলে দর্শন

এইরূপ লোকের আর এক অবিশ্বাসের কারণ এই যে জেল অপবিত্র স্থান, খুনী চোর ডাকাতে পরিপূর্ণ, যদিও ভগবান দর্শন দেন, তবে পবিত্রস্থানে সাধুসন্ন্যাসীকেই দর্শন দিবেন, আইনের জালে পতিত রাজনীতিককে, ঘোর রাজসিক কার্য্যে লিপ্ত সংসারীকে জেলে দেখা দিবেন কেন? আমাদের মতে সাধু-সন্ন্যাসী অপেক্ষা এইরূপ লোককেই ভগবান সহজে ধরা দেন, আশ্রম ও মন্দির অপেক্ষা জেলে বা বধ্যভূমিতে ভগবদ্দর্শনের ছড়াছড়ি হইবার কথা। যাঁহারা মানবজাতির জন্য, দেশের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা ভগবানের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যে দুঃখীকে সান্ত্বনা, দরিদ্রকে সাহায্য, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, নিরুপায়কে উপায় দেয়, সে আমাকেই দেয়, আমি সেই দুঃখী, সেই দরিদ্র, সেই তৃষ্ণার্ত্ত, সেই নিরুপায়। আবার জেলে অহঙ্কার সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। সেইখানে লেশমাত্র স্বাধীনতা

থাকে না, ভগবানের মুখের পানে আহার, নিদ্রা, সুখ, ভাগ্য, স্বাধীনতার জন্য চাহিতেই হয়। অতএব এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর, সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ যেমন সহজ আর কোথাও তেমন সহজ নহে। কর্ম্মীর আত্মসমর্পণ ভগবানের অতিপ্রিয় উপহার, এই পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এই বলিই শ্রেষ্ঠ বলি। ইহাতে যদি ভগবদ্দর্শন না হয়, তবে কিসে হইবে?

বেদে পুনর্জ্জন্ম

য়ুরোপীয়গণ যখন প্রথম আর্য্যসাহিত্য আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহাদের এমন আনন্দ হয় যে সমুচিত প্রশংসা করিবার কথাও জোটে না এবং পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। পরে পাশ্চাত্য হৃদয়ে ঈর্য্যার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় এবং অনেকে সেই ঈর্য্যার বশে সংস্কৃত ভাষা ও বিফল সাহিত্য ব্রাহ্মণদের জাল জোচ্চুরি বলিয়া উড়াইবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা যখন হয়, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নূতন ফন্দী বাহির করিলেন; তাঁহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, কিছুই হিন্দুর নিজস্ব নাই, সবই বিদেশ হইতে আমদানী। রামায়ণ ও মহাভারত হোমরের অনুকরণ, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, আয়ুর্ব্বেদ, শিল্প, চিত্রকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, গণিত, দেবনাগরী অক্ষর, পঞ্চতন্ত্র, যাহা যাহা ভারতের গৌরব বলিয়া প্রসিদ্ধ, সবই গ্রীস, ঈজিপ্ত, বাবুলোন ইত্যাদি দেশ হইতে ধার করা, এবং গীতা খৃষ্টধর্ম্ম হইতে চোরাই মাল; হিন্দুধর্ম্মে যদি কোন গুণ থাকে, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের দান,—আর পাছে বলি, বুদ্ধ ত ভারতবাসী, তখন এই অদ্ভুত কল্পনা আবিষ্কার করিলেন যে বুদ্ধ মোঙ্গল বা তুরুস্ক জাতীয়; শাক্যগণ, শক বা Seythian; এই সময়ে এই মত প্রচার হয় যে, কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দুধর্ম্মে ছিল না, বুদ্ধই এই দুই মত সৃষ্টি করিলেন। সেইদিন দেখিলাম Hindu Spiritual Magazine-এর সম্পাদক মতপ্রচার করিয়াছেন যে এই কথা সত্য, বেদে পুনর্জ্জন্মবাদ নাই, পুনর্জ্জন্মবাদ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নয়। জানিনা সম্পাদক মহাশয় এই কথা স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছেন, না ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের প্রতিধ্বনি মাত্র। আমরা দেখাইতে পারি এবং দেখাইব যে উপনিষদগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন। যে উপনিষদগুলি বৈদিক জ্ঞানের চরম বিকাশ, সেই উপনিষদে পুনর্জ্জন্ম ধ্রুব ও গৃহীত সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র উল্লিখিত আছে। কর্ম্মবাদও বেদে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটি শাখা মাত্র, হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পরিণাম নহে।

আৰ্য্য সমাজের অবনতি

আমরা আৰ্য্য সমাজের অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই সমাজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে রাজভক্তি আৰ্য্য সমাজের ধৰ্ম্মমতের মধ্যে এক মত বলিয়া গৃহীত, সেই হেতু যে "আমি রাজভক্ত" বলিয়া শপথ গ্রহণ করিতে সম্মত, তাহাকেই আৰ্য্যসমাজে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত আর কাহাকেও নহে। অন্য ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ের জন্যও এই মহাত্মা এই বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা যদি অধ্যক্ষজীর প্রকৃত মত হইত, আমরা কিছু বলিতাম না, কিন্তু আৰ্য্যসমাজের উপর ঘন ঘন রাজদ্রোহের অভিযোগ আসিয়া পড়িবার আগে তাহার এই উৎকট রাজভক্তির উদ্রেক হয় নাই। ধৰ্ম্ম সকলেরই জন্য, যে ধৰ্ম্মসম্প্রদায় হইতে কেহ রাজনীতিক মতের জন্য বহিষ্কৃত, সেই সম্প্রদায় ধৰ্ম্মসম্প্রদায় নহে, স্বার্থসম্প্রদায়। আমি রাজভক্ত কি না রাজপুরুষ দেখিবেন এবং রাজপুরুষও আমার মনের ভাবের উপর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন না, কেবল রাজভক্তির বিরুদ্ধভাব প্রচারে দেশের শান্তি যাহাতে নষ্ট না হয়, নিজ অধিকার নষ্ট না হয়, সেই চেষ্টা করেন। যে ধৰ্ম্ম-মন্দিরের দ্বারে তুমি ভগবদ্ভক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া, তুমি রাজভক্ত কিনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই মন্দির যেন কোন ভগবদ্ভক্ত না মাড়ান। Render unto Caesar the things that are Caesar's, unto God the things that are God's. সম্রাটের প্রাপ্য যাহা তাহাই সম্রাটকে অর্পণ কর, ভগবানের প্রাপ্য যাহা তাহা ভগবানের, সম্রাটের নহে।